সহৃদয়া

নরেন্দ্রনাথ মিত্র





ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট · কলিকাতা - ৬

প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ, ১৩৬৩

মূল্য চার টাকা মাত্র

শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক ডি, এম্, লাইব্রেরী ৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৩
হইতে প্রকাশিত. শ্রীসুকুমার চৌধুরী, কর্তৃক বাণী-শ্রী প্রেস ৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ গুহ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

'সোয়ালো লেনের পুরনো ফ্লাট বাড়িটার দোতলায় উত্তর-পশ্চিম কোনের ছোট্ট একখানা ঘর। সব চেয়ে নিরেশ ঘর বাড়িটার, যেমনি নোংরা, তেমনি অন্ধকার। গরমের দিনে কি কষ্টই যে হোত। টিকতে না পেরে শেষে এক বন্ধুর কাছ থেকে পাখা একখানা ভাড়া ক'রে আনলুম। কিন্তু চালান যায় না। বাতাস যতটুকু মাথায় লাগে তার চেয়ে মাথার উপর ঝুর ঝুর ক'রে চুণ বালি ঝরে বেশি। ছুটি কাউণ্টার, একটি সেভিংস আর একটি কারেণ্ট। ক্যাশে কখনো আমি বসি, কখনো হেমন্ত। আমি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সে সেক্রেটারী। আবার আমি লেজার কীপার, সে চিফ এ্যাকাউণ্টাণ্ট। হিসেবটা হেমন্তই ভালো বুঝত। আমরাই কর্মচারী, আমরাই কর্মকর্তা। আর শীতল বেয়ারা। সে ডিরেক্টার নয়, ডিক্টেটর। নাওয়া-খাওয়ার ব্যাপারে তার হুকুম আমাদের ছুজনকে মেনে চলতে হোত। সাইন বোর্ডটা কিন্তু আমাদেরই সব চেয়ে ভালো ছিল। বিল্ডিংটায় যতগুলি অফিস তার মধ্যে দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মত অমন জমকালো অর্ণামেণ্টাল হরফ আর কারো ছিল না। কিন্তু হলে হবে কি, পার্টি ছু' একটি যা আসে সাইন বোর্ড দেখেই খুশি আর চরিতার্থ হয়ে ফিরে যায়, ভিতরে ঢোকেনা।'

মৃদু হাসলেন সুরপতি। সেদিনের সেই পার্টি হারাবার ছুঃখের রেশ আজও যেন তাঁর স্বরে ভাসল, ঠোঁটের কৌতুকের হাসির সঙ্গে মিশে রইল।

সাদার্ণ এভেনিয়ুর তেতালা বাড়ির দোতালার ড্রয়িংরুমে শোফায় অসুস্থ শরীর এলিয়ে দিয়ে দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের আঠার বছর আগেকার ইতিহাস

বলছিলেন চেয়ারম্যান সুরপতি চক্রবর্তী। শ্রোতা মেয়ে সুজাতা আর জেনারেল ম্যানেজার অবনী চাটুয্যে। এ ইতিহাস সুজাতা বাবার কাছে আরো বহুবার শুনেছে। শুনে তার ক্লান্তি আসে না, যত শোনে তত যেন নতুন বলে মনে হয়। বাবার কৈশোর আর যৌবনারম্ভের কৃচ্ছ্রসাধনের কাহিনী শুনতে সত্যিই ভারি চমৎকার লাগে সুজাতার। সে যেন আর এক সুরপতি। এখনকার দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের সঙ্গে যেন তাঁর খুব কমই মিল আছে। সেই সোয়ালো লেনের পর আরো দু' একটি অলিগলি ঘুরে দেশলক্ষ্মী উঠে এসেছে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে, ছ'তলা নিজস্ব বাড়ি হয়েছে তার, আরো গোটা দশেক বাড়ি দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেনারস, বোম্বাইয়ে। আর তিন চারটে বাড়ির কনষ্ট্রাকসন্ চলছে আগ্রা এলাহাবাদ, পাটনা, নাগপুরে। এছাড়া ভারতবর্ষের আরো যে গোটা কুড়ি শহরে দেশলক্ষ্মীর শাখা আছে সে বাড়িগুলি ব্যাঙ্কের নিজস্ব নয়, ভাড়া করা। তাদের কিছু কিছু সুজাতা দেখেছে, কিছু দেখেনি। তবে সুজাতা কল্পনা করতে পারে তার কোনটাই এখন আর সোয়ালো লেন নয়।।

সুরপতির মুখে পুরনো কাহিনী শুনতে সুজাতার ভালোই লাগে। কিন্তু আজ সুজাতাও একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। প্রথমত সুরপতি অত্যন্ত লো ব্লাডপ্রেসারে ভুগছেন, কথা বলা তাঁর পক্ষে একেবারেই বারণ। এ সম্বন্ধে ভারি কড়া নির্দেশ দিয়ে গেছেন ডাক্তার সেন। দ্বিতীয়ত অবনীবাবুর সামনে এসব গল্প বলা সুজাতার মোটেই মনঃপূত হচ্ছিল না। হোলই বা গল্প, নিজেদের দৈন্যের কাহিনী তো বটে। অবনী চাটুয্যে হলেনই বা পদস্থ জেনারেল ম্যানেজার, সুরপতির দক্ষিণ হাত, তবু তো বাইরের লোক। কিন্তু কথা বলবার সময় বাধা পাওয়া সুরপতি পছন্দ করেন না। একটু বাদে তিনি নিজেই থামলেন। থেমে টি-পট্ থেকে চা কাপে ঢেলে নিতে যাচ্ছিলেন, সুজাতা বাধা দিয়ে বলল, 'ওকি হচ্ছে বাবা। এবার নিয়ে ক'কাপ হোল।'

সুরপতি জেনারেল ম্যানেজার অবনীর দিকে তাকিয়ে নালিশের ভঙ্গিতে

বললেন, 'খাওয়ার মধ্যে ক'কাপ চা-ই তো খাই, তাও বুলু আমাকে খেতে দেবেনা।'

অবনী সংক্ষেপে বলল, 'চা বোধ হয় আপনার পক্ষে কম খাওয়াই ভালো, মিঃ চক্রবর্তী।'

সুজাতা বলল, 'চা অত বেশি খাও বলেই আর কিছু খেতে পার না।'

সুরপতি ততক্ষণ কাপে চা ঢেলে নিয়েছেন, পুরো নয়, মেয়ের মন রাখবার জন্ম আধা-আধি ভরেছেন কাপের। একটু চুমুক দিয়ে নিয়ে সুরপতি বললেন, 'চায়ের অভ্যাস সেই সোয়ালো লেন থেকেই শুরু। না, তারও অনেক আগে থেকে। যখন বেকার নিঃসম্বল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতুম তখনো এক কাপ চা ছাড়া চলত না। দু'পয়সা করে কাপ ছিল তখন। কতদিন কেবল চা খেয়েই কেটেছে। ব্যয় সঙ্কোচের জন্ম এক কাপ থেকে আধ কাপে নামতে হয়েছে মাঝে মাঝে, আর ছিল বিড়ি।'

সুজাতা আবার ধমক দিল, 'বাবা, তোমার না কথা বলা বারণ?'

সুরপতি হাসলেন, 'কেবল চা নয়, চা-র কথাটা পর্যন্ত বারণ?'

তারপর টিপয়ের ওপরকার সুন্দর শ্বেত পাথরের কৌটোর ভিতর থেকে একটা হাভানা চুরুট তুলে নিলেন, অবনীর দিকে একটু ঠেলে দিলেন গোল্ড ফ্লেকের টিনটা। একটু কৌতুকের হাসি ঠোঁটে।

অবনী আরক্ত হয়ে উঠে মাথা নাড়ল।

সুরপতি বললেন, 'তাতে কি। হ্যাঁ, কিন্তু জানো অবনী, কি অমোঘ শক্তি ছিল সেই এক কাপ চা আর একটা বিড়ির? পায়ে হেঁটে তারই জোরে সারা কলকাতা চষে বেড়িয়েছি। কড়া নেড়ে নেড়ে জোগাড় করেছি—পার্টি। সেই পদরথের কাছে কোথায় লাগে তোমার ষ্টুডিবেকার? ভালো কথা, সাধুখাঁদের কি করলে?'

নতুন মডেলের ষ্টুডিবেকারটা কাজকর্মের সুবিধার জন্ম ব্যাঙ্ক থেকে জেনারেল ম্যানেজারকে দেওয়া হয়েছে। লাখ পাঁচেক টাকার একটা এ্যাকাউন্ট খোলবার কথা ছিল গোবিন্দ অয়েল মিলের স্বত্ব সাধুখাঁর

যোগাযোগের ভার ছিল স্বয়ং জেনারেল ম্যানেজার অবনী চাটুয্যের উপর। অবনী মৃদু কৈফিয়তের সুরে বলল, 'এখনো কিছু করে উঠতে পারিনি। আগামী সপ্তাহে—'

ছায়া পড়ল সুরপতির মুখে, গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হুঁ, আগামী সপ্তাহে সাধুখাঁ তোমার কাছে নাও আসতে পারে।' এক মুহূর্ত কঠিন দৃষ্টিতে জেনারেল ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে রইলেন চেয়ারম্যান তারপর ফের একটু হাসলেন, 'হ্যা, তখনকার দিনে পাঁচ টাকার একটা পার্টিও যদি হাত থেকে ফসকে যেত, মনে হোত পাঁজরের একখানা হাড় ছুটে গেছে।'

অবনী মনে মনে ভাবল, কেবল তখন কেন এখনও তাই যায়। ব্যাঙ্কিং আর অর্থনীতি সম্বন্ধে বিলেতী ডিপ্লোমা আছে অবনী চাটুয্যের। দেশ-লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক থেকে মাসে মাসে সাড়ে বারশ টাকা করে মাইনে পায়। এক হাজার বেতন, আড়াইশ ভাতা; অভিজাত ঘরের চারু দর্শন পুরুষ, গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌর, তীক্ষ্ণ নাক, আয়ত চোখ, বলিষ্ঠ গড়ন, শালপ্রাংশু মহাভুজ। সংস্কৃত কাব্যের নায়কোচিত চেহারা। চমৎকার মানিয়েছে ইউরোপীয় পোষাকে। তিরিশের এক বছর ওপরেই হবে বয়স। মুখের দিকে তাকালে বয়সের চাইতে ব্যক্তিত্বটাই যেন বেশি চোখে পড়ে।

চেয়ারম্যানের এই রূঢ় অহিষ্ণুতায় অবনী বিস্মিত হোল না, কিংবা যে ন্যায়সঙ্গত জবাবটা মনে এসেছিল তাও উচ্চারণ করল না বরং একটু হেসে আশ্বাসের সুরে বলল, 'আপনি ভাববেন না মিঃ চক্রবর্তী।'

ধৈর্য আছে অবনীর। ব্যবহারিক শিষ্টাচারে আর সৌজন্যে আছে ইউরোপীয় সংস্কৃতির ছাপ, যখন অন্য কোন কেরাণী কি কর্মচারী সামনে থাকে না তখন চেয়ারম্যান অবনীর কাজকর্মের সামান্য শৈথিল্যে এর চেয়েও অসংস্কৃত ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রথম প্রথম অবনীর মনও উৎক্ষিপ্ত হোত, বিক্ষুব্ধ হোত, এখন আর হয় না। চেয়ারম্যানের কথার জবাবে নিজের আচার আচরণের শান্ত যুক্তিগত ব্যাখ্যা জানায়, মনের বিক্ষোভ অশোভন কোন ভাষায় প্রকাশ করে না। চাকরী রক্ষার

ভয়ে নয়, চাকরীর ভাবনা তার নেই ; শিষ্টাচার আর শৃঙ্খলা রক্ষার দায়ে। যতক্ষণ দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে অবনী আছে ততক্ষণ সুরপতি চক্রবর্তীর আসনের সম্মান সে রাখতে বাধ্য। কিন্তু এই কঠিন কর্তব্যবোধ ছাড়া আরও এক কোমল প্রচ্ছন্ন মধুর অনুভূতি এই কর্কশ মানুষটি সম্বন্ধে মনে মনে পোষণ করে অবনী। সুরপতি চক্রবর্তী কেবল দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান নয়, লক্ষ্মীপ্রতিম সহৃদয়া সুজাতার বাবা।

সুরপতি আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন। সুজাতা উঠবার ভঙ্গি করে বলল, 'আমি যাই বাবা, তুমি যখন আমার কোন কথাই শুনবে না, কেবল কথাই বলবে—'

সুরপতি মৃদু হাসলেন, বুঝতে বাকি রইল না কোন কথায় মেয়ের আপত্তি। বললেন, 'আচ্ছা, আর রাগ করব না তুই বোস।'

যার ওপর সুরপতি রাগ করবেন না তার নামটা অনুচ্চারিত থাকলেও সুজাতার সুগৌর সুন্দর মুখখানা অকস্মাৎ রক্তাভ হয়ে উঠল কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে স্বাভাবিক সুরে বলল, 'তোমার যা ইচ্ছা তাই কর বাবা, চা খাও, কথা বল, মেজাজ খারাপ কর, কিন্তু অসুখ বাড়লে আমি কিছু জানিনে, তখন যে হৈ চৈ করে—'

ক্রীং.........

সুজাতা কথাটা শেষ কবতে পারল না, নিচের তলায় কোন্ আগন্তুক যেন এই অসময়ে এসে কলিং বেল টিপছে।

ভ্রূ আর কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল সুরপতির, অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আঃ, রামভজন, অমূল্য, কার্তিক কেউ নিচে নেই নাকি? আর বুলু, কলিং বেলটা এবার বদলাবার ব্যবস্থা কর। কানে আর সহ্য হয় না।'

সুজাতা বলল, 'তাই দেব বাবা, দেখে আসি কে এল।'

সুরপতি বললেন, 'যেই আসুক না কেন. বারণ করে দিয়ে এসো, বলো যে দেখা হবে না।

সুজাতা মৃদু হাসল, 'না আমি তো বারণ করব না বাবা। রাস্তার যত লোক ডেকে নিয়ে আসব, দেখি কত কথা বলতে পার তুমি।'

ফিকে সবুজ রংঙের পর্দাটা একটু তুলে সুজাতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পর্দার সেই মৃদু আন্দোলনের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল অবনী, তারপর সোনা বাঁধানো হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'আমি এবার উঠি—।'

সুরপতি বাধা দিয়ে বললেন, 'বোসো, তাড়া কিসের আজ তো ছুটি। তা'হলে সাধুখাঁ—'

আবার একবার কলিং বেল বাজল, কারো সাড়া না পেয়ে এক তলার আগন্তুক বোধ হয় অধীর হয়ে উঠছে।

সুরপতি স্নায়ুতে স্নায়ুতে আবার সেই অস্বস্তি বোধ করলেন, বললেন, 'আমি আজ সব হারামজাদাকে তাড়াব, নিচে কি কেউ নেই? লোকটা বোধ হয় এই নতুন কলিং বেল টিপতে শিখছে, মজা পাচ্ছে বাজিয়ে বাজিয়ে, ইতর, অভদ্র!'

অবনী কোন জবাব দিল না। কলিং বেলের একাধিকবার শব্দে সেও অস্বস্তি বোধ করছে।

কিন্তু সুরপতির এতখানি অসহিষ্ণুতা তার কাছে অশোভন লাগল। কোন অপরিচিত আগন্তুক সম্বন্ধে কোন ভদ্রলোক যে এমন অশিষ্ট মন্তব্য করতে পারেন তা সুরপতির সঙ্গে পরিচয় না হলে অবনী ধারণা করতে পারত না। বিচক্ষণ ব্যাঙ্কার হিসাবে, স্বপ্রতিষ্ঠ স্বগঠিত মানুষ হিসাবে সুরপতির ওপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে অবনীর, কিন্তু তাঁর আচার-আচরণ শাসন-ভাষণের ভঙ্গি পদে পদে যেন অবনীর রুচি আর শালীনতাবোধকে পীড়িত করে। বার বার স্মরণ করিয়ে দেয় সুরপতি অত্যন্ত নিচের তলা থেকে উপরে উঠেছেন।

যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে সুরপতির। লিফ্‌টে কেউ তাঁকে তুলে নেয়নি,

উপরে উঠবার জন্য কেউ তাঁর জন্য সিঁড়ি পেতে রাখেনি, অমসৃণ বন্ধুর পাহাড়ী পথ বেয়ে নিজের শক্তিতে তাঁকে উঠে আসতে হয়েছে। সে কাহিনীর কিছু কিছু অবনী শুনেছে। বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত কিংবদন্তীও কানে গেছে কিছু কিছু। না গেলেই যেন ভালো হোত, কারণ সুরপতি সুজাতার বাবা। সুরপতির মধ্যে অসংস্কৃত মনের ছাপ না দেখলেই যেন ভালো হোত। অবশ্য আকৃতি প্রকৃতিতে সুজাতা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুরপতির মেয়ে বলে তাকে যেন বিশ্বাস হতে চায় না। শিক্ষায় দীক্ষায় পরিমার্জিত স্বতন্ত্র। তবু যেন মাঝে মাঝে কেমন এক ধরণের আশঙ্কা হয় অবনীর। যদি কোন-দিন সুরপতির অভ্যাস, শালীনতা, সংস্কৃতির দৈন্য সুজাতার মধ্যেও আকস্মিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে, বড় ঘনিষ্ঠতা বাপ মেয়ের মধ্যে। এতখানি অন্তরঙ্গতা যেন ভালো লাগে না অবনীর। কেবল শ্রদ্ধা আর বাৎসল্যই নয়, পরস্পরের মধ্যে সৌখ্যেরও সম্পর্ক আছে। অবনীর নিজের যদি এমন বাপ থাকত সে তাকে মনে করত এ্যাকসিডেণ্ট। কিন্তু এত সাদৃশ্যের অভাব, এত বৈপরীত্য সত্ত্বেও সুরপতি সুজাতার পক্ষে আকস্মিক নয়, অপরিহার্য।

সুরপতি অবনীর ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন না, কিংবা লক্ষ্য করলেও গ্রাহ্য করলেন না। অধীরভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন সুজাতার জন্য। অবাঞ্ছিত আগন্তুক বিদায় হয়েছে না জানতে পারলে যেন সুরপতির স্বস্তি নেই। কথা শুরু করতে ভরসা পাচ্ছেন না সুরপতি, আবার কখন বেল বেজে বসবে তার ঠিক কি। কলিং বেলটা আজই সরিয়ে ফেলতে হবে।

মিনিট তিনেকের মধ্যেই লঘু পায়ের শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে। ফের নড়ে উঠল সবুজ পর্দা। সুজাতা ঘরে ঢুকল।

সুরপতি বললেন, 'কে এসেছিল। বিদায় করতে পারলি ?'

সুজাতা একটু ইতঃস্তত করে বলল, 'ভদ্রলোককে নিচের ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি।'

সুরপতি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কেন ? কি দরকার ?'

'তোমার নামে একখানা চিঠি নিয়ে এসেছেন। জবাব নিয়ে যেতে চান। আমি অনেক করে বললুম তুমি অসুস্থ। জবাব তাঁকে না হয় পরেই দেওয়া যাবে। কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনলেন না। বললেন, অনেক দিন ধরে ঘুরছেন, ব্যাঙ্কেও গেছেন কয়েকবার না পেয়ে—'

সুরপতি পদপূরণ করে বললেন, 'এখানে হানা দিয়েছেন। আচ্ছা, দাও চিঠি।'

চিঠিটা সুজাতা তার বাবার হাতে এগিয়ে দিল। সাদা খামের ওপর পাকা হাতের ইংরেজীতে সুরপতির নাম ঠিকানা।

সুরপতি চিঠিটা একবার দেখেই অদ্ভুত একটু হেসে অবনীর দিকে এগিয়ে দিলেন, 'নাও পড়।'

অবনী তেমন লক্ষ্য না করেই বলল, 'কিন্তু এতো আপনার পার্সনাল চিঠি।'

সুরপতি বললেন, 'না, তোমাদের বিলিতী কার্টসির জ্বালায় আর পারিনে। দেখছ না নামের পর চেয়ারম্যান দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড লেখা আছে। আচ্ছা বুলু. তুই-ই খোল দেখি চিঠিটা।'

সুজাতা চিঠিটা খুলে ফেলল। দেখা গেল চিঠির ওপরটা যেমন ভিতরটা তেমন নয়। নীলাভ প্যাডে ভাঁজ করা একখানা কাগজ। ভাঁজ খুলে দু'চার লাইন পড়ে চিঠিখানা বাবার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে সুজাতা বলল, 'তুমিই পড় বাবা।

সুরপতি বললেন, 'কেন, কি আছে চিঠিতে? তোরা সবাই সাহেব মেম হয়ে গেলি?'

চিঠিখানা একটু রাগ করেই মেয়ের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন সুরপতি। মেয়েলী গোটা গোটা অক্ষরের বাংলা লেখা দেখে প্রথমে একটু যেন চমকে উঠলেন সুরপতি, কিন্তু পাঠ দেখে আশ্বস্ত হলেন, তারপর মনে মনে পড়তে লাগলেন।

কল্যাণীয়েষু,

চিঠি লিখবার আগে অনেকবার ইতঃস্তত করেছি চিঠি দিলে তুমি সত্যিই চিনতে পারবে কিনা। সেদিন তো আর নেই। তুমি আজকাল কত বড় লোক হয়েছ। তোমার সেই রংপুরের গরিব বউদির কথা এখন কি আর চেষ্টা করলেও মনে করতে পারবে। তা ছাড়া দু' দশ বছরের কথাও তো নয়। তোমার ছাত্রী বীণার বয়স ছিল তখন নয়, এখন উনতিরিশ। পাঁচটি সন্তানের মা হয়েছে। হিসেব করে দেখ কত কাল হোল। আর তোমার সেই ছাত্রটির কথা মনে আছে? যাকে অ, আ, ক, খ পড়াতে? অসিত লিখতে যে বার বার তালব্য শয়ে দীর্ঘ ঈ-কার দিত আর বার বার শোধরাতে হোত তোমাকে। আর তোমার ছাত্রের বাবা রাগ করতেন মাষ্টারের ওপর। নিতান্ত আমার দয়ায় তোমার তখন চাকরী যায়নি? কিন্তু সেই রাগ করা মানুষটি আর নেই সুরপতি ঠাকুরপো। তিনি আজ দশ বছর আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। রাখবার মধ্যে রেখে গেছেন অসিতের ঘাড়ে একরাশ দেনা আর তিনটি বয়স্থা বোন। স্বর্গে গেছেন তিনি, তাঁর কথা আর বলিনে। বীণার পর আরো দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম মেজোটি বছর খানেকের মধ্যেই সিঁদুর মুছে ফিরে এসেছে। সবই অদৃষ্ট। কিন্তু মেয়েদের জন্য তো কারো কাছে হাত পাতিনি, পাততে হোল ছেলের জন্য। তোমার সেই ছাত্র আজকাল নাম শুদ্ধ করে লিখতে পারে বটে, কিন্তু না পারে চাকরি যোগাড় করতে, না পারে রাখতে। সেই চার বছরের ছেলেমানুষী আর খেয়ালীপনা ছাব্বিশ বছরেও ওর গেল না। তাই ভাবলুম অসিতের সেই ছেলেবেলার মাষ্টারের কাছেই তাকে পাঠিয়ে দি যেমন করে পারে ছাত্রকে বেত মেরে সোজা করুক। কেবল নিজের কথাই বললুম। তুমি কেমন আছ? ছেলে মেয়ে কটি? কে কি করে। তাদের মা যে ছেলেবেলায়ই ফাঁকি দিয়েছে সে খবর জানি। আহা বেচারা! কেবল দুঃখ দুর্দশার সঙ্গেই যুদ্ধ করে গেল। সুখের মুখ আর দেখল না।

তুমি কি দেখেছ? বড় মানুষের সুখ দুঃখের আমরা কি বুঝি। স্নেহ আর মঙ্গল কামনা জেনো। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষিনী—
শ্রীঅরুন্ধতী চন্দ

পড়া শেষ ক'রে চিঠিটা সুজাতার হাতে ফিরিয়ে দিলেন সুরপতি, তারপর মৃদু হাসলেন।

সুজাতা বলল, 'হাসছ যে বাবা।'

সুরপতি বললেন, 'ভাবছি সংসারে প্রয়োজনের তাগিদে কত কাজই না হয়! বাইশ তেইশ বছর আগেকার ভুলে-যাওয়া ছিঁড়ে-যাওয়া সম্পর্ক ফের জোড়া লাগে। মুখচেনা সামান্য পরিচয় অসামান্য হয়ে ওঠে। কিন্তু কুটুম্বিতার ব্যাপারে মেয়েদের জুড়ি নেই। এ বিষয়ে পুরুষ তাদের অনেক পেছনে। হরবিলাসবাবু এমন করে লিখতে পারতেন না। একটা ইনট্রডাকটারী চিঠিই বড় জোর দিতেন। অবশ্য হরবিলাসবাবুর স্ত্রীর চিরকালই একটু লেখালেখি আর সাহিত্যের বাতিক ছিল।'

চিঠি পড়বার কৌতূহল অতিকষ্টে আপাততঃ চেপে রাখল সুজাতা, বলল, 'ভদ্রলোক যে বসে রয়েছে বাবা।'

সুরপতি বললেন, 'বলে দাও অফিসে দেখা হবে। পরশু থেকে অফিসে যাব।' তারপর অবনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চাকরির ক্যানডিডেট। আমার মনে আগেই ষ্ট্রাইক করেছিল। কোথাও কিছু খালি আছে নাকি অবনী?'

একটু কি চিন্তা করে অবনী জবাব দিল, 'বিল ডিপার্টমেণ্টের গণেশবাবু আরও একজন এসিষ্ট্যাণ্ট চাইছেন মাস দুই ধরে। লেজারেও দু'তিন জন সর্ট আছে।'

সুরপতি বললেন, 'একেকটা লেজারকে দু'ভাগ করলে দু'তিন জন কেন দশ পনর জনও সর্ট পড়তে পারে। সেভিংসে অন্তত চারটি লোক বেশি আছে, সেখান থেকে কিছু কারেণ্টে পাঠালে—'

জেনারেল ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে চেয়ারম্যান একটু হাসলেন, তারপর বললেন, 'অবশ্য তুমি যদি প্রয়োজন মনে কর তাহলে নিশ্চয় লোক নেবে। তোমার অফিসের কথা আমি কি জানি?'

কথাটা ঠিক নয়, কেবল ইনভেষ্টমেণ্ট আর বড় বড় ব্যাপারই চেয়ারম্যানের মাথায় ঘোরে না, অফিসের প্রত্যেকটি ডিপার্টমেণ্টের নাড়ী নক্ষত্র তাঁর নখাগ্রে। কেবল হেড-অফিসের নয়, সাতাশটি ব্রাঞ্চ অফিসেরও সব রকম খোঁজ খবর রাখেন স্বরপতি। প্রত্যেকটি ম্যানেজার আর এ্যাকাউনট্যাণ্টের সঙ্গে স্বরপতির ব্যক্তিগত আলাপ আর ব্যক্তিগত পত্রালাপ আছে। একেক সময় বড় বাড়াবাড়ি মনে হয় অবনীর। সে যখন রয়েছে এতখানি খোঁজ খবর না রাখলেও চেয়ারম্যান পারেন। মনে হয় সেই সোয়ালো লেনের ছোট্ট ব্যাঙ্কের একাধারে কর্মচারী আর কর্মকর্তা স্বরপতি চক্রবর্তী যেন বাংলা দেশের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কারের মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই স্বরপতির অনন্যসাধারণতার কথা ভেবে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না অবনী চাটুয্যের। সত্যিই কি অসাধারণ ক্ষমতা চেয়ারম্যানের। সাধারণকে অতিক্রম করে তিনি অসাধারণ নন, সাধারণত্ব সঙ্গে নিয়ে, অঙ্গে জড়িয়েই তিনি অসাধারণ। কিন্তু কেবল খোঁজ খবর রেখেই চেয়ারম্যান সন্তুষ্ট, পারতপক্ষে অবনীর কোন কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করেন না। বরং চেয়ারম্যানের অনেক কাজই অবনীর হাতে ছেড়ে দেন।

স্বরপতি চশমার ভিতর দিয়ে অবনীর দিকে তাকিয়ে মনে মনে একবার হাসলেন, একটু যেন লজ্জিতও হলেন। তাঁর কোন কথায় কোন আচরণে যে এই বিলাত-ফেরত জেনারেল ম্যানেজারটির মর্যাদা হানি হবে তা সব সময় তিনি খেয়াল রাখতে পারেন না। অবনীর সবই ভালো, কিন্তু বড় স্পর্শকাতর মন। দেহের মত ওর মনটাও যদি অমন রোবাষ্ট্ হোত তাহ'লে আর কথা ছিল না।

মেয়ের দিকে ফিরে তাকালেন স্বরপতি, 'আচ্ছা, ছেলেটিকে একবার

ডেকে পাঠাও দেখি। তোমার নিচে যাওয়ার দরকার নেই, চাকর বেয়ারা কাউকে ডেকে বল, তাহলেই হবে।'

সুজাতা আবার বেবিয়ে গেল। মনে হল যেন একটু খুশিই হয়েছে।

সুরপতি ফের অবনীর দিকে তাকালেন, 'রঙপুর হাইস্কুলে মাষ্টারী করেছিলাম কিছুদিন। হরবিলাস চন্দ নামে একজন উকিল ছিলেন। তাঁর ছেলেমেয়েদের পড়াতুম, বার টাকা ছিল মাইনে। তবে তাঁর স্ত্রী খুব যত্ন করতেন। নানারকম জলখাবাব ক'রে খাওয়াতেন। ভাতও খেয়েছি। যজমানী বামুনের বংশে জন্মালে হবে কি, ছেলেবেলা থেকেই সব রকম কুসংস্কার আমি ছেড়েছি, তোমার মত বিলেত ঘুরে এলে আরো যে কি ছাড়তুম বলতে পারিনে।' একটু হাসলেন সুরপতি তারপর বললেন, 'আমাব সেই ছাত্র এসেছে চাকবীব খোঁজে।'

অবনী প্রতিধ্বনি কবল, 'আপনার ছাত্র ?'

সুরপতি বললেন, 'হ্যাঁ, মাষ্টারী টিউশনি তো কম করিনি জীবনে, না করেছি কি, এ আজ নতুন নয়, ব্যাঙ্ক বড হওয়াব পব থেকে এমন কত ছাত্র, কত বন্ধু, কত সহপাঠী আর তাদের ছেলে, ভাইপো, ভাগ্নে, জামাইকে যে চাকরী জোগাতে হয়েছে তার আর ঠিক নেই, মজা এই এমন সব বন্ধু এসে ঘনিষ্ঠতা দাবী করেছে যার মুখও মনে নেই, নামও মনে নেই, কিন্তু সে কথা উচ্চারণ করি সাধ্য কি।'

অবনী বলল, 'কেন' ?

সুরপতি অদ্ভুত একটু হাসলেন, 'আর কেন আবার লোকে কি তা বিশ্বাস করবে ? নিশ্চয়ই ভাববে আমার স্মৃতিভ্রংশতার বিশেষ কারণ আছে, বিশেষ অর্থ আছে, অর্থবান হওয়ার বড় বিপদ অবনী।'

নিজের কানেই যেন একটু দম্ভের মত শোনাল কথাটা, সঙ্গে সঙ্গে সুরপতি নিজেকে শুধরে নিয়ে বললেন, 'অবশ্য অর্থ যাকে বলে তার কিছুই আমার হয়নি, নিজের জন্য কিছু আমি করতে চাইনে, লোকে অবশ্য অনেক কিছুই মনে করে।'

অবনী এবার একটু হাসল, সুযোগ পেয়ে খোঁচাও যেন দিল একটু, বলল, 'আপনাকে যতটুকু জানি, তাতে লোকভয় আপনার কাছে প্রশ্রয় পায় বলে মনে হয় না।'

উত্তেজিত হয়ে সোজা হয়ে বসলেন সুরপতি, 'তা তো পায়ই না, লোকের নিন্দা বন্দনাকে সত্যিই যদি আমি তেমন পরোয়া করতুম তাহ'লে আর কিছু করতে পারতুম না, লোকের স্তুতি প্রশংসাও আমি গ্রাহ্য করিনে, অযথা নিন্দা কুৎসায়ও কান পাতিনে। মানি কেবল নিজের বিবেক বুদ্ধিকে।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবনীর দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইলেন সুরপতি, তারপর বললেন, 'যে যাই বলুক, তুমি যার কাছে যত কিছু শুনে থাক, কেউ এমন কথা বলতে পারবে না যে সুরপতি চক্রবর্তী কারো কাছে বিন্দুমাত্র অকৃতজ্ঞ হয়েছে। যার কাছে যতটুকু পেয়েছি, কড়ায় গণ্ডায় তা শোধ করেছি। বেশি ছাড়া কম দিইনি। বাবা বলতেন, (কৃতজ্ঞতা শিখবি নারকেল গাছের কাছে। গৃহস্থ এক ঘটি জল গাছের গোড়ায় ঢালে আর গাছ সারা জীবন ভরে ঘটি ঘটি জল নিজের মাথায় ক'রে ধ'রে রাখে গৃহস্থের জন্য।')

সুরপতি একটু থামলেন, একটু কোমল হোল গলা, স্বাভাবিক হোল দৃষ্টি, 'যতটা পেরেছি তাঁর উপদেশ আমি পালন করেছি। কিন্তু সব মানুষই তো স্বীকৃতি পাবার যোগ্য নয় অবনী। সব মানুষ মানুষ নয়। তাদের যাচাই ক'রে নিতে হয়, বাজিয়ে নিতে হয়। ইন্‌ষ্টিটিউশনের যেখানে ক্ষতি দেখেছি সেখানে কুটুম্ব, বন্ধু, ছাত্র, কোনো কিছুর দোহাই আমাকে আটকাতে পারেনি। ছেঁটে ফেলেছি। দুষ্ট ক্ষত, বিষাক্ত ব্রণকে পোষণ করবার মত মারাত্মক মমতা আমার নেই।'

পর্দা ঠেলে ফের ঘরে ঢুকল সুজাতা, এবার আর একা নয়। সঙ্গে শ্যামবর্ণ, ছিপছিপে চেহারার পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটি যুবক, একটু লম্বাটে ধরণের মুখ, ডৌলটি ভারি মিষ্টি, নাকটি তেমন চোখা নয়, চোখ দুটি গভীর আর প্রশস্ত। একটু যেন স্বপ্নাচ্ছন্নতা আছে। বেশবাসে যত্নের অভাব,

খাড়াখাড়া চুলের সবগুলি চিরুণীর শাসন মানেনি। খদ্দরের পাঞ্জাবীটা আরো একটু ফর্সা হলেই যেন শোভন হোত, পায়ের পুরনো স্যাণ্ডেল-জোড়াও বদলে আসলে ভালো করত। সব মিলিয়ে হাবে ভাবে কেমন একটা মফঃস্বলের নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের গন্ধ জড়ানো।

চশমার ভিতর দিয়ে প্রাক্তন ছাত্রের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন সুরপতি, তারপর সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'বোসো।'

কথাটা সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হোলো না অসিতের, যেন শুনতেই পেলনা। সুরপতির দিকে আরও একমুহূর্ত যেন পলকহীন হয়ে তাকিয়ে রইল। সে দৃষ্টিতে মুগ্ধতা নেই, কিন্তু বিস্ময় আর কৌতূহল আছে।

অসিতের মনে হোল এমন কুদর্শন মানুষ সে শিগ্‌গির দেখেনি। বছর পঞ্চাশেক বয়স হবে সুরপতির। কিছু কম হতে পারে, কিন্তু যেন বেশি বলেই মনে হয়। কুটিল রেখা কুঞ্চিত, লম্বাটে ধরণের মুখ, চোয়াল জাগানো, গাল ভাঙা। ঠোঁট দুটি পাতলাই। গায়ের রঙ খুব যে কালো তা নয়, কিন্তু ঠোঁট দুটিতে বিশেষ করে কে যেন গভীর কালো রঙের তুলি বুলিয়ে দিয়েছে। দেখলে জোঁকের কথা মনে হয়, গা শির শির করে, দাড়ি গোঁফ সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে কামানো, তাতে রেখাগুলি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অনেক কৃচ্ছ্রতা অনেক সংগ্রামের সঙ্কেত যেন দুর্বোধ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে আঁচড়ে আঁচড়ে। চাপা চ্যাপটা চিবুক আর ঠোঁট দু'টি সবচেয়ে নিষ্ঠুর আর হিংস্র লাগল অসিতের। মনে হোল এ মুখ সুরপতি দাড়ি গোঁফে আচ্ছন্ন করে রাখলেই যেন ভালো করতেন।

'বোসো।' সুরপতির কণ্ঠে এবার বিরক্তি আর অসহিষ্ণুতার ঝাঁঝ ফুটল।

হঠাৎ খেয়াল হওয়ায় অসিত যেন একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মাথা নিচু করে প্রণাম করল পা ছুঁয়ে তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'মার কাছে শুনেছি আপনি ছেলেবেলায় আমার মাষ্টারমশাই ছিলেন, চেহারাটা ঠিক মনে করতে পারছিলাম না।'

পিছনে পিছনে নিচে নেমে গেল। কিন্তু সদর পেরিয়ে রাস্তায় পড়ে আর একবার স্বরপতির বাড়িখানার দিকে তাকাল, ভারি সুন্দর ধবধবে তেতালা বাড়ি। মারবেল ফলকে লেখা 'কমলা কুটীর।'

কমলা বোধহয় মাষ্টারমশাইর স্ত্রীর নাম।

কিন্তু কুটীর কেন? মনে মনে একবার হাসল অসিত, তারপর ছাঁটা ঘাসের লন পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ল।

হাতায় ক'রে মূলো বেগুনের খানিকটা নিরামিষ তরকারি ছেলের পাতে তুলে দিতে দিতে অরুন্ধতী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর কি বললেন তোর মাষ্টার মশাই? চিনতে পারলেন প্রথমে?'

অসিত ভাত মাখতে মাখতে মায়ের মুখের দিকে একবার তাকাল, 'তোমার সুপারিশ চিঠি না থাকলে প্রথমে কেন শেষেও তিনি চিনতে পারতেন না মা।'

অরুন্ধতীর মুখখানা একটু আরক্ত হয়ে উঠল কিনা ঠিক যেন বোঝা গেল না। যৌবনের ফর্সা রঙ এখন ম্লান হয়ে গেছে চেহারায়; তাছাড়া বয়সও হয়েছে। এ বয়সে মুখের রঙ ঘন ঘন বদলায় না, বদলাতে দেওয়াই কি যায়?

ছেলের কথার জবাবে অরুন্ধতী বললেন, 'আহাহা ভারি পড়া শিখেছ, এখন নিজের পরিচয় যদি লোকের কাছে মুখ ফুটে বলতে না পারো সে দোষ কার?'

অসিত খেতে খেতে একটু হাসল, 'বলতে চাইলেই কি লোকে কান পাতে মা? চেনাতে চাইলেই কি সব সময় লোকে চেনে? না চিনতে চায়?'

অসিতের ছোট বোন নীলা সামনেই ছোট্ট জলচৌকি খানার ওপর বসে হাঁটুতে থুৎনি রেখে অন্যমনস্কভাবে মেঝের উপর আঙুল দিয়ে কি যেন লিখে চলছিল। পরনে পুরনো একখানা খয়েরি রঙের শাড়ি।

শুকোবার জন্ত ভিজে চুল পিঠময় ছড়িয়ে দিয়েছে। মাথা নিচু করে থাকায় এক গোছা চুল কাঁধের ধার দিয়ে বাহু সংলগ্ন হয়ে মেঝের ওপর এসে পড়েছে। মাঝে মাঝে এমন অন্তমনস্ক হয়ে পড়ে নীলা, নিজের মধ্যে নিজে ডুবে থাকে, অরুন্ধতী কি অসিত কেউ তখন তাকে সংসারী কথায় ডাকে না। কিন্তু অসিতের শেষ কথাটায় নীলা নিজেই যেন সমস্ত আচ্ছন্নতা থেকে হঠাৎ জেগে উঠল। অসিতের দিকে তাকিয়ে উত্যক্ত স্বরে বলল, 'তোমার এসব মান অভিমানের কোন মানে হয় না দাদা, চেনবার গরজটা পুরোপুরি আমাদের। এখনও যদি নিজেকে এ্যাসার্ট না করতে পার—'

অসিত স্থির কঠিন দৃষ্টিতে বোনের দিকে একবার তাকাল, কিন্তু পরক্ষণেই স্নিগ্ধ কৌতুকে তার মুখ ভারি মোলায়েম দেখাল। মার দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম নালিশের ভঙ্গিতে অসিত বলল, 'শোন মা, নীলার কথা শোন, ছোট বোন হয়ে বড় দিদির মত কি রকম আমাকে উপদেশ দিতে শুরু করেছে দেখ। কি কুক্ষণেই যে ওর মাষ্টারীতে মত দিয়েছিলাম, এখন ধমক খেতে খেতে প্রাণ যায়। নীলার ধারণা কি জানো, সমস্ত পৃথিবীটাই জ্যোতির্ময়ী গার্লস স্কুল।'

ছেলের কথার ভঙ্গিতে অরুন্ধতীও হাসলেন, 'তা বাপু কথা তো ঠিকই, তোরই তো দোষ, বোনের বিয়ে দিলি না, মাষ্টারী জুটিয়ে দিলি।'

নীলা প্রতিবাদ করে উঠল, 'দোষের নামে দাদার অযথা গৌরব বাড়িয়ো না মা। নিজের চাকরি জোটাতে পারে না তার আবার আমার চাকরি জুটিয়ে দেবে। মল্লিকাদিকে ধ'বে মাষ্টারীটা আমি নিজে ঠিক করে নিয়েছি মনে নেই?'

অসিত গম্ভীর ভাবে বলল, 'মাত্র ছ' মাস তো চাকরি করছে এরই মধ্যে কি রকম কর্তৃত্ব করতে শুরু করেছে দেখ মা।' তারপর বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু তুই বড় অকৃতজ্ঞ নীলা, চাকরি না হয় তোর কোন মল্লিকাদি না কে তিনিই জুটিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু করবার অনুমতিটা

দিয়েছিল কে? যাকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে রাজী করেছিল কে? সে তো আমিই। কৃতজ্ঞতা বলে কোন জিনিষ যদি থাকে তোর মধ্যে!'

খেতে খেতে অসিত ফের তাকাল নীলার দিকে, 'কেবল কি তাই? এত বড় আইবুড়ো বোনকে ঘরে রেখে বাইরে চাকরিতে পাঠিয়ে সমাজে হুঁকো বন্ধ হবার কত বড় একটা ভয় দিন রাত বুকের মধ্যে পুষে রাখছি তা জানিস?'

নীলা একবার হেসে উঠল, 'সস্তা বিড়ি সিগারেটে বাজার ভরে গেছে, তাই, নইলে সত্যি সত্যি সমাজের সেই হুঁকো ছাড়া যদি ধূমপানের আর উপায় না থাকত তাহলে কি আর সহজে তুমি আমাকে ছেড়ে দিতে?'

যেন ছেড়ে দেওয়ায় নীলা সম্পূর্ণ খুশি হয়নি। যেন হুঁকো বন্ধের ভয়ে আগেকার দিনের মত ছোট বোনকে বারতে পার করে দিলেই অসিত ভাল করত।

ছেলের পাতে ভাত নেই। অরুন্ধতী ফের ভাত আনতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ থেমে দাঁড়ালেন, বললেন, 'তাই নাকি? ওসব গুণও হয়েছে নাকি অসিতের? আজকাল সিগারেট খায় নাকি ও?'

কৃত্রিম গাম্ভীর্যে নীলা বলল, 'হ্যাঁ মা খুব। তোমার ছেলের গুণের আর অবধি নেই। প্যাকেটে কুলোয় না, কৌটা ভরে ভরে সিগারেট আসে আজকাল—'

অরুন্ধতী বললেন, 'সত্যি?'

অসিত বলল, 'আচ্ছা পাগল তুমি মা, নীলা তোমাকে ক্ষ্যাপাচ্ছে বুঝতে পারছ না?'

অরুন্ধতী হাসলেন, 'ও তাই বল, ভারি ফাজিল হয়েছিস্ তো নীলা, এমনি স্বভাব নিয়ে স্কুলে তুই কি করে মাষ্টারী করিস শুনি? মেয়েরা মানে তোকে?'

নীলা বলল 'খুব মানে মা, মানবে না কেন বল? মেয়েদেরও ধরে ধরে এই সব শিখিয়ে দি। বলি গুরুজনের সঙ্গে খুব করে ইয়ার্কি দিয়ো তোমরা, তাঁরা যদি রাগ করে ধমক দিতে আসেন বলে দিয়ো "বড়

যদি হ'তে চাও ছোট হও তবে।" কিন্তু আমার ক্ষিদে পেয়েছে মা। আমিও বসে যাই। তোমার মেজো মেয়ের সন্ধ্যা পূজো কখন শেষ হবে তার তো কিছু ঠিক নেই।'

অরুন্ধতী একটু হাসলেন, 'আমি তো তখনই বলেছিলাম, তুই বস, আর কারো জন্যে তোকে ভদ্রতা করতে হবে না।'

নীলা বলল, 'না বিশেষ ক'রে দাদার জন্য ভদ্রতা ক'রে মোটেই লাভ নেই আজকাল, যা দাও লোভী স্বার্থপরের মত চেটে পুটে খেয়ে নেয়। বাটিতে না রেখে যায় এক টুকরো মাছ না একটু তরকারি। দাদার জন্য অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই মা, যাই মেজদিকে ডেকে নিয়ে আসি।'

নীলা উঠে পাশের ঘরে চলে গেল। একুশ বাইশ বছরের মেয়ে, কিন্তু গড়নটা তেমন বাড়ন্ত নয়, ছোট খাট চেহারা, মুখের ভাবখানাও বেশ মিষ্টি কচি কচি। অনায়াসে বছর তিনেক বয়স গোপন করা চলে। অরুন্ধতী তা করেনও। কারো কাছে দু' বছর কমান, কারো কাছে তিন। কিন্তু অনর্থক লোকের কাছে মিথ্যা কথা বলা, যে জন্য কমানো তা কোন দিন হবে না, এ মেয়ে যে আর বিয়ে করবে না তা অরুন্ধতী জানেন।

খেতে খেতে অসিত বলল, 'নীলার স্বভাবটা ফের বদলেছে তাই না মা? মাষ্টারী নেওয়ার পর থেকে অল্পবয়সী ছাত্রীদের সঙ্গে মিশে ওর সেই ছেলেমানুষী ভাবটা ফিরে এসেছে, কি বল?'

অরুন্ধতী ছেলের দিকে একটু তাকালেন, তাকিয়ে থেকে ক্লিষ্ট বিষণ্ণ ভঙ্গিতে হাসলেন, 'তুই একটা পাগল খোকন, ছেলেবেলা বুঝি কারো কোন দিন ফিরে আসে? মেয়েদের কোন দিনই আসে না। তবে কেউ কেউ বহুকাল পর্যন্ত ছেলেমানুষ থাকে। যেমন তুই।'

খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরও অসিত শূন্য থালায় আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে জিভ দিয়ে চুষতে লাগল। অরুন্ধতী ছেলের এই আবাল্যের অভ্যাসটির দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইলেন; তারপর বললেন, নে এবার ওঠ।'

অসিত বলল, 'উঠি। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও নীলা সে সব ব্যাপার ভুলে যায় নি, কি কোন দিন ভুলে যাবে না?'

অরুন্ধতী তর্ক করলেন না, ছেলের কথা স্বীকার করে বললেন, 'আমি কি বলেছি যাবে না? থাক ওসব কথায় আর দরকার নেই, এবার তুই ওঠ দেখি, উমারা এসে বসুক, কি হোল চাকরির, কি বললেন তোর মাষ্টার মশাই তা তো কই বললিনে।'

অসিত বলল, 'বলব, তোমাদের খাওয়া দাওয়া হোক, তারপর ধীরে সুস্থে সব শুনো। এমন কিছু শুনবার খবর নয়।'

অরুন্ধতী বললেন, 'কেন চাকরি পাওয়ার কি আশা নেই? কোন ভরসাই দিল না সুরো ঠাকুরপো? এত করে লিখলাম।'

অসিত একটু রুক্ষস্বরে বলল, 'ভরসা একেবারে দেবেন না কেন, দিয়েছেন, কিন্তু বললাম তো সবই বলব। আগে খেয়ে দেয়ে এসো।'

অরুন্ধতী ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'আচ্ছা বাপু আচ্ছা, ইচ্ছা হয় বলিস না হয় না বলিস। দিনের পর দিন কেমন যে তিরিক্ষে মেজাজের সব হয়ে যাচ্ছিস তোরা।'

অসিত লজ্জিত হয়ে বলল, 'রাগ করলে নাকি মা?'

ততক্ষণে নীলা আর উমা সরু বারান্দাটুকু পার হয়ে এ ঘরের চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

অরুন্ধতী কোন কথা বললেন না, তাঁর হয়ে নীলাই জবাব দিল, 'না, মনের সাধে বকবে ধমকাবে তবু মা রাগ করবে কেন, এ বাড়িতে রাগ করবার অধিকার কেবল দাদারই—কি বল মেজদি?'

অসিত একটু হাসল, 'উমা, নীলা কি রকম শত্রুতা করছে দেখ আমার সঙ্গে?'

উমা এ অভিযোগের কোন জবাব না দিয়ে মৃদু হাসল, তারপর বলল, 'উদ্বোধনের উপনিষদ গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডখানা এনেছ নাকি দাদা?'

অসিত একট থমকে গিয়ে চুপ ক'রে রইল, তারপর অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে

বলল, 'ওই যাঃ, আজও তো ভুলে গেছি। বিকেলে ফের যখন বেরুব তখন নিয়ে আসব। কিন্তু কেন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস উমা ? কি হবে ও সব পড়ে ?'

উমা দুটি প্রশ্নের কোনটিরই জবাব না দিয়ে মৃদু একটু হাসল, তারপর শান্তভাবে বলল 'মনে ক'রে এনো কিন্তু।'

নীলার চেয়ে দু' বছরের বড় উমা, অসিতের চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট, কিন্তু তার ভাব দেখলে মনে হয় বয়সের তার আর কোন গাছ-পাথর নেই। এ যুগের মেয়ে নয় যেন উমা, এ শতকের মেয়ে নয়। একালে অল্প বয়সে কোন মেয়ে কি আর বিধবা হয় না ? কিন্তু উমার মত এমন স্বভাব কার হয় ? শুচিতায়, আচার-নিষ্ঠায়, শাস্ত্রপাঠে উমা তার মাকে অনেকখানি পিছনে ফেলেছে। বছর চারেক হোল বিধবা হয়েছে উমা। পাঁচ বছরের একটি ছেলেও আছে তার। ঠাকুরমার কাছ ছাড়া সে থাকতে পারে না, তাই তাকে রেখে আসতে হয়েছে। তার জন্ম তেমন যেন দুঃখ নেই উমার, তার লক্ষ্য উর্ধ্বলোকে। দুর্বোধ্য রহস্যঘন আধ্যাত্মিকতায় তার চারদিক ঘেরা।

উমার ঘরে ঢুকলে অসিতের মনে হয় যেন উনবিংশ শতাব্দীতে ঢুকেছে। দেয়ালে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি, তাক ভরা রামায়ণ, মহাভারত, গীতা শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন সংস্করণ, কেরোসিনের মাঝারি ধরণের একটা প্যাকিং বাক্সে তৈরি মন্দির তার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, শ্বেত চন্দন মাখা তুলসীতে পায়ের দিকটা আর দেখা যায় না। মাঝে মাঝে আসন পেতে সেই মূর্তির সামনে উমাকে বসে থাকতে দেখা যায়। কখনো বা বালিসের ওপর ভাগবতখানা রেখে গালে হাত দিয়ে তন্ময় হয়ে থাকে। তার দেড় হাত চওড়া চার হাত লম্বা বাজে কাঠের পুরানো তক্তপোষে। তক্তপোষখানা পুরনো হলে হবে কি তার ওপর বিছানাটুকু ভারি যত্ন ক'রে পাতা। সাদা ধবধবে চাদর। দেখলেই মনে হয় এই মাত্র বাক্স থেকে বের করেছে। সাদা ঢাকনিতে ঢাকা দুটো

বালিস, সন্ধ্যায় যেমন দেখা যায় সকালেও তাই, ঠিক তেমনি ফুলানো ফাঁপানো নিটোল শুভ্রতা। মনে হয় না উমা এসব ব্যবহার করেছে, রাত্রে শুয়ে ঘুমিয়েছে। বিছানা তো নয় যেন রাশি রাশি ফুলের স্তবক। আর সে ফুল সাদা ফুল। বৈধব্যের এই শুভ্র বেশ ভারি মানিয়েছে উমাকে। সাদা ব্লাউস, সাদা থান ছাড়া আর কোন বেশ যেন এখন উমার আর কল্পনা করা যায় না। তবু মাঝে মাঝে মন যেন ভারি অস্থির হয়ে ওঠে অসিতের। ইচ্ছা করে সব ভেঙেচুরে ছত্রছান ক'রে ফেলে, দুই কাঁধ ধ'রে আচ্ছা ক'রে উমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, কেন এসব মিথ্যা ভড়ং? সুধীরের স্মৃতি কি তোর কাছে এত প্রিয়? সেই পরম কাপুরুষ রাস্কেলটাকে তুই কি সত্যিই ভালোবাসিস?

কিন্তু এসব প্রশ্ন দাদা হয়ে বোনকে করতে নেই, করবার কোন সুযোগই তাকে দেয় না মা। তাছাড়া এ ধরনের কোন প্রসঙ্গ উঠলে উমা হয় অন্য কথা পাড়ে, না হয় নিজেই উঠে যায়, কিংবা হেসে চুপ করে থাকে, তার সেই হাসির কোন মানে বুঝতে পারে না অসিত।

কিন্তু কেবল উমাকে নয়, এ প্রশ্নটা নীলাকেও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে অসিতের। কুমারী নীলার অবশ্য বৈধব্যের কোন ভড়ং নেই। সে রঙিন শাড়ি সেমিজ পরে, হাসে, গল্প করে, স্কুলে পড়ায়, বাইরে থেকে ভারি স্বাভাবিক দেখা যায় নীলাকে। একই ঘরের মাঝখানে কালো পর্দা টাঙিয়ে দক্ষিণের দিকটায় নীলা ভারি অগোছালো, এলোমেলো খোপটুকুর মধ্যে দিন কাটায়। এ যেন বৈধব্যের আর এক প্রচ্ছন্ন নিগূঢ় রূপ। তার ঘরের দেয়ালে কোন মহাপুরুষের ছবি নেই। কেবল দু' একখানা ক্যালেণ্ডার, কেবল এ বছরের নয়, পুরনো বছরেরও। বইপত্র এলোমেলোভাবে বিছানায় ছড়ানো। বিছানার রঙিন চাদরে কালির দাগ। এই ঔদাসীন্যের হেতু কি? নীলাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে অসিতের, ইচ্ছা করে তাকে একবার জিজ্ঞেস করে, তুইও কি ভুলতে পারিস নি সেই [illegible]? গোপনে গোপনে তুইও কি

সুধীরের জন্য এখনো শোক করিস? শোক করতে লজ্জা করে না তোর?

কিন্তু এ সব কথা ছোট বোনকে জিজ্ঞেস করতে অসিতের নিজের লজ্জা করে। কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হয়, তা ছাড়া অসিতের এই আচরণে অরুন্ধতী কষ্ট পান। তিনি আড়ালে ডেকে বার বার নিষেধ করেন ছেলেকে, 'ছিঃ এসব কি প্রবৃত্তি তোর? বোনেদের এ সব ব্যাপারের মধ্যে কেন আসবি তুই? তা ছাড়া পুরনো ঘাকে খুঁচিয়ে তুলে কি লাভ আছে কিছু? তুই চুপ করে থাক, আপনিই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কিন্তু ঠিক হলো, কই? পটেসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে সুধীর মরেছে আজ চার বছর হোল। কিন্তু তার সেই অস্বাভাবিক, অবৈধ মৃত্যুর ছায়াটা তাদের সংসার থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। কিছুতেই যেন স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসছে না উমা আর নীলা। ছোট বোনের কালির দাগ মাখা বিছানার চাদরটা তুলে ফেলে গুটিয়ে রাখা বিছানার ওপর মাথা রেখে ক্লান্তিতে হাত পা ছড়িয়ে দিল অসিত। নিজের ঘরে যাওয়ার উপায় নেই। সেখানে বোনেদের নিয়ে মা খেতে বসেছেন। যৌথভাবে মায়ের সঙ্গে ঘরখানাকে নিতে হয়েছে অসিতের। দু' খানার মধ্যে সেই ঘরখানাই একটু বড় বলে তাতেই গৃহস্থালী পেতেছেন অরুন্ধতী। খোলা বারান্দার খানিকটা অংশ ঘিরে নিয়ে রান্নার ব্যবস্থা। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পাট সারতে হয়, অসিতের শোয়ার ঘরেই।

নীলার তক্তপোষের হাত দেড়েক উত্তরেই পর্দা টাঙানো। পর্দার দিকে অসিত তাকিয়ে একটু হাসল। ফাঁক দিয়ে আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে উমার গৃহসজ্জা। এই পর্দার ব্যবধানে উমা আর নীলা কতটুকু আড়াল রাখতে পারে পরস্পরকে? ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা, জিঘাংসা কতটুকু ঢাকা থাকে এই পাতলা পর্দায়?

কিন্তু না, মনে যাই থাকুক সুধীরের মৃত্যুর পর উমা আর নীলা এখন আর ঝগড়া করে না আগের মত, মুখ দেখাদেখিও আর বন্ধ নেই তাদের

মধ্যে। ঘরের মধ্যে কেবল কালো পর্দাই টাঙায় নি ওরা, পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য না থাক সভ্যতার পর্দাও টাঙিয়েছে। নীলা আর উমা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে, হাসে, গল্প করে। পাশাপাশি বসে খায়, যদিও একজন আমিষ, একজন নিরামিষ। যদিও দুজনের আচার-আচরণ, চাল-চলন পৃথক, যদিও এই দুই মেরু-বাসিনীর মধ্যে কোন মনের মিল নেই। যদিও পরস্পর পরস্পরের জীবনের ব্যর্থতার কারণ হয়ে রয়েছে। আশ্চর্য, তবু প্রতিমুহূর্তে ঠোকাঠুকি বাধে না। অদ্ভুত ক্ষমতা সভ্যতার পাতলা পর্দাটার।

'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি দাদা?' নীলা এসে ঘরে ঢুকল, 'এই নাও তোমার সুপুরি।'

একটু তন্দ্রার মত এসেছিল অসিতের। নড়ে চড়ে উঠে বসল।

নীলা বলল, 'অনেকক্ষণ suspense রেখেছ। এবার চাকরির খবরটা খুলে বল।'

মা আর বোনদেব কাছে সব কথা খুলেই বলল অসিত। চাকরি দিতে রাজি হয়েছেন সুরপতি বাবু। কিন্তু তিন মাস পঞ্চাশ টাকায় এ্যাপ্রেন্টিস থাকতে হবে। তারপর চাকরি পাকা হ'লে দশ পনের টাকা বাড়তে পারে।

শুনে অরুন্ধতী খানিকক্ষণ গম্ভীরমুখে চুপ করে রইলেন। তাঁর এম. এ. পাশ করা ছেলের দাম যে শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ টাকা ধার্য করবেন সুরপতি চক্রবর্তী এটা তিনি আশা করেন নি। তাঁর আই. এ পাশ মেয়েও তো মাষ্টারী করে পঞ্চাশ টাকার বেশি রোজগার করে। ভারি লজ্জা করতে লাগল অরুন্ধতীর। এই জন্যই কি অত অনুনয় বিনয় করে, অত পূর্ব পরিচয়ের দোহাই পেড়ে তিনি সুরপতিকে চিঠি লিখেছিলেন! ইচ্ছা করতে লাগল চিঠিখানা তিনি ফেরৎ আনেন। কিন্তু তাতো আর সম্ভব নয়, স্বামী বলতেন হস্তচ্যুত পাশা, পাশার দান একবার পড়ে গেলে আর ফেরানো যায় না। সেই দান অনুযায়ীই ঘুঁটি চালতে হয়। বন্ধুদের সঙ্গে স্বামীকে পাশা খেলতে দেখেছেন অরুন্ধতী। কিন্তু সুরপতির সঙ্গে এখানেই সব

খেলা তিনি শেষ করে দেবেন। ঘুঁটি আর তিনি চালবেন না, ও পথ আর মাড়াতে দেবেন না অসিতকে। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। দুটো টিউশনি করলেও ওর চেয়ে বেশি আয় করতে পারবে অসিত, এখন একটা টিউশনি তো আছে। নীলাও যা হোক কিছু করছে। একেবারে না খেয়ে তো আর কেউ নেই, চলুক যে ভাবে চলছে। তারপর সরকারী হোক বেসরকারী হোক কিছু না কিছু অসিত একটা খুঁজে নিতে পারবেই।

মার মনের কথারই যেন প্রতিধ্বনি করল নীলা, 'মাত্র পঞ্চাশ টাকা? বলতে লজ্জা করল না সুরপতিবাবুর? তোমার মতো মুখচোরা মানুষকে দিয়ে কোন কাজ হবে না দাদা। পঞ্চাশ কেন পঁচিশ টাকা বললেও তোমার মুখ দিয়ে হয়তো রা বেরুতনা! সুরপতিবাবুকে স্পষ্ট শুনিয়ে দিয়ে এলেই পারতে পঞ্চাশ টাকায় এম. এ পাশ ছেলে মেলেনা?'

অসিত একটু হাসল, 'কি করে শোনাব নীলা। তিনি যখন তাঁর পে-বুক খুলে আমাকে দেখিয়ে দিতেন গণ্ডায় গণ্ডায় এম. এ. পাশ ছেলে পঞ্চাশ টাকায় চাকরি করছে তাঁর ব্যাঙ্কে তখন কি করতাম? সুরপতিবাবু ব্যবসায়ী মানুষ, তিনি বাজার দর জানেন বলেই তো অমন অসঙ্কোচে আমার খাঁটি দাম বলতে পারলেন।'

নীলা রাগ করে বলল, 'তুমি তো ওই করেই গেলে। নিজের দাম বাজারে গিয়ে জোর গলায় হাঁকতে পারলে না। জানো কেবল ঘরে বসে অভিমানে ঠোঁট ফুলোতে। থাকগে, মাষ্টার মশাইকে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে আজই বিকালে একটা চিঠি লিখে দাও, তাঁর বদান্যতার জন্ম কোটি কোটি ধন্যবাদ।'

পর্দার ওপাশে শ্রীমদ্ভাগবতের পাতা খুলে বসেছিল উমা। পারতপক্ষে এদের সাংসারিক আলোচনায় সে আসতে চায় না, নিজের পড়াশুনো, পূজা আর্চা ধ্যান ধারণা নিয়েই থাকতে ভালোবাসে, থাকেও। কিন্তু আজ পর্দার অন্যপাশে যে সাংসারিক আলোচনা শুরু হয়েছিল, তাতে শ্রীমদ্ভাগবতে নিজের অভিনিবেশ সে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারল না। বৈষয়িক

আলাপের জন্ম নয়, ওদের অবৈষয়িক বুদ্ধিই উমাকে উত্যক্ত ক'রে তুলল।

পাতলা পর্দার দিকে তাকিয়ে উমা নীলার কথার জবাবে হঠাৎ বলে উঠল, 'তুই একটু থাম দেখি নীলি। সমস্ত পৃথিবীটা তোর তেজের জোরে, তোর ঠাট্টা তামাসার ভয়ে রাতারাতি বদলে যাবে না। দিন-কালের অবস্থা বুঝে সবাই চলে, আমাদেরও চলতে হবে। আমি তো বলি চল্লিশ হোক পঞ্চাশ হোক চাকরি তুমি নিয়েই নাও দাদা। গোড়াতে অমন ছোট হয়ে ঢুকতে হয়, তাতে দোষ হয় না। তারপর তোমার ভিতরে যদি জিনিষ থাকে, তোমাকে পঞ্চাশ টাকায় বেঁধে রাখবেন স্থরপতি-বাবুর সাধ্য কি, কাজকর্ম শিখে তুমি তখন অন্য কোন বড় ব্যাঙ্কেও চলে যেতে পারবে; পঞ্চাশ টাকা তো ভালো, বেকার বসে থাকার চাইতে বিনে মাইনের বেগার খাটলেও লাভ আছে। ভবিষ্যতে কিছু একটা করবার আশা থাকে।'

উমা ফের তার বইয়ের পাতায় চোখ দিল।

অসিত আর নীলা দুজনেই এক সঙ্গে মার দিকে তাকাল। একটু বাদে অসিত বলল, 'তুই হাসছিস কেন নীলা, উমা তো ঠিকই বলেছে। তোদের চাইতে ওর বিষয়বুদ্ধি অনেক বেশি।'

নীলা হঠাৎ বলে উঠল, 'তা জানি। দিদি অর্থও চেনে পরমার্থও চেনে।'

'নীলা!'

পর্দার ওপাশ থেকে উমার তীক্ষ্ণ চাপা গলা শোনা গেল।

মুহূর্তকাল সবাই স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর অসিত বলল, 'ছিঃ, ও কথা বলা তোর ঠিক হয়নি নীলা।'

নীলা অদ্ভুত একটু হাসল, 'আমি কিছু ভেবে বলিনি দাদা।'

অরুন্ধতীও তিরস্কার করলেন ছোট মেয়েকে, 'কেন তুই ও কথা বলবি। ওর আছে কি, অপঘাতে মরেছে বলে সুধীরের লাইফ ইনসিওরেন্সের টাকাগুলি তো পেলইনা, একমাত্র তার প্রভিডেন্ট ফণ্ডের

টাকা কটা, আর তার পকেট থেকে দু'এক টাকা করে নিয়ে নিয়ে যা জমিয়ে ছিল তাই তো সম্বল। সব শুদ্ধ পুরো হাজার চারেকও হবে না বোধ হয়।'

নীলা বলল, 'সে হিসাব তোমার কাছে কে চাইছে মা।'

অরুন্ধতী বললেন, 'না, তাই বলছি। আমিই ওকে বকে দিয়েছি ও টাকা থেকে এক পয়সাও তুই ভাঙিসনে। সারা জীবন পড়ে রয়েছে সামনে, অসুখ আছে, বিসুখ আছে, কত আপদ বিপদ আছে মানুষের। একেবারে নিঃসম্বল হয়ে কি কারো থাকা উচিত। তারপর একটা বাচ্চাও রেখে গেছে সুধীর। তার ভবিষ্যতের ভাবনাও তো ওকেই ভাবতে হবে। কাকা আর ঠাকুমার আদরে তো চিরদিন কাটবে না।'

নীলা বলল, 'ও সব পুরনো কথা কেন তুলছ, কে শুনতে চাইছে? ও সব কথার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?'

বলতে বলতে নীলা হঠাৎ থেমে গেল। তারপর একটুকাল চুপ ক'রে থেকে অসিতের দিকে তাকাল নীলা, 'এর চেয়ে আমি কোন হোষ্টেলে টোষ্টেলেই উঠে যাব দাদা। সেই ভালো, এভাবে একসঙ্গে থাকাটা কিছুতেই সম্ভব হবে না। থাকা উচিতও নয়।'

অসিত বলল, 'কেন?'

নীলা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'কেন তা তুমি নিজে বোঝনা? মিছিমিছি অশান্তি ডেকে এনে লাভ কি।'

অসিত বলল, 'কি পাগলামি শুরু করলি। অশান্তির আবার কি হোল।'

নীলা বিরক্তির ভঙ্গিতে বলল, 'কি না হয়েছে। তুমি যদি বুঝেও না বোঝ দেখেও না দেখ তা হলে আর কি করতে পারি বল। এক জায়গায় থাকতে হলেই দু এক সময় কথা কাটাকাটি হয়, হাসি ঠাট্টা হয়, কিন্তু সব কিছুতেই যদি শুধু মহাভারত নয় গীতা মস্তাগবৎ শুদ্ধ, অশুদ্ধ হয়ে যায়, তা হলে আর মানুষ থাকে কি করে।'

অরুন্ধতী বললেন, 'আঃ থাম না বাপু। একটা কথা না হয় হয়েছে তাই বলে সারাদিন ধরে গজগজ করবি। কই, উমা তো তারপর আর একটা কথাও বলেনি। চুপচাপ নিজের মনে কাজ করে যাচ্ছে। তোকে একটুও দোষারোপ করেনি। অথচ দোষ তো তোরই।'

নীলা তীব্র দৃষ্টিতে মার দিকে তাকাল, 'আমার দোষ?'

অরুন্ধতীও কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, তোর দোষ ছাড়া কি।'

নীলা বলল, 'শুধু আমার দোষ? এতদিন বাদে তুমি ফের সেই কথা বলতে শুরু করেছ? দিদির নিজের কোন দোষ ছিল না, তার স্বামীর কোন দোষ ছিল না, সমস্ত দোষের বোঝা মা হয়ে তুমি আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছ?'

অরুন্ধতী বললেন, 'হ্যাঁ, চাপাচ্ছি। আর কেউ হলে লজ্জায় মুখ তুলে কথা বলতে পারত না, তুই বলে পারিস। বোন হয়ে বোনের যে সর্বনাশ তুই করেছিস আর কেউ হলে সেই লজ্জায় সেই অনুতাপে দিদির পায়ের ধুলো হয়ে থাকত। কিন্তু তুই নির্লজ্জ বেহায়া বলে ফের ওই হতভাগীকে খোঁটা দিস, রাতদিন খিটিমিটি বাঁধাস, টিট্‌কিরি মারিস। ছি ছি ছি, তুই না লেখাপড়া শিখেছিস, দু' দুটো পাশ দিয়েছিস—।'

নীলা হঠাৎ চুপ করে গেল। আগে আগে এসব ধিক্কারে ওর দু'চোখ জলে ভরে উঠত, এখন শুধু জ্বলে।

অসিত বোনের বালিশের ওপর কনুই রেখে অধশোয়া হয়েছিল এবার উঠে বসে রুক্ষস্বরে বলল, 'তোমরা মনের সাধ মিটিয়ে ঝগড়া কর মা, আমি চলে যাই বাসা ছেড়ে। আশ্চর্য, এত অভাব অনটন, কি দিয়ে সংসার চলবে সেই ভাবনা ভেবে মানুষ অস্থির। আর তোমাদের বর্তমান নেই, ভবিষ্যৎ নেই, তোমরা আছ কেবল দিনের পর দিন অতীতের নোংরা নর্দমা ঘাঁটতে। আমি চলে যাব, নিশ্চয়ই চলে যাব।'

রাগ ক'রে অরুন্ধতী বললেন, 'তুই যাবি কেন, আমাকেই কোথাও দিয়ে আয়। খুঁজলে আত্মীয় স্বজন আমার এখনো অনেক আছে। কাজ

কর্ম করলে একবেলা একমুঠো ভাত আর বছরে একজোড়া থান আমাকে তারাও দিতে পারবে।'

নীলা বলল 'তার দরকার কি, আমাকে নিয়েই তো যত গণ্ডগোল, আমিই চলে যাই। এত হোষ্টেল আছে, বোর্ডিং আছে, কোথাও জায়গা একটু জুটবেই। না জোটে তো সেই রেশিডেনসিয়াল টিউশানিটাই নেব। তবু তোমরা শান্তিতে থাক।'

সে দিন একজন বিপত্নীক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছোট ছোট দুটি ছেলে-মেয়েকে পড়াবার প্রস্তাব করেছিলেন। বলেছিলেন ইচ্ছা করলে নীলা তাঁর বাড়িতেও একটা ঘর নিয়ে থাকতে পারে। কোন অসুবিধা নেই, বিনোদ বাবুর একজন বিধবা পিসিমা থাকেন তাঁর সঙ্গে। ছেলে মেয়ে দুটি বড় দুরন্ত, তাদের যদি নীলা একটু আগলায় থাকা খাওয়া ছাড়াও পঞ্চাশ টাকা ক'রে তিনি ওকে দেবেন।

নীলা হাসতে হাসতে গল্প করেছিল, 'এ বাজারে অফারটা খুবই লোভনীয়। কিন্তু একটু ভয়ও আছে। হয়তো দুদিন যেতে যেতেই পিসিমার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ হওয়ার প্রস্তাব ক'রে বসবেন। তখন শুধু থাকা খাওয়া। ভদ্রলোকের রকমসকম দেখে তাই মনে হোল।'

আজ আবার সেই কথা উল্লেখ করায় অরুন্ধতী চটে গিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ তুই ওই রকম যাবি। তোর যা মন মতি তাতে ওই রকমই গতি হবে তোর। না হলে এতদিন বিয়েটিয়ে ক'রে ঘর গৃহস্থালী করতিস্। কোন কেলেঙ্কারী থাকত না।'

এতক্ষণে পর্দা সরিয়ে উমা এল এ পাশে। পরনে ধবধবে সাদা থান, গায়ে সাদা ব্লাউস, গলায় এক চিল্‌তে সরু হার চিক চিক করছে। পিঠের ওপর ছড়ানো কালো মসৃণ এক রাশ ভিজে চুলের পশ্চাৎ-পটে ওর সুগৌর তনু দেহ ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। শান্ত স্নিগ্ধ বিষণ্ণ গাম্ভীর্যের ছাপ ওর ছোট কপালে, আয়ত গভীর চোখে, চাপা ঠোঁটে যেন নিবিড় হয়ে রয়েছে।

অরুন্ধতী দীর্ঘশ্বাস চাপলেন। পেটের ছেলেমেয়েদের মধ্যে উমাই সব চেয়ে সুন্দরী অথচ ওর কপালই এমন ক'রে পুড়ল।

মার দিকে তাকিয়ে মৃদু তিরস্কারের সুরে উমা বলল, 'তোমরা কি শুরু করেছ মা? তোমরা কি আমাকে কোথাও টিকতে দেবেনা একটু? যার জন্যে ছেলে ছেড়ে এলাম, শ্বশুর শাশুড়ী দেওরের সংসার ছেড়ে এলাম, এখানেও তাই? তোমরা কি কিছু ভুলতে পারবে না, ভুলতে দেবেনা আমাকে?'

অরুন্ধতী গভীর দুঃখে আর অভিমানে বলে উঠলেন, 'তুই আমার চোখের আড়ালে কোথাও চলে যা উমা। সেই ভালো। আমি আর এ সব দেখতে পারিনে, সইতে পারিনে।'

উমা বলল, 'বেশ তাই যাব। আমি তো আর চিরদিনের জন্ম থাকতে আসিনি। তোমরা না বললেও আমি যেতাম।'

অরুন্ধতী আর কোন কথা বললেন না। আজকালকার দিনে কি হয়েছে সব ছেলে মেয়েরা, তারা কেবল মার মুখের কথার অর্থ ধরে; কথার আড়ালে মন যে জলে পুড়ে খাক হয়ে যায়, তার দিকে তাদের একবারও চোখ পড়ে না।

এবার আর কনুইয়ের উপর মাথা না রেখে নীলার ময়লা বালিসে দোয়াতের কালি ঢেলে পড়া বিছানাটার ওপর একেবারে টান হয়ে শুয়ে পড়ে অসিত বলল, 'যাক বাঁচা গেল। এতক্ষণে বাসা একেবারে পরিষ্কার। মা যাবে আত্মীয় স্বজনের কাছে, নীলা যাবে হোষ্টেলে, আর উমা কোন আশ্রমে-টাশ্রমে গিয়ে উঠবে। আর আমি সেই ফাঁকে বিয়ে থা করে দিব্যি সংসার পাতিয়ে বসব। এইটা হবে বসবার ঘর আর পাশেরটা শোয়ার। চমৎকার হবে। মা, উমা, নীলা তোমরা আজই এক ঘণ্টার নোটিশে সব খালি করে দাও, পাটরি বোঁচকা বেঁধে ফেল। আমি বউ আনব।'

অরুন্ধতী এতক্ষণে একটু হাসলেন, 'আর জ্বালাসনে বাপু। তুই বউ আনবি আর তা আবার দু'চোখে আমি দেখব!'

অসিত বলল, 'তা তো দেখবেই না। তুমি দু'চোখে তাকে দেখতে পারবে না তা আমি এখন থেকেই টের পাচ্ছি। তাই তো আগে আগেই তোমাকে বিদায় করতে চাই। যাও, ও ঘরে গিয়ে বাক্স-টাক্স সব গুছিয়ে ফেল, আর দেরি কোরো না, যাও।'

অরুন্ধতী হাসি মুখে উঠে যেতে যেতে বললেন, 'তা যেন গেলাম, তুইও আয়। একটু ঘুমিয়ে নে। সারাটা দুপুর তো টো টো করে এলি। বেলাও আর বেশি নেই।'

অসিত বলল, 'তুমি যাও মা, বউ এলে এ ঘরটা বাইরের ঘর হলে ভালো হবে না, এটাকেই ভিতরের ঘর করব, নীলা আর উমার সঙ্গে একটু পরামর্শ ক'রে আমি এলাম বলে।'

অরুন্ধতী বললেন, 'জ্বালা!'

কিন্তু ভিতরে এই মুহূর্তে তাঁর আর কোন জ্বালার চিহ্ন নেই। তিনটি ছেলেমেয়ের দিকে একবার স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন অরুন্ধতী।

উমাও চলে যাচ্ছিল। অসিত তাকে হাত ধরে মাথার কাছে টেনে বসাল, 'যাচ্ছিস কোথায়, বোস। বললাম না পরামর্শ আছে। নীলা আমার পা'টা একটু টিপে দে না। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি। ভারি টন টন করছে।'

নীলা তবু চলে যাচ্ছে দেখে অসিত বলল, 'এই ভালো হবে না কিন্তু। উমাকে হাত ধরে টেনে এনেছি বলে তোকে কিন্তু অত খাতির করব না, উঠে গিয়ে চুলের মুঠি ধরব।'

নীলা হাসল না, কিন্তু দাদার পায়ের কাছে বসে বলল, 'ব্যাপার কি, হঠাৎ এত স্ফূর্তি কি দেখে হল তোমার? চাকরি পেয়ে নাকি?'

অসিত একবার ছোট বোনের মুখের দিকে তাকাল। নীলার মুখ উমার মত সুন্দর নয়।

ওর গায়ের রঙ শ্যাম, কপালটা চওড়া। নাক চোখা নয়, ঠোঁট দুটি একটু

পুরুই বলা যায়। উমার মত স্নিগ্ধ বিষণ্ণ-সৌন্দর্যের ছাপ নেই মুখে। অন্তরের জ্বালা এখনো ওর মুখের দিকে তাকালে টের পাওয়া যায়। বুঝতে পারা যায় নীলা এখনো ভোলে নি, ও কাউকে ক্ষমা করে নি। সুধীরকে নয়, দিদিকে নয়, নিজেকেও নয়। দুঃসহ অবিস্মরণীয় এক জ্বালায় ও নিজেকে ভাস্বর করে রেখেছে। সেই ওর রূপ। হঠাৎ যেন মনে হয় উমার রূপ ওর কাছে তুচ্ছ। নীলার এই অদ্ভুত রূপই কি সুধীরকে টেনেছিল ?

নীলা চোখ নামিয়ে দাদার পায়ের আঙুল টেনে দিতে লাগল।

অসিত তার সেই আনত মুখের দিকে তাকিয়ে একটু নিঃশ্বাস ফেলল। সত্যি এই দুটি বোনের কাছে তার লঘুচাপল্য, মনের স্বাভাবিক প্রসন্নতা প্রকাশের অধিকার নেই, এ ঘরে আনন্দের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু আজ মনে হোল অসিত ভুল করেছে। ওদের অতীত দুঃখের, কিন্তু শ্রদ্ধার নয়, স্মরণীয় নয়। কেন ওদের এই অস্বাভাবিক দুঃখবিলাসকে এমন ক'রে প্রশ্রয় দেয় অসিত ? কেন অতীতকে আঁকড়ে থাকতে ও সাহায্য করে ? অসিতের উচিত ওদের ফের বিয়ে দেওয়া। শুধু নীলাকে নয়, উমাকেও। একটি ছেলে আছে উমার তাতে কি হয়েছে ? এক ছেলে নিয়ে ও সারা জীবন কেন ভুলে থাকবে ? আলাদা আলাদা ভাবে দুজনে ফের ঘর বাঁধুক, সংসার করুক, সুন্দর স্বাভাবিক পরিবেশে একটি বিকৃত অসুস্থ অধ্যায়কে চিরদিনের মত ভুলে যাক, কিন্তু এখনো সরাসরি ওদের কাছে একথা পাড়বার সময় হয়নি, অন্ততঃ সাহস হয়নি অসিতের। নীলার কথার জবাবে অসিত বলল, 'শুধু যে পঞ্চাশ টাকার চাকরির লোভেই আমার এত স্ফূর্তি হয়েছে তা ভাবিস কেন। দেখেছিস উমা, ও কি রকম কাঙাল মনে করে আমাকে?'

উমা নিঃশব্দে দাদার ঘন বড় বড় চুলের মধ্যে আঙুল বুলাতে লাগল। চাকরি সম্বন্ধে আর কোন কথা সে বলবে না। একটু আগেও এই নিয়ে অনর্থ বেধেছিল।

পায়ের কাছ থেকে নীলা বলল, 'কাঙাল তোমাকে কে বলে। কিন্তু কি রেখে এলে তাই শুনি।'

অসিত চপল ভঙ্গিতে বলল, 'যা দেখলাম তার তুলনা হয় না। শুনলে তুই তো তুই, উমা পর্যন্ত হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরবে।'

উমা একটু হেসে বলল, 'তাই নাকি ?'

অসিত বলল, 'তা ছাড়া কি, যেমন রূপ তেমনি গুণ। উমার চেয়ে বেশ লম্বা। আমার মাথা প্রায় ছুঁই ছুঁই করে। উমার রঙ ফর্সা, আর তার রঙ সোনালি হলদে। নাক চোখ উমার চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর।'

মাথা তুলে অসিত উমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, একটু হাসি ফুটেছে বোনের বিষণ্ণ মুখে।

নীলা বলল, 'কিন্তু চুল ? দিদির মত অত চুল আছে তার মাথায় ?'

অসিত বলল, 'নেই আবার ? তবে আর বলছি কি ? চুল গোড়ালি পর্যন্তই পড়ত। কিন্তু তাতে মহা বিপদ, জড়িয়ে গিয়ে পদে পদে আছাড় খায়। তাই খাটো ক'রে কেটে তাকে শুধু কাঁধ পর্যন্ত নামতে দিয়েছে। চমৎকার মানিয়েছ যাই বলিস।'

নীলা মুখ টিপে হেসে বলল, 'হুঁ, তা তো মানাবেই, এই তো গেল রূপ। তারপর তোমার রাজকন্যার গুণের বর্ণনাটা এবার শুনি।'

অসিত বলল, 'শুনবি আবার কি, রাজকন্যা হয়ে জন্মেছে এই তো সব চেয়ে বড় গুণ, এ গুণের তুলনা আছে নাকি ?'

নীলা বলল, 'তবু বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়টা এবার শুনি।'

অসিত বলল, 'তা বিদ্যা আছে বই কি ; তোর মত আই. এ. অবধি পড়ে টাকার অভাবে পড়াতে শুরু করেনি। এম. এ. তে ফিলজফির ফার্স্টক্লাস ডিগ্রি নিয়ে তবে থেমেছে। কেবল সুদর্শনাই নয়, সুদার্শনিকও।'

নীলা বলল. 'না, তাহলে আর কোন আশা নেই, রাজকন্যার ক্লাশটা তোমার চেয়েও দেখছি এক ধাপ উঁচু।'

অসিত বলল, 'এক ধাপ বলিস কিরে, অনেক ধাপ। সে রাজকন্যা আর আমি কোটালপুত্র।'

দুজনেই একটু চুপ করে রইল। উমা আগের মতই অসিতের চুলের

মধ্যে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'তোমার মাথায় বড় ময়লা জমেছে দাদা, সাবান দিয়ো।'

নীলা বলল, 'বড়ই আফশোষের কথা। কিন্তু রাজকন্যার নাম ধামটা এবার বল দাদা, আমরা দেখি চেষ্টাচরিত্র করে। অনেক সময় কোটালপুত্রও তো—'

অসিত বলল, 'না চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না নীলা। রাজামশাই তেমন চরিত্রের লোকই নন। অনেক অনুনয় বিনয়ের পরে তিনি একটু সদয় হয়ে বললেন, কোটালপুত্র, অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যাই তোমাকে দিতে পারতাম কিন্তু জেনারেল ম্যানেজারকে তা দিয়ে রেখেছি। আপাততঃ পঞ্চাশ টাকার কেরাণীগিরি ছাড়া আর কিছু খালি নেই। খুশি মনে ওই তুমি নাও, তারপর তোমার হাতযশ আর আমার মরজি।'

নীলা ঠোঁট চেপে হাসল, 'ও, সুরপতিবাবুর মেয়ের কথা বলছিলে বুঝি, তাই বল। আমি এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি।'

নীলার মুখ দেখে অবশ্যি বোঝা গেল সে অনেকক্ষণ আগেই বুঝতে পেরেছে।

এবার ভারি লজ্জিত হোল অসিত। বোনেদের আনন্দ দিতে গিয়ে নিজের এ-ধরণের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়বে, তা সে ভাবতে পারেনি। অবশ্য ব্যাপারটা কৌতুক ছাড়া কিছু নয়, তবু নীলা আর উমা যদি অন্য কিছু ভাবে। কেমন যেন একটু অস্বস্তিবোধ করল অসিত।

একটু বাদে ছোট বোনকে ধমক দিয়ে বলল, 'বুঝবার আবার কি আছে। ভারি বুদ্ধির ধাড়ী হয়েছিস কিনা, নে, আঙুল তো একটাও মটকাতে পারলিনে, এবার পায়ে ভালো করে একটু হাত বুলিয়ে দে দেখি।'

তারপর কথায় মোড় ফেরাবার জন্য উমাকে বলল, 'বাবার কথা মনে আছে উমি? ছেলেবেলায় বাবাও এমনি তক্তপোষে শুয়ে

থাকতেন। আমি মাথায় পাকা চুল তুলতাম, তুই পায়ে হাত বুলাতিস, দুজনে দুটো করে পয়সা পেতাম। নীলা ঘুম থেকে উঠে তাই দেখে হিংসায় জলত, কেঁদে কেটে ভাগ না নিয়ে ছাড়ত না, মনে আছে তোর?'

উমা মৃদু কণ্ঠে বলল 'আছে দাদা।'

অসিত আস্তে আস্তে চোখ বুজল।

কিন্তু উমার চোখের সামনে আর একটি দৃশ্য ভেসে উঠল, বাবা নয়, উমার স্বামী সুধীর শুয়ে আছে বিছানায়। উমা বসে আছে মাথার কাছে, নীলা ঠিক এমনি করে তারও পায়ে হাত বুলোচ্ছে।

হঠাৎ পা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে নীলা বলেছিল 'ঈস্ ভারি দায় পড়েছে আমার পা টিপব। পদসেবার অধিকার যার আছে তারই থাক, পরের শ্রীচরণে আমার লোভ নেই।'

সুধীর হেসে বলেছিল, 'আহা রাগ করছ কেন। কাল আবার জায়গাটি বদলে নিয়ো। তা হলেই হবে। তোমরা দুটি হলে সোনার কাঠি আর রূপার কাঠি। শিথানে পৈথানে বার বার অদল বদল করতে হয়। একটির ছোঁয়ায় ঘুম আসে, আর একটির ছোঁয়ায় ঘুম ভাঙে।'

উমা বলেছিল 'কার ছোঁয়ায় তোমার ঘুম ভাঙে?'

সুধীর জবাব দিয়েছিল, 'কার আবার? দেখনা পায়ের তলায় কি রকম সুড়সুড়ি দিচ্ছে। এই, ভালো হবে না কিন্তু নীলু।'

ভালো হয়ওনি।

মুহূর্তের জন্য উমার বুকের ভিতরটা ফের আবার জ্বালা ক'রে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংযত ক'রে ছোট বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বলল, 'দাদা ঘুমিয়ে পড়েছে। তুইও যা, মার কাছে একটু শুয়ে থাক গিয়ে, আমি উঠি, দ্বাদশ স্কন্ধটা আজ বুঝি আর শেষ হোল না।'

নীলা দিদির দিকে একবার তাকাল তারপর উমার প্রায় পায়ে পায়েই পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

পরদিন বেলা এগারটার সময় দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের সামনে গিয়ে উপস্থিত হোল অসিত। ক্লাইভ রো'য়ের ওপর ব্যাঙ্কের নিজস্ব ছ'তলা বাড়ি। ডাইনে বাঁয়ে দু'দিকে বড় বড় পিতলের ফলক। বাঁ দিকে বাংলায় ডান দিকে ইংরেজী অলঙ্কৃত অক্ষরে দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের নাম মুদ্রিত। একপাশে গোঁফওয়ালা একটি হিন্দুস্থানী দারোয়ান বন্দুক হাতে ব্যাঙ্কের নিরাপত্তা রক্ষা করছে। বহুলোক ভিতরে যাচ্ছে, অনেক লোক বেরিয়ে আসছে। সকলের মুখে ব্যস্ততার ভাব। অসিত এক মুহূর্ত একটু ইতঃস্তত করল। তারপর আরো কয়েকজনের পিছনে পিছনে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

ডানদিকের একটি মাঝারি টেবিলে একখানা ফলক দাঁড় করানো আছে 'Enquiry'. সামনে খান তিনেক চেয়ার জুড়ে আগন্তুকরা বসে রয়েছেন। তাঁদের পিছনে বেঁটে ফর্সা একজন ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে কি যেন তাঁদের বুঝাবার চেষ্টা করছেন।

অসিত তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখুন।'

ভদ্রলোক একটু কর্কশ স্বরে বললেন 'আমার দেখবার সময় নেই। দেখছেন না কথায় আছি। বসুন একটু।'

বসবার যে আর স্থান নেই সে কথা উল্লেখ না ক'রে অসিত দাঁড়িয়েই রইল। ভদ্রলোক জন দুই আগন্তুককে saving account খোলার নিয়মাবলী বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। মিনিট পাঁচেক পরে তিনি ফের তাকালেন অসিতে দিকে, 'হ্যাঁ, বলুন এবার? কি এ্যাকাউন্ট খুলবেন? সেভিংস, না কারেন্ট?'

অসিত বলল, 'আজ্ঞে কোন এ্যাকাউন্টই খুলতে চাই না। আমি চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'দেখা করতে এলেই কি দেখা হয় মশাই? তিনি আজ কদিন পরে অফিসে এলেন। ভয়ানক ব্যস্ত। বড় বড় পার্টি পর্যন্ত আজ তাঁর ঘরে ঢুকতে পারছে না আর আপনি তো—'

অসিতের বেশবাসের দিকে তাকিয়ে বাকি অপ্রিয় কথাটা বলতে ভদ্রলোকে কষ্ট হোল। অনুকম্পার ভঙ্গিতে তিনি একটু হাসলেন, 'আপনার কি দরকার বলুন না।'

অসিত বলল, 'দরকারটা চেয়ারম্যান জানেন। তিনিই আমাকে আসতে বলেছেন।'

ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ও তিনিই আসতে বলেছেন? তাঁর সঙ্গে আপনার আগের পরিচয় আছে বুঝি?'

অসিত গম্ভীরভাবে বললেন, 'হ্যাঁ, একটু বিশেষ পরিচয়ই আছে।'

ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'সে কথা আগে বলতে হয়। দেখুন দেখি আমি ভেবেছি—।' তারপর বেয়ারাকে ডেকে ধমকের সুরে বললেন, 'এই শীতল, একটা চেয়ার দে এখানে। তোদের আক্কল কি বল দেখি। ভদ্রলোক কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন একটা চেয়ার দিতে পারিস নে?'

কতকগুলি পাশ-বুক বয়ে এনে শীতল টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'আমাকে কেন ধমকাচ্ছেন বিষ্ণুবাবু। বাড়তি চেয়ার আর কই। কোত্থেকে আনব চেয়ার।'

বিষ্ণুবাবু আবার গর্জে উঠলেন, 'ফের মুখে মুখে কথা। বড় বাড় তোদের। কোত্থেকে আনব। বাড়ি থেকে গড়িয়ে আনবি, বাজার থেকে কিনে আনবি। হতভাগা কোথাকার। এত বড় ব্যাঙ্কে একখানা চেয়ার নেই।'

ইতিমধ্যে সামনের একখানা চেয়ার খালি ক'রে দিয়ে এক ভদ্রলোক উঠে গেলেন।

বিষ্ণুবাবু সাদরে অসিতকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, 'বসুন বসুন। মাথার ঠিক থাকে না মশাই। আগে ছিল শুধু এনকোয়ারি

এখন এ্যাকাউণ্টস খোলার কাজও দেখতে হয়। ঝামেলা কি কম। আর এত সব ছ্যাঁচড়া পার্টি আসবে। ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। বোঝাতে বোঝাতে গলা বুজে আসে মশাই। ও শীতল এক কাপ চা এনে দে তো বাবা, চা চলবে?' অসিতের দিকে তাকিয়ে বিষ্ণুবাবু মৃদু হাসলেন।

অসিত মাথা নেড়ে বলল, 'না না চায়ের দরকার নেই। তার চেয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে যদি একটু তাড়াতাড়ি দেখা করবার ব্যবস্থা করে দেন—'

বিষ্ণুবাবু বললেন, 'অবশ্য অবশ্য। ব্যবস্থা তো আপনিই ক'রে এসেছেন। আমাদের আর করবার কি আছে। একটা স্লিপ এনে দে তো শীতল শিগগির।'

ভিজিটিং স্লিপে নিজের পুরো নাম লিখে দিল অসিত। শীতল সেই স্লিপখানা পৌঁছে দিয়ে এল চেয়ারম্যানের খাশ বেয়ারা অদ্বৈতের হাতে। আর আশ্চর্য দু' তিন মিনিটের মধ্যেই ডাক পড়ল অসিতের।

বিষ্ণুবাবু সম্ভ্রম ভরে অসিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, আসুন। কিছু মনে করবেন না স্যার। আমি চিনতে পারিনি।'

অসিত কোন জবাব দিল না। বেয়ারার সঙ্গে যেতে যেতে মনে মনে ভাবল, দু দিন বাদে বিষ্ণুবাবু সত্যিই যখন চিনতে পারবেন পঞ্চাশ টাকার কেরাণী ছাড়া সে আর কিছু নয়, তখন তার সম্বন্ধে ভদ্রলোকের কি ধারণাই না হবে। নিশ্চয়ই ভাববেন এতখানি আপ্যায়ন অভ্যর্থনা নেহাতই বাজে খরচ করছেন।

স্প্রিংয়ের দরজা ঠেলে অসিত চেয়ারম্যানের ঘরে ঢুকল। সামনে কয়েকখানা গদি আঁটা চেয়ার। চেয়ারগুলি সম্প্রতি খালি। উত্তরদিকের দেয়ালে গান্ধীজির একখানা পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। সুরপতিবাবুর বেশবাস দেখলে তাঁরই একান্ত অনুরক্ত শিষ্য ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। পরনে খদ্দরের ধুতি। গায়ে খদ্দরের সাদা পাঞ্জাবি। ভারি সরল অনাড়ম্বর

মানুষ। এত বড় জাঁকাল জমকাল ব্যাঙ্কের যে এমন একজন সাদাসিধে আটপৌরে চেয়ারম্যান থাকতে পারে তা যেন মনেই হয় না।

সুরপতি তাঁর সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'বোসো।'

অসিত বিনীতভাবে চেয়ারখানায় বসলে তিনি কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কালো ফ্রেমে আঁটা পুরু চশমার ভেতর থেকে এক জোড়া তীক্ষ্ণ চোখ যেন অসিতের অন্তঃস্থলে গিয়ে পৌঁছুতে চাচ্ছে।

সুরপতিবাবু বললেন, 'তারপরে মন স্থির ক'রে ফেলেছো? তুমি ইচ্ছা করলে আবো দু'চার দিন সময় নিতে পার। আমার আপত্তি নেই। চাকরি তোমার জন্যে খালি থাকবে।'

অসিত বলল, 'না', আব সময় নেওয়ার দরকার হবে না। আমি চাকরি করব ঠিক কবেছি।'

সুরপতি বাবু বললেন, 'বেশ, সর্ত্তগুলি ভালো করে ভেবে দেখেছ তো? এখন পঞ্চাশ টাকার বেশি দিতে পারব না। তাবপব কাজকর্ম শিখে নিয়ে —তোমার যোগ্যতার ওপর সব নির্ভর করবে।'

অসিত বলল, 'সে তো আগেই বলেছেন।'

সুরপতি বাবু বললেন, 'তুমি যাতে ভালো ক'রে ভেবে দেখতে পার তাই আরো একবার বলছি। শেষে অনুতাপ অনুশোচনা না হয়। অনিচ্ছুক অসন্তুষ্ট কর্মচারী নিজের আর ইনষ্টিটিউশনের দুইয়েরই ক্ষতি করে।'

অসিত বলল, 'আশা করছি আমার দ্বারা তেমন কোন ক্ষতি হবে না।'

সুরপতি বাবু বললেন, 'খুব খুশি হলাম। যে সব ছেলের মধ্যে আত্ম-প্রত্যয় আছে তাদের এক আধটু ঔদ্ধত্যও আমি সহ্য করি। কিন্তু "কোন ক্ষতি হবে না" এই প্রতিশ্রুতিই সব চেয়ে বড় নয়। আমি নেতি-বাদী নই, পরম অস্তিবাদী। তুমি এমনভাবে কাজ করবে যাতে তোমারও লাভ, যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করবে তারও লাভ। আর কাজ যদি করতে

চাও, যথেষ্ট স্কোপ এখানে পাবে। সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের সব ছেলে, এ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন কারো আছে কারো বা নেই। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আমি যোগ্য লোককে সুযোগ দিতে কার্পণ্য করিনি।'

দেয়ালে ডান দিকে ভারতবর্ষের একটা বড় ম্যাপ টাঙানো। সুরপতি সেই দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে তাকালেন, 'দেশের সব জায়গায় সবগুলি বড় বড় শহরে দেশলক্ষ্মীর ব্রাঞ্চ ছড়ানো। কোন কোন ব্রাঞ্চে এমন ম্যানেজারও আছে বিদ্যায় যারা শুধু ম্যাট্রিকুলেট কিন্তু বুদ্ধিতে কর্মক্ষমতায় তা নয়। এক পয়সা সিকিউরিটি না নিয়ে আমি তাদের দায়িত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছি। ভাবতে পার? অন্য কোন ব্যাঙ্ক এ কথা কল্পনাও করতে পারে না। আমার অন্য সব ব্যাঙ্কার বন্ধুরা, এমন কি এই ব্যাঙ্কেরই অন্য সব ডিরেকটররা সাহস দেখে অবাক হয়ে গেছেন। আমি তাদের বলেছি পাঁচ হাজার দশ হাজার সিকিউরিটি নিয়ে কি হবে যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে কারবার। আসলে মানুষ চিনতে পারা চাই; মানুষই আসল, টাকাটা আসল নয়।'

সিগারেট কেস খুলে এবার একটা সিগারেট ধরালেন সুরপতি। তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'এত কথা তোমাকে বললাম তুমি আমার প্রথম যৌবনের ছাত্র বলে। তোমার মা আমার প্রথম যৌবনের—'একটু ঢোক গিলে সুরপতি বললেন, 'বন্ধুপত্নী বলে। ভাল কথা, তাঁর শরীর কেমন আছে আজকাল?'

অসিত গম্ভীর মুখে বলল, 'তিনি ভালোই আছেন।'

সুরপতি হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন ক'রে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি তাহলে আজ থেকেই কাজে লেগে যাও। শুভস্য শীঘ্রম্। আজ বিকেলেই জেনারেল ম্যানেজার তোমাকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে দেবেন। আজ অবশ্য ঘণ্টা খানেক দেরিতে তুমি এসেছ। এত দেরি হ'লে চলবে না।'

অসিত বলল, 'তা জানি। দশটায় ব্যাঙ্ক বসে।'

সুরপতি বাবু বললেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু তোমাকে এসে বসতে হবে আরো দশ পনের মিনিট আগে। যাক এখানকার নিয়মকানুন তুমি ক্রমে ক্রমে জানতে পারবে, আশা করছি মানতেও পারবে।'

সুরপতি বাবু একটু হেসে বেল টিপলেন।

খাশ বেয়ারা অদ্বৈত এসে সেলাম করে দাঁড়াল। বছর তিরিশেক বয়স হবে লোকটির। কালো ছিপছিপে চেহারা। মুখখানা গোবেচারা গোছের। কিন্তু চোখ দুটি দেখলে মনে হয় অতখানি গোবেচারা নয়। ভিতরে ভিতরে বেশ বুদ্ধি রাখে।

সুরপতি বাবু বললেন, 'অদ্বৈত, জেনারেল ম্যানেজার সাহেবকে সেলাম দাও। আর আমাকে চা দাও এক কাপ।'

অদ্বৈত বলল, 'সে কি বড় বাবু। একটু আগেও দিদিমণি আমাকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন আপনাকে যেন ঘন ঘন চা না দিই।'

সুরপতি বাবু বললেন 'না, মেয়েটার জ্বালায় আর পারা গেল না। সে বাড়িতে বসেও আমার খবরদারী করবে, কড়া পাহারা দেবে। এ ব্যাপারে বুলু তার মাকেও ছাড়িয়ে গেছে।'

হঠাৎ একটু থেমে গেলেন সুরপতি বাবু। মৃত স্ত্রীর কথা স্মরণ ক'রে তাঁর এই ভাবান্তর ঘটল না কি বাইরের একটি লোকের সামনে পারিবারিক প্রসঙ্গ উঠে পড়ায় তিনি অপ্রস্তুত হলেন বোঝা গেল না।

একটু বাদে জেনারেল ম্যানেজার অবনীমোহন এসে দাঁড়ালেন। একটা বড় ব্যাঙ্কের পদস্থ কর্তাব্যক্তির মতই চেহারা। অসিত এঁকে চেয়ারম্যানের বাড়িতে সেদিন দেখেছিল। কিন্তু সেখানকার চেয়েও এই ব্যাঙ্কে যেন অবনীমোহনকে আরো বেশি মানিয়েছে।

সুরপতিবাবু অসিতকে দেখিয়ে বললেন, 'সেই ছেলেটি আবার এসেছে অবনী, দেখ একটা ব্যবস্থা-ট্যবস্থা যদি কিছু এঁর করে দিতে পার।'

অবনীমোহন গম্ভীরভাবে বলল 'এঁকে নেওয়া ঠিক হয়েই গেছে।'

সুরপতিবাবু একটু কৌতুকের ভঙ্গিতে বললেন 'তাই নাকি। তবে তো ঠিক হয়েই আছে। তবে আর কি।'

অবনীমোহন অসিতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে। আমি এবার যাই মিঃ চক্রবর্তী। ঘরে অন্য লোক আছে। একটু ব্যস্ত ছিলাম কথায়।'

সুরপতি বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। সাহেবসুবো মানুষ। তোমাদের সর্বদাই তো ব্যস্ত থাকতে হয়। কখনো কথায়, কখনো কাজে।'

অবনীমোহন এ কথার কোন জবাব না দিয়ে গম্ভীরভাবে বেরিয়ে এল। চেয়ারম্যানের এই রসিকতায় সে খুশি হয় নি। অসিতের মত একজন অধঃস্তন কর্মচারীর সামনে এ ধরনের রসিকতা সুরপতি যেন না করলেই ভালো করতেন।

এর পর অবনীমোহন অসিতকে নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এ্যাকাউণ্ট্যাণ্টকে বললেন, 'বিনয় বাবু, এ ভদ্রলোক আজ থেকে আমাদের এখানে কাজ করবেন। ক্লিয়ারিংএ লোক সর্ট আছে আপনি সেদিন বলেছিলেন। ইচ্ছা করলে এঁকে সেখানেও দিতে পাবেন। দু'তিন মাসের মধ্যে এঁকে সব ডিপার্টমেণ্ট ঘুরিয়ে আনতে হবে। আশা করি অল্প দিনের মধ্যেই ইনি সব বুঝে শুনে নিতে পারবেন।'

বিনয় বিনীত ভাবে বলল, 'আজ্ঞে তা আর পারবেন না কেন।'

জেনারেল ম্যানেজার চলে গেলে বিনয় একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল' 'বসুন।'

তারপর একটি বেয়ারাকে ডেকে বললেন, 'ফটিক, ক্লিয়ারিং এর মাধব বাবুকে একটু ডেকে দে তো।'

বেঁটে মোটা ফর্সামত আর একটি কেরাণী এসে দাঁড়াল। বছর ত্রিশ বত্রিশ হবে বয়স। পানের রসে ঠোঁট লাল। কানেও একটি লাল পেনসিল।

'ব্যাপার কি বিনয় বাবু।'

'ব্যাপার একটু আছে। আপনার ওখানে কি সত্যিই হ্যাণ্ড সর্ট।'

'সে তো আপনাকে দিন পনর ধরেই বলছি।'

'তাহলে এই ভদ্রলোককে নিন। ইনি অবশ্য নতুন। দু'তিন দিন একটু দেখিয়ে শুনিয়ে নিতে হবে।'

মাধব অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বলল, 'তাহলে আর দরকার নেই বিনয় বাবু, আপনার দান ফিরিয়ে নিন। যত আনাড়ি সব বুঝি আমার কপালে।'

বিনয় বলল, 'আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। পেট থেকে পড়েই কি আপনি সব কাজকর্ম শিখে নিয়েছিলেন? জেনারেল ম্যানেজার বিশেষ করে ওকে আপনার ডিপার্টমেন্টেই দিতে বলে গেলেন। এখন আপনার ইচ্ছা।'

মাধব বলল, 'তাতো ঠিকই। আমার ইচ্ছাও যা ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাও তাই। আসুন মশাই আসুন। কি নাম আপনার?'

অসিত নিজের নাম বলল।

মাধব নিজেদের টেবিলের কাছে যেতে যেতে বলল 'আনাড়ি বলায় সত্যি সত্যিই তো রাগ করেন নি আপনি?'

অসিত একটু হেসে বলল, 'রাগ কেন করব। আনাড়িকে আনাড়ি বলেছেন।'

মাধব বলল, 'ঈস্ আপনি দেখছি বিনয়ের একেবারে অবতার। এখানে আনাড়ি মশাই সবাই। নাড়ী আর কার আছে বলুন? কিন্তু এত জায়গা থাকতে এই গোয়ালে ঢুকতে এলেন কেন?'

অসিত বলল, 'এক গোয়ালে না এক গোয়ালে ঢুকতে তো হবেই।'

মাধব বলল, 'তা বটে। গোটা দুনিয়াটাই তো গোয়াল। আপনার সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে। আসুন।'

উত্তর-পশ্চিম কোনে ক্লিয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট। দু'খানা টেবিল লম্বালম্বি ভাবে জোড়া। দু'পাশে সারি সারি চেয়ারে জন পাঁচ ছয় যুবক ঘাড় গুঁজে কাজ করছে। অসিত তাদের সারিতে আসন নিল।

মাধব সকলের সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'ইনি আমাদের

আনকোরা নতুন কলীগ। আমাদের পরিচয় আমাদের কাজেই মালুম। বসুন দাদা, বসে বসে দুনিয়ার হাল চাল দেখুন। হাতের কাজ সেরে নিই তারপর আপনার সঙ্গে প্রাণ ভরে আলাপ করব।'

অসিত বলল, 'আমাকে কিছু কাজ দেবেন না।'

মাধব বলল, 'বসুন দাদা, কাজের ভাবনা কি। কাজ তো জীবন ভরেই করবেন। আজ তো সবে হাতে খড়ি, আজকের দিনটা একটু প্রাণ ভরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিন।'

অসিত আর কোন কথা না বলে সহকর্মীদের কাজের ধারা লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ ছাব্বিশ সাতাশ বছরের আর একটি যুবক তার দিকে এগিয়ে এল, 'আরে অসিত, তুমি যে এখানে। দার্শনিকের কি এই স্থান?'

অসিত বলল, 'আমিও সেই কথা বলি শ্যামল। কবিরও তো এটা যোগ্য স্থান নয়। তারপর তোমার কাব্যচর্চা কেমন চলছে?'

দুজনে এক সঙ্গে পড়ত। কলেজ ম্যাগাজিনের পাতায় লেখা বেরুত দুই বন্ধুর।

শ্যামল মৃদু হেসে বলল, 'সে পাট অনেকদিন চুকে গেছে। এখন লেজারের খাতায় যোগ বিয়োগ করি।'

অসিত বলল, 'কতদিন ধরে আছো এখানে?'

শ্যামল বলল, 'তা মাস ছয়েক হোল। কিন্তু এত জায়গা থাকতে তুমি এখানে কেন তাই ভাবছি।'

অসিত হেসে বলল 'এখানে না এলে কি তোমার সঙ্গে এমন ক'রে দেখা হোত?' তারপর ইন্‌চার্জের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাধব বাবু, আমি একটু এর সঙ্গে কথা বলে আসি।'

মাধব বলল, 'বিলক্ষণ, হারাণো বন্ধুকে ফিরে পেলেন, কথা বলবেন বই কি। প্রাণভরে কথা বলুন, দিন ভরে কথা বলুন। কিন্তু দোহাই আপনাদের চেয়ারম্যানের ঘরে গিয়ে যেন প্রেমালাপ শুরু করবেন না।' মাধবের কথার ভঙ্গিতে তার সহকারীরা হেসে উঠল।

দুপুরটা শুয়ে-বসে কোন রকমে কেটেছে কিন্তু বিকেলটা যেন কিছুতেই আর কাটতে চাইছিল না সুজাতার। মাঝে মাঝে এমন হয়। সময় যেন একতাল ভারি সিসার মত অনড় অচল ভাবে স্থির হয়ে থাকে। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। অস্বস্তির যেন আর সীমা থাকে না। অথচ কোন দুঃখই তো নেই। সুজাতাদের মত সচ্ছল অবস্থা সংসারে ক'জনের। এই তেতলা বাড়িটির ভবিষ্যৎ মালিক সুজাতা নিজে। বাবার বহু টাকার বিষয় সম্পত্তির সুজাতা একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। এই টাকার পরিমাণ নিয়ে স্বজন বন্ধু থেকে শুরু ক'রে চাকর-বাকর দারোয়ান-বেয়ারার অনেক মন্তব্য কানে এসেছে সুজাতার। কেউ বলছে পঞ্চাশ লক্ষ, কেউ বলেছে কোটি। সুরপতি শুনে হেসেছেন 'ও সব কিছু বিশ্বাস করিসনে বুলু। বিশ্বাস করলেই ঠকবি। আমার মরবার পরে হয়ত দেখবি একটি ফুটো পয়সাও রেখে যাইনি।'

সুজাতা ধমক দিয়ে বলেছে 'বাবা, ফের যদি তুমি ওসব বলবে, আমি তোমার সঙ্গে আর কোন কথাই বলব না।'

সুরপতি তবু হেসেছেন 'কোন সব? কিছু না রেখে যাওয়ার কথা?'

সুজাতা বলেছে 'না ওই মরবার কথা। তুমি বুড়ো মানুষের মত এখনই মরবার কথা বলবে কেন? কি এমন বয়স হয়েছে যে তুমি ওসব বলবে?'

সুরপতি জবাব দিয়েছেন, 'আচ্ছা, আর বলবনা। মরবার কথা পাড়লেও সত্যি সত্যিই কি আমার মরবার জো আছে? তাহলে দেশলক্ষ্মীর কি হবে?'

সুজাতা ছদ্ম অভিমানের ভঙ্গিতে বলেছে, 'কেবল দেশলক্ষ্মী আর দেশলক্ষ্মী। আমি বুঝি তোমার কেউ নই?'

সুরপতি ছোট মেয়ের মত সুজাতাকে কোলের কাছে টেনে নিয়েছিলেন

'তুই আমার পূর্ণলক্ষী, তুই আমার প্রাণলক্ষী ! আমার দেশলক্ষী তো তোর জন্যেই ।'

আর কোন কথা বলেনি সুজাতা। বাবার গায়ের সঙ্গে গা মিশিয়ে চুপ ক'রে বসে রয়েছে। বাবা যখন আছেন তখন সব আছে, তার আর কিছুর অভাব নেই, আর কিছুর দরকার নেই।

কিন্তু এই মনোভাব তো সব সময় থাকে না। বেশিক্ষণ সুরপতি মেয়ের কাছে থাকতে পারেন না। তাঁর অনেক কাজ অনেক বিষয়-চিন্তা। সুরপতি যখন ব্যস্ত থাকেন তখন তাঁর আর এক মূর্তি। ভারি কাঠখোট্টা রূঢ়ভাষী বদমেজাজী মানুষ। চাকর বাকরকে গালাগালি করেন, বাড়ির আশ্রিতা বিধবা কাকিমাকে অকারণে বকেন, সুজাতাকেও বাদ দেন না। পারত-পক্ষে এ সময় বাবার কাছে ঘেঁষে না সুজাতা। দূরে দূরে আড়ালে আড়ালে থাকে। কিন্তু তাও থাকবার জো নেই। সুরপতি তাকে কোন না কোন অজুহাতে কাছে ডাকবেন আর সামান্য ত্রুটি, এমন কি কল্পিত বিচ্যুতির জন্যে বকবেন। দেখে দেখে সুজাতার এমন সহ্য হয়ে গেছে এর জন্য তার আর মন খারাপ হয় না। বাবার এই রূঢ় স্বভাব সে মেনে নিয়েছে। এই রুক্ষতার আড়ালে যে স্নেহের ফল্গুধারা আছে বাবার মনে, তার কথা তো সুজাতার অজানা নেই। তবু মাঝে মাঝে কেন যেন মন বড় খারাপ হয়ে ওঠে সুজাতার। এত বিত্ত বিভব, এত নিশ্চিন্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকেও মন ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। সুজাতা যেন বন্দিনী হয়ে আছে। বাবার স্নেহ আর শাসনের কারাগারে বন্দিনী। কি করতে হবে, কি পড়তে হবে, কাদের সঙ্গে মিশতে হবে, সব সুরপতি তাকে ঠিক ক'রে দিয়েছেন। এর কোন রকম ব্যতিক্রম ঘটলে তিনি রাগ করেন, দুঃখ পান। আর বাবাকে দুঃখ দিয়ে শান্তি পায় না সুজাতা। সুরপতি বলেন, 'বুলু, আর সকলের অবাধ্যতা আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু তোর নরম হাতের আঘাত আমি কিছুতেই সইতে পারিনে।'

সুজাতা জানে নরম কি কঠিন, আপন কি পর, কারো আঘাতই নিঃশব্দে

সহ্য করবার মত মানুষ সুরপতি নন। তিনি প্রত্যাঘাত দেবেনই। কারো কোন রকম অবাধ্যতাই তিনি সইতে পারেন না, সইতে চান না। কেন করবেন? তিনি যা ভালো বুঝবেন তা সকলের পক্ষেই ভালো। তিনি যা করবেন তাতে সকলেরই কল্যাণ। অন্তত সুজাতার তো নিশ্চয়ই। মেয়েকে তিনি এম. এ. পর্যন্ত পড়িয়েছেন। প্রত্যেক ক্লাসের পাঠ্য তিনি নিজে নির্বাচন করে দিয়েছেন। এমন কি তার ভাবীপতিও সুরপতি নিজে বেছে রেখেছেন। তাঁর বাছাই খারাপ হয়েছে একথা কেউ বলতে পারবে না। অবনী চাটুয্যে দেখতে সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান। বিদ্যায় বুদ্ধিতে সাধারণের চেয়ে অনেক উঁচুতে তার মাথা। ব্যাঙ্কের পরিচালনায় তার যোগ্যতা এবং কর্মদক্ষতারও পরিচয় পাওয়া গেছে। তার ওপর মেয়ের আর ব্যাঙ্কের ভার দিয়ে সুরপতি নিশ্চিন্ত হতে পারেন। আর সেই উদ্দেশ্যেই অবনীকে তিনি নিজের মনের মত করে গড়ে তুলেছেন। গড়ে তোলা ছাড়া কি। বিদেশী ডিগ্রী অবশ্য অবনীর আছে। কিন্তু ডিগ্রী থাকাই তো সব নয়। ডিগ্রীর পুঁথিগত বিদ্যাকে কি ক'রে কাজে লাগাতে হয় তা কাজের মানুষ সুরপতির কাছে থেকেই অবনীকে শিখে নিতে হবে।

নিজের মনোনীত পাত্রের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিয়ে সুরপতি বলেছেন 'আমি জোর করছিনে, হুকুম করছিনে। তুমি তো আর এখন ছোট মেয়ে নও। তোমার যথেষ্ট বুদ্ধি বিবেচনা হয়েছে। স্বামীকে তুমি নিজে বেছে নেবে।'

কিন্তু সুজাতা জানে বেছে নেওয়ার আর কিছু নেই। একাধিক কেউ থাকলে তো তাদের মধ্যে বাছাই চলবে। অবনী সুজাতার জীবনে একক। পিতার মনোনীত একমাত্র পুরুষ। একে তার পছন্দ করতেই হবে। এর আগে আরও কয়েকটি সম্বন্ধ সুজাতার এসেছে। সুরপতির সমব্যবসায়ী দু'একজন ব্যাঙ্কের বন্ধু কি কোন বীমা কোম্পানীর ডিরেক্টর, তাদের পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্যে সুরপতিকে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু বন্ধুদের কথায় সুরপতি কান পাতেন নি, তাঁদের অনুরোধ উপরোধ কৌশলে

এড়িয়ে গেছেন। কারণ সে সব ছেলের রূপ আছে তো গুণ নেই, গুণ আছে তো স্বাস্থ্য নেই। তারা কেউ সর্বাঙ্গসুন্দর নয়। কিন্তু অবনীর সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। কুলে-শীলে, পদে-সম্পদে কোথাও কোন খুঁৎ নেই অবনীর। আশ্চর্য, তবু খুঁৎখুতি আছে সুজাতার মনে। কেন যে এই খুঁৎখুতি তা সুজাতা কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারবে না। সে নিজেই কি বোঝে?

সুরপতির উদ্দেশ্যের কথা শুনে সুজাতা প্রথম দিনই বলেছিল, 'আমি কিন্তু বাবা বিয়ে করব না।'

সুরপতি হেসেছিলেন, 'তাই নাকি? তবে কী করবি?'

সুজাতা বলেছিল, 'কেন, করবার জিনিসের অভাব আছে নাকি সংসারে? চাকরি বাকরি করব, যেটুকু লেখাপড়া শিখেছি তাকে কাজে লাগাব।

সুরপতি বলেছিলেন, 'ওই হোলো তোদের ভুল। চাকরি করে লেখাপড়া কাজে লাগানো যায় না। চাকরি করতে করতে লোকে লেখা-পড়া ভুলেই যায়। আমার ব্যাঙ্কের বি. এ., এম. এ. পাশ ছেলেদের তো রোজই দেখছি। টাকা পয়সা খরচ ক'রে লেখাপড়া যে কোনদিন তারা শিখেছিল তা দেখলে মনেই হয় না।'

সুজাতা বলেছিল, 'তাঁদের আর দোষ কী বাবা। ব্যাঙ্কের ঐ যোগ-বিয়োগের কাজে পড়াশুনোর কি কোন দরকার হয় যে তা তাঁরা মনে রাখতে পারবেন?'

সুরপতি জবাব দিয়েছিলেন, 'আমিও সেই কথা বলি। মাষ্টারী প্রফেসারী ছাড়া সংসারে এমন কাজ খুব কম আছে যাতে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের চর্চা হয়ে যায়। জ্ঞান আর কর্ম দুই আলাদা আলাদা কাণ্ড, আলাদা আলাদা যোগ। নিষ্কাম কর্ম যদি সম্ভব নাও হয়, নিষ্কাম এমন কি নিষ্কর্মা না হলে জ্ঞানের চর্চা করা চলে না।'

বেশির ভাগ সময়ই অবশ্য সুরপতির ব্যাঙ্কের চিন্তায় ব্যাঙ্কের উন্নতির

চেষ্টায় ব্যয়িত হয়। বাকি যে সময়টুকু থাকে সুরপতি চুপ ক'রে বসে থাকেন না। পড়াশুনো করেন। কখনো সাহিত্য, কখনো দর্শন, কখনো বা রাজনীতি অর্থনীতি। এই বয়সে এত কাজ কর্মের মধ্যে ব্যস্ত থেকেও বাবার পড়াশুনোর আগ্রহ আর অভ্যাস সুজাতার মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। যত কুদর্শন আর রূঢ়ভাষীই হন তার বাবা, তাঁর মত এমন একই সঙ্গে জ্ঞানী আর কর্মী কেউ নেই। অবনীর সঙ্গে তুলনাটা সহজেই মনে আসে। তার ভদ্রতা আর বিজ্ঞতা যেন কেবল পোষাকে আর পারিপাট্যে, খানিকটা চালে, খানিকটা চলনে, তার চেয়ে বেশি গভীরে যেন নামতে জানে না অবনী। জীবন সম্বন্ধে, সাহিত্য দর্শন সম্বন্ধে, কোন গভীর উপলব্ধির কথা কোনদিন অবনীর মুখে শুনতে পায়নি সুজাতা। না, অবনী ঠিক তাদের মত নয়, ঠিক যেন সুজাতাদের জাতের নয়।

এরপর সুজাতা আবার নিজের কথায় ফিরে গিয়েছিল, 'আমিও তাই-ভেবেছি বাবা। বিয়েটিয়ে কিছু করব না। তুমি যেমন বললে সেই নিষ্কাম কর্মহীন জ্ঞানের চর্চায় জীবন কাটাব। আমরা একসঙ্গে থাকব বাবা। আমি কোনদিন তোমার কাছ ছাড়া হব না।'

সুরপতি মুহূর্তকাল মেয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে তার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলেছিলেন, 'দূর পাগলি। তাই কি কখনো হয়? ওভাবে কি কাছে থাকা যায়? ও-ভাবে কি কেউ কোনদিন নিজের মেয়েকে কাছে রাখতে পারে? তুই যখন পর হয়ে যাবি, স্বামী পুত্র নিয়ে আপন ঘর সংসারের মধ্যে সার্থক হবি তখনই আপন হবি তুই।'

সুজাতা তর্ক করেছিল, 'কিন্তু বাবা, ও ছাড়া সার্থকতার কি আর কোন পথ নেই? আমার জানা আরো দু'তিনটি মেয়ে বিয়ে করবে না বলে পণ করেছে। কেউ সাহিত্যের দিকে গেছে, কেউ বিজ্ঞানে, কেউ রাজনীতিতে। আজকাল মেয়েদের জীবনেও সার্থকতার আরো অনেক পথ আছে বাবা। তোমাদের ওই সেকেলে বাঁধা পথই একমাত্র পথ নয়।'

সুরপতি বলেছিলেন 'কিন্তু রাজপথ ওই বাঁধা পথেই। আজকাল

মেয়েদের মধ্যে বিয়ে না করার রেওয়াজ হয়েছে, তা আমিও জানি। বাপ মায়ের আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্যে অনেকেরই বিয়ে হয় না। এদের সংখ্যাই শতকরা নিরানব্বই। আর যারা নিজেরা ইচ্ছা ক'রে বিয়ে করতে চায় না তাদের কারো হয়ত বড় বেশি উঁচু নজর, কেউ হয়ত পছন্দমত স্বামী পেল না, কেউ হয়ত যাকে পছন্দ করেছিল তাকে পেল না, চির-কৌমার্যের পণ নিয়ে রইল। কিন্তু সে পণ সত্যি সত্যি শেষ পর্যন্ত ক'জনে রাখতে পারে?'

বাবার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে সুজাতার মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছিল। একটু বাদে সঙ্কোচ কাটিয়ে নিয়ে সে দৃঢ় স্পষ্ট গলায় বলেছিল, 'কিন্তু বাবা, তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল হচ্ছে না। সবাই যে ওই একই কারণে চিরকুমারী থাকে তা নয়। পুরুষের মত আজকাল মেয়েদের মনও জটিল। তাদেরও আশা-আকাঙ্ক্ষা বিচিত্র। এমন মেয়ে থাকতে পারে, যার মন মোটেই ঘরকন্নায় সায় দেয় না। ঘরকন্নার বাইরে সে হয়ত একক জীবনকেই ভালোবাসে—'

সুরপতি বাধা দিয়ে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ। তেমন স্বার্থপর মেয়ে যে দু' চারটি যে না আছে তা নয়।'

সুজাতা প্রতিবাদ করেছিল, 'স্বার্থপর?'

সুরপতি উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন, 'তা ছাড়া কি? উঁচু আদর্শের দোহাই দিয়ে যত গালভরা নামই দাও, একে স্বার্থপরতাই বলব। কেবল নিজে খাব, নিজে পরব, নিজের খেয়াল নিজের বাতিক নিয়ে পড়ে থাকব, সংসারে ঢুকব না আর কোন ঝামেলা ঝক্কি পোহাব না—কেবল আত্মবিলাস, একে স্বার্থপরতা ছাড়া আর কী বলব। দেখ, বুলু মেয়েরা সাধারণভাবে অমনিতেই স্বার্থপর। বিয়ের পরেও তারা স্বামী পুত্র ছাড়া কাউকে চেনে না, চিনতে চায় না। এরপর যদি তারা আবার অবিবাহিতা থাকে তাহলে নিজের দেহ, শুধু নিজের হাত পা, নাক, কান মুখ চোখ ছাড়া দুনিয়ায় তাদের আর কী বাকি থাকে বল তো?'

সমস্ত তর্ক আর আলোচনা বন্ধ ক'রে সুরপতি সকালের কাগজে শেয়ার মার্কেটের ওঠা-নামার দিকে চোখ দিয়েছিলেন। সুজাতা আর আলোচনা বাড়ায় নি। ভেবেছিল শত মিল থাকা সত্ত্বেও এইখানেই বড় রকমের অমিল। এখানেই তার আর বাবার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। বাবা শুধু তার হাত, পা, নাক, কান, চোখ, মুখ ছাড়া আর কিছু দেখতে পান না। বুঝতে চান না ও সব ছাড়াও সুজাতার মন বলে আরো কিছু বস্তু থাকতে পারে। সে মনের আলাদা রূপ আছে, রুচি আছে, স্বতন্ত্র দর্শন আর আদর্শ আছে। সে মন যদি কেউ না বোঝে, কাউকে বোঝাবার জো নেই। সেই গোপন মনের দ্বার সকলের কাছে খুলে ধরা যায় না। কারো কাছেই কি পারা যায়? সুজাতা তো আজ পর্যন্ত পারেনি। মন যখন খোলে, তখন আপনিই খোলে, তাকে জোর ক'রে খোলানো যায় না।

কদিন ধরে আবার সেই বিয়ের প্রস্তাব উঠেছে। অবনীর বাবা মা আর অপেক্ষা করতে রাজি নন। শুভ কাজ যত তাড়াতাড়ি হয়ে যায় ততই ভালো। তাঁরা সামনের বৈশাখেই বিয়েটা সেরে ফেলতে চান। এ সম্বন্ধে সুরপতিকে তাঁরা অনুরোধও জানিয়েছেন। বিয়ে হয়ে যাক। তারপর শরীর অসুস্থ বলে মেয়েকে যদি সুরপতি নিজের কাছে রাখতে চান তাঁরা আপত্তি করবেন না। তা ছাড়া সাদার্ণ এভেনিয়ু থেকে চারু এভিনিয়ু ক'মিনিটেরই বা পথ। বাড়ির গাড়িতে যতবার ইচ্ছা সুজাতা যাতায়াত করতে পারবে। কেউ কোন বাধা দেবে না। কিন্তু এভাবে শুভ কাজটাকে শুধু অনিশ্চিত সম্ভাবনার মধ্যে রেখে দেওয়াটা আর ভালো দেখায় না। অবনীর বাবার শরীরও তো ভালো নয়। কার যে কখন ডাক পড়বে তার কি কিছু ঠিক আছে?

কথাগুলি সুরপতিও চিন্তা ক'রে দেখেছেন। অবনীর বাবা অভয়চরণকে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে সত্যিই তাঁর আর দেরি করবার ইচ্ছা নেই। একগুঁয়ে মেয়েটার জন্যেই হয়েছে যত মুস্কিল। আর ছেলেবেলায় মা মারা যাওয়ায় স্বভাবটা বড় অভিমানী ধরনের হয়েছে। পিঠে হাত বুলানো ছাড়া

ওর কাছ থেকে কোন কাজ আদায় করবার জো নেই, মন থেকে কোন কথা বের করবার জো নেই। ধমক দিলেই বিগড়ে যায়। কিন্তু সুরপতি এবার নতুন পঞ্জিকা কিনে পাঠিয়েছেন জ্যোতিষার্ণবের কাছে। দিনক্ষণ এবার ঠিক ক'রে ফেলবেন। সুজাতাকে বলেছেন, 'তুমিও মন স্থির ক'রে ফেল বুলু। আর কিন্তু তোমার কোন অজুহাত শুনছিনে।'

অবনীও সেদিন কথায় কথায় বলেছে, 'বন্ধুরা সবাই ঠাট্টা করছে সুজাতা। বলছে তোমাদের এই মন জানাজানির পালা কি এই দু'বছরেও শেষ হ'লো না?'

সুজাতা জবাব দিয়েছে, 'তুমি তাঁদের বললেই পারতে যে ও পালার আরম্ভ আছে কিন্তু শেষ নেই। পালা যত বড়, তার তুলনায় দু'দশ বছর কিছুই নয়, বললেই পারতে তুমি।'

অবনী বলেছে, 'না সুজাতা আমি তা বলতে পারতাম না। আমি তো তোমার মত কবি নই। ব্যাঙ্কের লেনদেনের হিসেবের মধ্যে আমার দিন কাটছে। আমার হিসেবের খাতায় দু' বছরের সঙ্গে দশ বছরের অনেক তফাৎ।'

সুজাতা বলেছে, 'তা জানি।'

সব জানে সুজাতা, সবই বোঝে। কিন্তু মন থেকে যে সাড়া পায় না। কেমন যেন ভয় ভয় করে, কেমন যেন আশঙ্কা হয়। যদি না মেলাতে পারে তা হলে কি আর তখন ভুল শোধরাবার জো থাকবে?

অধীর অবনী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলেছিল, 'আচ্ছা আমি আজ যাই। দরকার আছে আমার।'

তারপর দিন তিনেকের মধ্যে অবনী আর আসে নি।

সুরপতি এরই মধ্যে উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেছেন। 'কী হয়েছে বুলু?'

সুজাতা বলেছে 'কী আবার হবে বাবা।'

'অবনী কদিন ধ'রে আসছে না কেন?'

'কি জানি, হয়ত আর কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।'

স্বরপতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়েছেন. 'উঁহু এ শুধু ব্যস্ততার জন্যে নয়। এই রবিবার ওকে চা য়ে বলিস।'

সুজাতা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে এসেছে।

কিন্তু এমন ক'রে তো এড়াতে পাববে না সুজাতা। বাবার ইচ্ছা, তাঁর আদেশ তাকে মানতেই হবে। তাই যদি হয় তাহলে প্রসন্ন মনে মেনে নেওয়াই ভালো।

দুধের কাপ হাতে অনুপমা এসে দাঁড়ালেন। সুজাতার বিধবা কাকীমা। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। চেহারা দেখে অবশ্য অতটা মনে হয় না, ঠিক স্থূলাঙ্গী বলা যায় না, তবে পুষ্টাঙ্গী, স্বাস্থ্যবতী। পরণে সাদা থান, কোথাও কোন আভবণ নেই। সুজাতা তাঁব এই বেশে অনেকদিন আপত্তি করে বলেছে 'কাকীমা আজকাল তো কালোপেড়ে শাড়ি সবাই পরে আপনিও তাই পরুন না। বড বিশ্রী দেখায়।'

অনুপমা হেসে বলেছেন, 'বিশ্রী দেখাবারই যে কপাল বুলু। শুধু শাড়িতে পাড় বসালেই তো আর পোড়া কপাল ঢাকবে না।'

অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন অনুপমা। সন্তান একটি হয়েছিল, তাও গেছে। এতদিন ছোট ভাইয়ের কাছে ছিলেন। কিন্তু অভাব অনটনের সংসারে ভাইয়ের স্ত্রীব সঙ্গে কিছুতেই বনিবনাও হয়নি। তাই শেষ পর্যন্ত এসে আশ্রয় নিতে হয়েছে জ্ঞাতি সম্পর্কে ভাসুর স্বরপতির কাছে। কাকীমার জন্যে ভারি মায়া হয় সুজাতার। যদি সময় থাকতে, বয়স থাকতে আর একবার বিয়ে করতেন, তাহলে ওঁকে আর এভাবে ভেসে ভেসে বেড়াতে হোত না। স্বামী পুত্র নিয়ে নতুন সংসারে সার্থক হতে পারতেন। কিন্তু এ সব কথা বলবার জো নেই। কাকীমা তাহলে তাঁর মুখ দর্শন করবেন না। ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা। সামান্য লেখাপড়া জানেন। নিজের বিশ্বাস সংস্কারকে প্রাণপণে আঁকড়ে রয়েছেন। এই সংস্কারকে অনর্থক আঘাত দিয়ে লাভ কি। সে সুযোগ যখন কিছুতেই ওঁর জীবনে

আর আসবে না তখন সে সব কথা তুলে অনর্থক ওর মনে অশান্তি আনবে কেন সুজাতা। তবু মাঝে মাঝে অদ্ভুত ইচ্ছা হয় তার। কাকীমার সঙ্গে সে এক সখ্যের সম্পর্কে এসে পৌঁছেছে। তাই কাকীমাকে একালের চিন্তাধারা, কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত করাবার লোভ হয় সুজাতার। কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারে না। অনুপমা তার সঙ্গে বেশি দূর এগোতে চান না।

দূর থেকে সুজাতার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কাছে এলেন অনুপমা, বললেন, 'দুধটুকু খেয়ে ফেল বুলু।'

সুজাতা বলল, 'আবার দুধ। আমাকে ডাকলেই তো আমি যেতে পারতাম কাকীমা। আপনি কেন নিয়ে এলেন।'

অনুপমা বললেন, 'ডাকিনি! ডেকে ডেকে হয়রাণ হয়ে গেলাম। তোমার কি কোন খেয়াল আছে কোন দিকে। এত কী ভাবছ বলতো। এত ভাববার কী আছে তোমার।'

সুজাতা একটু হাসল, 'ভাববার কিছু নেই বলেই বোধ হয় এই ভাবনা। কিন্তু কাকীমা দুধটা নিয়ে যান আপনি, দুধ আর এখন খাব না। আর আমি কি ছোট মেয়ে আছি যে সেধে সেধে আমাকে খাওয়াতে হবে। আমার যখন ক্ষিদে পাবে আমি নিজেই রান্না ঘরে যাব। আপনাকে মোটেই ব্যস্ত হ'তে হবে না।'

অনুপমা বললেন ,'না, ব্যস্ত হতে হবে কিসের। এই ক'দিনে যা একখানা ছিরি করেছ চেহারার। এই নিয়ে কালও ভাসঠাকুর কত দুঃখ করলেন।'

সুজাতা হেসে বলল, 'তাই নাকি? বাবার দুঃখ করা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। সেজন্যে আপনি কোন দুশ্চিন্তা করবেন না।'

অনুপমা কী যেন জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, বাড়ির চাকর গোবিন্দ বিকেলের ডাক নিয়ে এসে দাঁড়াল। 'দিদিমণি, চিঠি।'

সুজাতা সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে চিঠিপত্রগুলি নিল। সুরপতির নামে ব্যাঙ্ক ইনসিওরেন্স সংক্রান্ত কয়েকখানি পত্রিকা। পত্র মাত্র একখানি। সেখানা সুজাতার নামে।

অনুপমা একটু মুচকি হেসে বললেন, 'অবনীর চিঠি বুঝি ?'

অনুপমা লক্ষ্য করেছেন যখন ওদের দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ থাকে, মুখে মুখে কথাবার্তা বন্ধ হয়, তখন আলাপ চলে চিঠিতে চিঠিতে।

সুজাতা আরক্তমুখে বলল, 'না, এ অন্য কারো চিঠি।'

খামের ওপর বাংলা গোটা গোটা অক্ষরে ঠিকানা লেখা, 'শ্রীমতী সুজাতা চক্রবর্তী কল্যাণীয়াসু।'

এমন হাতের লেখা অবনীর নয়। এমন পাঠও সে লেখে না।

খামের মুখ ছিঁড়ে সুজাতা চিঠিখানা পড়তে শুরু করল।

'পরম কল্যাণীয়াসু,

এ চিঠি দেখে তুমি অবাক হয়ে যাবে। তুমি আমাকে কোনদিন দেখনি। আমার সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় নেই। তবু তোমাকে চিঠি লিখছি। তুমি আমাকে না চিনলেও আমি তো তোমাকে চিনি। সুরপতি ঠাকুরপোর মুখে তোমার ছেলেবেলার কথা শুনেছি আর বড় হওয়ার পর কেমন হয়েছ তা শুনেছি অসিতের মুখে। চাকরির উমেদার হয়ে সে সেদিন তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল মনে আছে বোধ হয়। শুনলুম তোমার সঙ্গেও তার দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় হয়েছে। তারপর থেকে তার বোনেদের কাছে তোমার কথা সে প্রায়ই বলে। আর আমি আড়ালে বসে শুনি। শুনতে শুনতে তোমার সুন্দর চেহারা, শান্ত স্বভাব, অগাধ বিদ্যা সম্বন্ধে আমি প্রায় সবই আন্দাজ ক'রে নিয়েছি। তুমি যখন আসবে সেই আন্দাজের সঙ্গে তোমাকে মিলিয়ে দেখব।

আমার ছেলে যেমন মুখচোরা তেমনি ভীরু। ওকে এত করে বললাম, সুরপতি ঠাকুরপো আর তার মেয়েকে একদিন নিমন্ত্রণ ক'রে আয়। কতদিন ধরে দেখি না, একবার দেখি। কিন্তু ওর যত লম্ফঝম্ফ কেবল আমার কাছে। বলে কী জানো ? তোমার সাহস তো কম নয়, অত বড় লোককে তোমার এই কুঁড়ে ঘরে নিমন্ত্রণ ক'রে যে আনতে চাইছ বসতে দেবে কোথায়, খেতে দেবে কী। আমি বলেছি বসতে দেব পিঁড়ে, খেতে দেব

চিঁড়ে। তোর সাহস না থাকে আমার সাহস আছে। সুরপতি ঠাকুরপো না হয় বড়লোক, সে না হয় চিঠি পেয়ে জবাব দেয় না। কিন্তু তার ঘরে আমার একটি মা লক্ষ্মী আছে। সে কি তার মেয়েকে গরীব বলে ঘৃণা করবে? কখনো নয়, কখনো নয়, আমার মা তেমন মেয়েই নয়।

আমার ছেলের সঙ্গে বাজি রেখে তোমাদের নিমন্ত্রণ করলুম। বাজিতে যদি হারি সে টাকা তোমাকে গুণতে হবে। এই ররিবার সন্ধ্যায় আমার সেই ব্যস্তবাগীশ বড়লোক দেমাকী ঠাকুরপোটিকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে অবশ্যই তোমার আসা চাই। পথ চেনাবার জন্যে অসিতকে ঘণ্টা খানেক আগে পাঠিয়ে দেব।

তুমি আমার অন্তরের আশীর্বাদ ও স্নেহচুম্বন নিয়ো। ইতি—

শুভার্থিনী

শ্রীঅরুন্ধতী চন্দ

সন্ধ্যার পর সুরপতি বাড়ি ফিরে এলেন। সুজাতা নিজেই তাঁর হাত মুখ ধোয়ার ব্যবস্থা করল। চা আর খাবার এনে দিল সামনে।

খেতে খেতে সুরপতি মেয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

'কী খবর তোমার বুলু? আজকের মেজাজটা কী রকম!'

সুজাতা বলল, 'আমার মেজাজ কোনদিন খারাপ থাকে না কি বাবা!'

সুরপতি একটু হাসলেন 'মানে তোমার বাবার মেজাজ সবদিনই খারাপ থাকে, ঘুরিয়ে এই কথাটাই তো বলতে চাও?'

সুজাতা বলল, 'তা কেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমি কেন বলতে যাব; আমি যা বলি সোজাসুজি বলি।'

সুরপতি বললেন, 'তা ঠিক। সুরপতি চক্রবর্তীকে শাসন করবার ক্ষমতা দুনিয়ায় একমাত্র তোমারই আছে।'

সুজাতা বলল, 'আছেই তো। ভালো কথা, একটা জিনিস কিন্তু তোমাকে দেখাব বলে রেখে দিয়েছি। বল রাগ করবে না, আমার কথায় যদি রাজী হও তাহলে দেখাতে পারি।'

সুরপতি হেসে বললেন, 'মাত্র দুটি সর্ত? আমি ভেবেছিলাম অন্ততঃ শ' দুই সর্ত তুমি আমার ওপব চাপিয়ে ছাড়বে।'

সুজাতা মৃদু হাসল। তারপর আর কোন কথা না বলে অরুন্ধতীর লেখা চিঠিখানা সুরপতির হাতে দিল।

চিঠি পডতে পড়তে সুরপতির মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'এর মানে কী বুলু?'

সুজাতা বলল, 'কিসেব মানে বাবা?'

সুরপতি চটে উঠলেন 'অসিতের মাব এমন গায়ে পড়া আত্মীয়তার মানে কী? চায় কী সে?'

সুজাতা বলল, 'ছিঃ বাবা, তুমি নিজের মুখেই বলেছ ওঁদেব কাছ থেকে তুমি এক সময় উপকার পেয়েছ।'

সুরপতি বললেন, 'তাকে উপকার বলে না, বলে বিনিময়। ছেলে পড়াবার বদলে মাসে বার টাকা কবে মজুবী।'

সুজাতা চলল, 'কিন্তু বাবা, তোমাব কাছেই কতবার শুনেছি ব্যাঙ্কে চাকরি দিয়ে তুমি বহু গরীব ছেলের উপকার কবেছ।'

সুরপতি রাগ করে বললেন, 'করেছিই তো হাজার বার করেছি। এ নিয়ে তোর সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাইনে।'

সুজাতা কোন জবাব দিল না।

সুবপতি বলতে লাগলেন, 'উপকাবই যদি বলিস তার প্রত্যুপকার তো আমি সাধ্যমত করেইছি। চাকরি দিয়েছি তার ছেলেকে। আবার চায় কী সে?'

সুজাতা বলল, 'কী আবাব চাইবেন?'

সুরপতি বললেন, 'কী যে চায় তা আমি জানি। বাড়িতে ডেকে নিয়ে আদর যত্ন করে শেষে বলবে ছেলের মাইনে বাড়িয়ে দাও, উন্নতি করে দাও চাকরিব। এই তো? তার জন্তেই এত অন্তরঙ্গতা, এত ঘনিষ্ঠতা।'

সুজাতা বলল, 'ছিঃ বাবা, মানুষকে অত ছোট ভাবতে নেই। তাতে

আমরা নিজেরাই ছোট হয়ে যাব। তিনি আমাকে যেতে লিখেছেন। তোমার ইচ্ছা হয় যেতে দেবে, না হয় দেবে না। কিন্তু অনর্থক মানুষকে অপমান করতে যেয়ো না বাবা। পরিহাসচ্ছলেও না।'

বলে সুজাতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুরপতি সকৌতুকে পিছন থেকে ডাকলেন, 'আরে শোন শোন, ও বিবেকবতী, রাগ করলে নাকি? আরে শোনই না।'

কিন্তু সুজাতা সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আর তার সেই গতিভঙ্গির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বহুদিন আগের কথা সুরপতির মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল কমলার কথা, সুজাতার মার কথা। সেও ঠিক দেখতে অনেকটা ওইরকমই ছিল। ঝগড়ায় না পেরে সেও ঠিক অমনি করে রাগ করে অন্য ঘরে চলে যেত। অবশ্য তখন এত ঘর ছিল না, নিজের বাড়ি ছিল না। বউবাজারে ফকির-চাঁদ দে লেনে একটি ভাড়াটে বাড়ির দুখানি ঘর নিয়ে সুরপতি থাকতেন। কিন্তু তখন থেকেই ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে তোলবার, শহরে নিজের বাড়ি গাড়ি করবার কথা ভাবতেন সুরপতি। আর সেই ভাবনার কথা স্ত্রীকে মাঝে মা.ঝ জানাতেন। স্বামী যে প্রচলিত নীতি ধর্ম মেনে চলছেন না সে কথা টের পেয়ে কমলা সুজাতার মতই বাধা দিতেন। তিনি বলতেন 'দেখ, গরীব হয়ে থাক সেও ভালো, কিন্তু অন্যের ওপর অন্যায় অবিচার যেন কোনদিন করতে যেয়ো না।'

সুরপতি জবাব দিতেন, 'দেখ, তোমার ব্রতকথা পাঁচালী কথার সঙ্গে বাইরের দুনিয়ার মিল নেই। তার রীতি নীতি আলাদা। তোমার লক্ষ্মী আর মঙ্গলচণ্ডীর জগৎ নিয়ে তুমি থাক, আমাকে আমার জগৎ গড়ে তুলতে দাও।'

স্ত্রীর সঙ্গে মতভেদ মতান্তর সুরপতির যথেষ্ট হোত, ঝগড়াঝাটি নেহাত কম হোত না। কিন্তু মাঝে মাঝে ভালো লাগত। দুর্বল ক্ষীণ হাতের সেই বাধা, স্ত্রীর মুখের সেই নীতি উপদেশ মাঝে মাঝে ভারি

উপভোগ করতেন সুরপতি। মনে মনে ভাবতেন মেয়েদের এই রকমই শোভা পায়। ওরা রক্ষয়িত্রী, ওদের স্বভাবের মধ্যেই রক্ষণশীলতা। পুরুষদের তা নয়। নীতি শাস্ত্র তারা একহাতে গড়ে, একহাতে ভাঙে। নিজেদের চলবার পথ তারা নিজেরা কেটে কেটে চলে। জীবনের বড় সড়কে পড়তে হোলে অনেক বাঁকা চোরা গলি ঘুঁজির পথ অতিক্রম ক'রে যেতে হয়। তারপর জীবনে একবার সার্থক হোলে, সেই সব গলি ঘুঁজি আপনিই মিলিয়ে যায়। সে কথা নিজেরও আর মনে থাকে না। সেই গোপন পথের দু'চার জন খোঁড়া সহযাত্রী যে সে কথা নিয়ে কানাঘুষা মাঝে মাঝে না করে তা নয়। কিন্তু সে সব ফিসফিসানিতে কান দিতে নেই। মনের কথা যারা জোর গলায় উচ্চারণ করতে পারে না তাদের সুরপতি ভয় করেন না। তারা সংসারের কোন ক্ষতিও করে না, উপকারও করে না।

কিন্তু এম. এ.-ই পাশ করুক আর যাই করুক, সুজাতা সেই যজমানী ভট্চাযের মেয়ের ধর্মভয় পেয়েছে, পেয়েছে মায়ের সেই রক্ষণশীলতা, ভালোমন্দ বিচারের সেই বাঁধাধরা পদ্ধতি। সুরপতি একেকবারে ভাবেন ওর এই ভয়কে ভেঙে দেবেন, বাইরের জটিল জগতের সঙ্গে পরিচয় করাবেন সুজাতার। কিন্তু পারেন নি। কেমন যেন মায়া হয়েছে। থাক, দরকার কী। আগে থেকেই ওর স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে লাভ কী। সে স্বপ্ন স্বাভাবিক নিয়মে আপনি ভাঙবে। তখন সেই ভাঙবার ব্যথাটা ওর আর মনে লাগবে না।

সুরপতি মাঝে মাঝে ভেবেছেন ব্যাঙ্কের কাজে সুজাতাকে আরও পাকা ক'রে তুলবেন, নিজের সহকারিণী করবেন ওকে। কিন্তু সুজাতার বিমুখতা তাঁকে নিরুৎসাহ করেছে। ওপর থেকে যতটা দেখা যায় বোঝা যায়, পৈতৃক ব্যবসায়ের ও ততটুকু জেনেই খুসি। বেশী গভীরে নামতে চায় না। সুরপতি তেমন গরজও দেখান নি। দরকার কি ওকে আগে থেকেই অকালপক্ক করে তুলে। সময়ে সবই হবে। সংসার নিজেই

ওকে গভীর থেকে গভীরতর গহ্বরে টেনে নেবে। যে কটা দিন গান গেয়ে, ফুল তুলে নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় থাকতে পারে থাকুক।

তাছাড়া স্থরপতির নিজের মধ্যেও একটি রক্ষণশীল মানুষ আছে। তাঁর মতে স্ত্রী পুরুষের কাজের ক্ষেত্র আলাদা, ভাবের ক্ষেত্র আলাদা। মেয়েদের পক্ষে ওই নরম সহজ স্থনীতির জগৎই ভালো, ভালো ওদের মঙ্গলচণ্ডী, দীপের আলো আর ধূপের ধোঁয়া। পুরুষের কাজের মরুভূমিতে ওরা স্নিগ্ধ শ্যামল ওয়েসিস। সেইটেই নিয়ম। মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম যে না দেখা যায় তা নয়। কিন্তু সেটা নিয়মেরই ব্যতিক্রম।

হঠাৎ মেয়ের জন্মে ভারি মমতা বোধ করলেন স্থরপতি। তাকে অকারণে বকেছেন বলে অনুতাপ বোধ করলেন মনে। ধীরে ধীরে এসে জানালার ধারে দাঁড়ালেন। আকাশ ভরা তারা। কিন্তু তারার দিকে তাকাবার সময় স্থরপতির হয় না, তাকাবার কথা যেন মনেই থাকে না। ফুলের জগৎ তারার জগৎ ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে, যেন ক্রমেই পিছনে পড়ে যাচ্ছে। কে বলবে এই ফুল আর তারা নিয়ে কলেজ ম্যাগাজিনে তিনিও এক সময় কবিতা লিখেছেন। ভেবে স্থরপতির নিজেরই হাসি পেল। শুধু মাসিক পত্রই নয়, প্রথম জীবনের দাম্পত্য পত্রগুলিও তাঁর কবিতার ছন্দে ভরে উঠত। আজকাল মাথা কুটে মরলেও বোধ হয় এক লাইন কবিতা মেলাতে পারবেন না। অক্ষরের বদলে গণিতের সংখ্যাগুলি খাতার পাতায় নেমে আসবে। কিন্তু তাতে ক্ষোভ কিসের, দুঃখ কিসের। জীবনের সবগুলি অধ্যায় তো সমাজ চায় না। কোন সময় মানুষ শব্দ দিয়ে কবিতা লেখে, কখনো বা সংখ্যা দিয়ে। পণ্ডিতমশাই বলতেন, 'তুমি একদিন কবি হবে স্থরপতি, তুমি শিল্পী হবে।'

শিল্পী না হন, শিল্পপতি তো হয়েছেন। ব্যাঙ্কই তাঁর রচিত কবিতা। ছোট সংক্ষিপ্ত গীতিকবিতা নয়; সর্গে সর্গে সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্য।

পরম স্নেহে মেয়েকে কাছে ডাকলেন স্থরপতি, 'বুলু, এদিকে এসো'। স্থজাতার সাড়া দেওয়ার অপেক্ষা না ক'রে দ্বিতীয়বার ডাকলেন 'বুলু।'

একটু বাদে সুজাতা এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল, বলল, 'কি বাবা।'

সুরপতি সস্নেহে মেয়ের পিঠে হাত রেখে বললেন, 'তুই আমার ওপর রাগ করেছিস?'

সুজাতা বলল, 'না বাবা রাগ কেন করব। বরং তুমি বোধ হয় রাগ করেছ।'

সুরপতি বললেন, 'হাঁ রাগ করেছিলাম কিন্তু এখন আর তা নেই। আমার রাগ দপ ক'রে ওঠে, খপ ক'রে পড়ে যায়। আমি কি তোর মত?'

সুজাতা হেসে বলল, 'আমার রাগটা কিসের মত বাবা?'

সুরপতি একথার জবাব এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'যাক, আর তুলনা দিয়ে কাজ নেই। ভেবে দেখলাম অসিতের মা যখন অত ক'রে লিখেছেন, একবার গিয়ে ঘুরে আসাই ভালো। অবনীকে রবিবার চা খেতে বলব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু তাকে বোধ হয় একবার এলাহাবাদ যেতে হবে।'

'কেন?'

সুরপতি বললেন, 'ব্রাঞ্চটায় একটু গোলমাল হচ্ছে। একটু ঘুরে আসা দরকার। আর যদি যায়ই ওদিকে ইউ. পি.র অন্য ব্রাঞ্চগুলিও একবার দেখে আসবে।'

সুজাতা হঠাৎ বলল, 'বাবা, চল না আমরাও একবার যাই। এক জায়গায় আর ভালো লাগে না।'

সুরপতি মেয়ের দিকে তাকালেন, 'তুইও তো এই সঙ্গে যেতে পারতি। কিন্তু তুই নিজেই তো ইচ্ছা ক'রে তা হতে দিচ্ছিস না। বার বার পিছিয়ে দিচ্ছিস।'

সুজাতা লজ্জিত হ'য়ে চোখ নামিয়ে বলল, 'বাবা আমি তো সেভাবে যাওয়ার কথা বলিনি। তোমার আর আমার একসঙ্গে যাওয়ার কথাই বলছিলাম।'

সুরপতি বললেন, 'আচ্ছা পরের বার তাই যাওয়া যাবে। রবিবার বরং চ'ল অসিতের বাড়ি থেকেই বেড়িয়ে আসি।

সুজাতা বলল, 'বাবা তোমার যদি মত না থাকে তাহলে শুধু আমাকে খুশি করবার জন্যই তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নেই।'

সুরপতি বললেন, 'তোকে খুশি করবার জন্যে আমি সব করতে পারি। তোকে খুশি করতে পারলে আমি নিজেও যে খুশি হই বুলু।'

সুজাতা বলল, 'তাহলে ওঁকে একটা চিঠি লিখে দেব বাবা?'

সুরপতি হেসে বললেন, 'বাঃ, সঙ্গে সঙ্গে রাজী? এতক্ষণ ধরে বুঝি তা'হলে শুধু ভদ্রতা হচ্ছিল! তোমার যদি অমত থাকে তোমার যদি আপত্তি থাকে—। এখন যদি আমি সত্যিই আপত্তি করে বসি তাহলে কি হবে?'

সুজাতাও হাসল, 'কী আবার হবে, আপত্তি কর তো যাওয়া হবেনা।' বলে সুজাতা পাশের ঘরে চলে গেল।

সুরপতি স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন। সত্যিই ভারি খুশি হয়েছে বুলু। আহা বেচারা। আত্মীয়স্বজন বলতে তো তেমন কেউ নেই। ওর মনে মা-মাসীর স্নেহের ক্ষুধা রয়েই গেছে। সুরপতির অভিজাত বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে নানা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ আসে। সুজাতাকেও সঙ্গে ক'রে নেওয়ার জন্যে তাঁদের বাড়ির মেয়েরা অনুরোধ জানান। কিন্তু সে সব পার্টিতে গিয়ে সুরপতিও তেমন আরাম পান না। আর সুজাতা তো রীতিমত অস্বস্তিই বোধ করে। এদিক থেকে ও বড় অসামাজিক। এ সব নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ সুজাতা যত পারে এড়িয়ে যায়। বলে, 'বাবা ভালো লাগে না ও সব ফর্মালিটি।'

সুরপতি বলেন, 'সে কি রে। আমি না হয় গেঁয়ো বামুন। খোলা গায়ে থেলো হুঁকোয় তামাক টানতে পারলে আর কিছু চাইনে। কিন্তু তুই তো আর তা নোস। তুই তো রীতিমত উচ্চশিক্ষিতা আধুনিকা মহিলা। নাঃ, তোর পিছনে টাকা পয়সা ব্যয় করাটা কোনই কাজে লাগেনি দেখছি।'

সুজাতা হেসে জবাব দেয়, 'সত্যি বাবা। একেবারে জলে গেছে।'

এদিক থেকে অসামাজিক অহংকারী বলে সমাজে খানিকটা দুর্নামই আছে বাপ মেয়ের। কিন্তু সুরপতি তা গ্রাহ্য করেন না। সুজাতা যে

অমন পোষাকী আদব কায়দার বিরুদ্ধে তা জেনে মনে মনে তিনি বরং খুশিই হন।

সাধারণত নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে সুজাতা সাড়া দেয় না। কিন্তু অসিতের মা ডাকামাত্রই ও এমন উৎসুক হয়ে উঠল কেন? ওকি তার চিঠিতে সত্যিই নতুন কিছু পেয়েছে? সুরপতি অরুন্ধতীর চিঠির ভাষাটা আর একবার মনে আনবার চেষ্টা করলেন। একবার ভাবলেন চিঠিখানা নিয়ে আসবার জন্যে মেয়েকে বলবেন। কিন্তু কেমন যেন একটু সংকোচ বোধ হোলো।

সুজাতা নিজের ঘরে গিয়ে ততক্ষণে অরুন্ধতীর চিঠির জবাব লিখতে বসেছে। খানিকক্ষণ কাটা ছেঁড়ার পর একটা চিঠি প্রায় দাঁড় করিয়ে এনেছিল। রান্নাঘরে খাওয়ার ডাক পড়ল। দেরি করবার জো নেই। এক মিনিট দেরি হলেই বাবা অসহিষ্ণু হয়ে বকাবকি শুরু করবেন। সুজাতা চিঠিটা অসমাপ্ত রেখে খাওয়ার জন্যে নিচে নেমে গেল। তারপর আধ ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এসে ফের নতুন ক'রে আরম্ভ করল চিঠি। এ চিঠি কোন বন্ধুকে নয়, প্রেমাস্পদকে নয়, নেহাৎই মায়ের বয়সী অপরিচিতা অর্ধশিক্ষিতা একটি মহিলার কাছে সামাজিক পত্র। কিন্তু লিখতে গিয়ে যেন নতুন এক আনন্দের স্বাদ পেল সুজাতা। তার মা যদি থাকতেন তাহলে দূরে বসে তাঁর কাছেও হয়ত এক বিনিদ্র রাতে এমনি চিঠি লিখত সুজাতা। অনেক কাটাকুটির পর অনেক পাঠ বদলের পর সে লিখল:

'মাননীয়াসু,

আজই বিকালে আপনার চিঠি পেলাম। বাবাকে লেখা আপনার আর একখানা চিঠি আমার কাছেই আছে। সে চিঠি দেখে প্রথমে আমার ভারি হিংসা হয়েছিল। ভেবেছিলাম এ চিঠি কেন শুধু তাঁর কাছেই এল, কেন আমার কাছেও এল না। তখন কি ভাবতে পেরেছি আপনি আমাকেও চিঠি লিখবেন। অমন ভালো অত সুন্দর আর চমৎকার একখানা চিঠির জবাব বাবা আজ পর্যন্ত দেননি জেনে তাঁর ওপর আমার প্রথমে খুব রাগ হয়েছিল। এখন এত রাত্রে এই ঘুমন্ত নিস্তব্ধ পুরীতে একা

বসে বসে চিঠি লিখতে সে রাগ এখন আর ততটা নেই। এখন ভাবছি তিনি যদি চিঠি লিখতেন, তিনি যদি আমার মত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতেন, আমাকে কি আর আপনার চিঠি লেখার দরকার হোতো? আমি কি তাহলে আপনার কাছ থেকে কোন চিঠি আশা করতে পারতাম? তাই ভাবছি তিনি চিঠি না দিয়ে ভালোই করেছেন। খুব স্বার্থপরের মত কথা বলছি, না? দেখুন তো আপনি আমাকে 'লক্ষ্মী' 'মালক্ষ্মী' কত ভালো নামেই না ডেকেছেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারলেন তো আমি মোটেই সে সব কিছু নই। আমি একটি আস্ত অলক্ষ্মী স্বার্থপর মেয়ে।

অসিতবাবু আমার সম্বন্ধে তাঁর বোনদের কাছে কী গল্প করেছেন কী জানি। বোধ হয় খুব নিন্দা মন্দ ক'রে থাকবেন। কোন মেয়ের অসাধারণ রূপ, শান্ত স্বভাব আর বিদ্যাবুদ্ধির গল্প যদি তিনি তাঁদের শুনিয়ে থাকেন—নিশ্চয়ই আর কারো কথা বলেছেন। আপনি আড়াল থেকে শুনেছেন কিনা তাই আমার কথা আন্দাজ করেছেন। যদি সামনাসামনি দাঁড়িয়ে শুনতেন নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন সে অসামান্যার নাম সুজাতা নয়।

আপনি যখন ডেকেছেন না গিয়ে কি পারি? রবিবার অবশ্যই যাব। বাবাকেও রাজী করিয়েছি। অসিতবাবু যদি দয়া করে আসেন তো ভালোই হয়। পথ চেনাবার জন্যে নয়, তাঁর কাছে বেশ গল্প শুনতে শুনতে যাওয়া যাবে। আপনার গল্প। আপনি আমার প্রণাম নেবেন। ইতি—সুজাতা।

পরদিন ভোরে উঠে বাড়ির চাকর অমূল্যকে ডেকে চিঠিটা পোস্ট করতে দিল সুজাতা। কিন্তু ডাকে পাঠিয়ে দেওয়ার পরেই তার মনে হোতে লাগল অত বড় একটা দীর্ঘ চিঠি না পাঠালেই ভালো হোতো। বড়ই ভাবপ্রবণ হয়ে গেছে চিঠিটা। একজন অপরিচিতা ভদ্রমহিলার কাছে এতখানি ভাবাবেশ প্রকাশ করে ফেলে তার ভারি লজ্জা করতে লাগল। কিন্তু হস্তচ্যুত পাশা। ডাকে ছেড়ে দেওয়া চিঠি তার ফিরিয়ে নেওয়ার জো নেই। এখন শুধু একটি কাজ করা যায়। একখানা পোষ্টকার্ড ছেড়ে আগের চিঠিটাকে বাতিল করা চলে। দু'লাইন লিখে দিলেই হয়, জরুরী

কাজ থাকায় সুজাতাদের পক্ষে এই রবিবার ,যাওয়া সম্ভব হবে না। পরে সুবিধা সুযোগ মত যাওয়ার দিন ঠিক করা যাবে।

কিন্তু লিখি লিখি করেও ছু'দিনের মধ্যে সে চিঠি লেখা হোলো না। শেষ পর্যন্ত রবিবার এল। সকাল কাটল, তুপুর কাটল। সুজাতা বাবাকে আর কাকীমাকে বারবার বলল দরকারী কাজে ল্যান্সডাউন রোডে সে এক বান্ধবীর বাড়িতে যাবে। অসিতবাবু যদি নিতান্ত এসেই পড়েন তাঁকে যেন বলা হয় আজ আর তাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হোলো না। সে জন্য বড়ই লজ্জিত সুজাতা।

সুরপতি হেসে বললেন 'আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে বুঝি।'

সুজাতা বলল, 'বাঃ রে, পরীক্ষা আবার কিসের। সত্যিই আজ ডলিদের ওখানে যাওয়া দরকার।'

বেরোবার জন্য তৈরী হবে বলেই যেন সুজাতা নিজের ঘরে ঢুকল। মনে মনে ভাবল সত্যি যদি না যায় কেমন হয়। তার এই খেয়ালীপনায় কী ভাববেন অসিতবাবুর মা। চিঠির মেয়ের সঙ্গে আসল মেয়ের যে অনেক তফাৎ তা দেখে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবেন। বেশ তো, তাঁকে একটু অবাক করে দেওয়ারই ইচ্ছা সুজাতার। আলমারী থেকে খান কয়েক শাড়ি বের করল সুজাতা। একখানা জমকালো রঙের শাড়ি পরে হঠাৎ ডলিদের বাড়িতে সে উপস্থিত হবে। তাকে দেখে ডলি নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে। যে বার বার ডাকলেও আসে না সে আজ অনাহূত ভাবে কেন এল ভেবে নিশ্চয়ই কূল-কিনারা পাবে না। আর ওদিকে বিস্মিত হবেন অসিতবাবুর মা। ভাববেন বড়লোকের মেয়েরা খেয়াল হলে পাতার পর পাতা ভাবাবেগে ভাসিয়ে দিতে পারে, কিন্তু গরীবের বাড়িতে তারা সত্যি কোন দিন নিমন্ত্রণ রাখতে যায় না। তাদের কথার জগৎ আর কাজের জগৎ একেবারে আলাদা। তাদের হৃদয় যে পথে যেতে চায় আভিজাত্যবোধ সে পথ মাড়ায় না।

দোরে টোকা পড়ায় সুজাতা চমকে উঠল, 'কে।'

'বুলু, আমি।'

'কাকীমা ?'

'হাঁ'।

সুজাতা বলল, 'কী ব্যাপার ? ঘরে আসুন। দোর খোলাই আছে।'

অনুপমা ঘরে ঢুকে বললেন, 'কী ব্যাপার আমিও তাইই দেখতে এলাম। ওদিকে অসিতবাবু এসে বসে আছেন। তোমার সাজসজ্জা হোলো ?'

সুজাতা বলল, 'তিনি এসে গেছেন ?'

অনুপমা মৃদু হেসে বললেন 'তাঁর বাড়িতে মনিবের মেয়ের পায়ের ধূলো পড়বে তিনি কি না এসে পারেন !'

সুজাতা বলল 'ছিঃ কাকীমা।'

অনুপমা বললেন, 'আমি ঠাট্টা করছিলাম সুজাতা, তুমি তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।'

সুজাতা বলল, 'আমার তৈরী হ'তে বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু তার আগে অসিতবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার।'

অনুপমা বললেন, 'দেখা ক'রে কী বলবে ? তোমার সেই জরুরী কাজের কথা তো। সেটা না হয় গাড়িতে বসেই বলো।'

অনুপমা মুখ মুচকে একটু হাসলেন।

সুজাতা আরক্ত হয়ে বলল, 'আপনার সব কিছুতেই ঠাট্টা। আমার বুঝি সত্যিই কোন দরকারী কাজ থাকতে পারে না ?'

অনুপমা বললেন, 'পারে না আমি কি বলেছি ?'

'বুলু তাড়াতাড়ি এসো, আমরা অপেক্ষা করছি তোমার জন্যে।'

ড্রয়িংরুম থেকে সুরপতির চড়া গলার হাঁক শোনা গেল।

শাড়িটাড়ি না বদলেই সুজাতা তাড়াতাড়ি ড্রয়িংরুমে ঢুকল। সুরপতি তৈরী হয়েই আছেন। অনুপমার কাছ থেকে মিহি সাদা খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি চেয়ে নিয়ে পরেছেন। পকেটে পুরে নিয়েছেন গোল্ড ফ্লেকের কৌটো। চোখে কালো মোটা শেলের চশমা। তার ভিতর দিয়ে সুরপতি

সোজা মেয়ের দিকে তাকালেন, 'এই যে, তুমি এখনও তৈরী হও নি! অসিত এসে বসে আছে।'

সুজাতা মনে মনে ভাবল, বাবার মনে কোন দ্বিধা নেই। যেখানে যাবেন বলে কথা দেন সেখানে নিশ্চয়ই যান। আর একবার যদি যাব না বলেন তাহলে শত সাধ্য সাধনাতেও তাঁর আর সম্মতি মেলে না।

সুজাতা অসিতের দিকে তাকিয়ে নমস্কার জানিয়ে একটু হেসে বলল, 'আপনাকে কি সত্যিই অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি?'

অসিতের বেশবাসের কোন পরিবর্তন হয়নি। তবে জামা কাপড় প্রথম দিনের তুলনায় আজ বেশ ফরসা। পায়ে পুরানো স্যাণ্ডেলের বদলে এবার শু উঠেছে। নিতান্ত সাধারণ আটপৌরে বেশ। কিন্তু সুরপতির মনে হোলো বেশটা যত সাধারণ, চেহারাটা যেন তত সাধারণ নয়। মুখচোখের নিরীহ ভঙ্গির মধ্যে যেন এক চাপা কৌতুক প্রচ্ছন্ন আছে।

অসিত সুজাতার দিকে তাকিয়ে প্রতি নমস্কার ক'রে স্মিত মুখে বলল, 'না, এখনো অনেকক্ষণ হয়নি। কিন্তু সে কথা আপনাকে বলা বোধ হয় নিরাপদ নয়।'

সুজাতা একটু হাসল, 'আপনাদের ভয় যতই থাকুক, যাঁরা সৎ তাঁরা সব সময় সত্যি কথাই বলেন।'

অসিত বলল, 'কিন্তু সেই সৎ আর সত্যবাদীর সংখ্যা দুনিয়ায় ক'জন?'

সুজাতা বলল, 'বেশি নয়, সেইজন্যেই তো তাঁদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা এত বেশি।'

অসিত এবার একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে সুজাতার দিকে তাকাতেই সে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। পৃথিবীর সৎব্যক্তিদের সম্বন্ধে আশা পোষণ করায় এবং তা প্রকাশ করায় সুজাতার লজ্জার কিছু নেই। তবু যেন সুজাতা কেমন একটু লজ্জা বোধ করল। তার কথায় কেউ কোন ব্যক্তিগত অর্থ আরোপ করবে না তো?

সুরপতি অসহিষ্ণুভাবে তাগিদ দিয়ে বললেন, 'বুলু, সত্যিই কিন্তু বড়

দেরি হয়ে যাচ্ছে। অসিতদের ওখান থেকে ঘুরে এসে আমায় আবার অন্য কাজে বেরোতে হবে।'

হাত ঘড়িতে সময় দেখলেন সুরপতি।

সুজাতা লজ্জিত হয়ে বলল, 'যাই বাবা।'

তারপর মিনিট দশেক বাদেই শাড়ি বদলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

অনুপমা বললেন, 'একি এ যে একেবারে নিরাভরণা? এই কি তোমার বাইরে বেরোবার সজ্জা?'

সুজাতার পরণে চওড়া কালো পেড়ে সাদা খোলের মিহি শান্তিপুরী শাড়ি। হাতে দু'গাছি চুড়ি। গলায় সরু হার, কানে লাল পাথর বসানো ফুল। মুখে পাউডারের ক্ষীণ আভাস ছাড়া চোখে ঠোঁটে কোন প্রসাধনের ছাপ নেই।

সুজাতা বলল, 'এর চেয়ে বেশি গয়না আমি কবে পরি কাকীমা?'

অনুপমা বললেন, 'তা অবশ্য পরোনা, কিন্তু শাড়িটা আর একটু ভালো দেখে পরে গেলে পারতে। উনি যদি রাগ করেন।'

সুজাতা বলল, 'কে, বাবা? না তা করবেন না। এ তো আর ওঁর কোন বড়লোক বন্ধুর পার্টিতে যাচ্ছি না।'

অনুপমা বলতে যাচ্ছিলেন, 'সেইজন্যেই বুঝি এত বিবেচনা?' কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে বললেন, 'এতেও অবশ্য তোমাকে খুবই মানিয়েছে। গায়ের রং যার ভালো সাদাই হোক কালোই হোক তাকে সব শাড়িই মানায়।'

সুজাতা লজ্জিত হয়ে বলল, 'আহা, নিজের মেয়েকে কে কবে বে-মানান দেখে কাকীমা?'

সুরপতি আর একবার অধীরভাবে হাঁক দিলেন, 'বুলু, হোলো তোমার?'

সুজাতা এগুতে এগুতে সাড়া দিয়ে বলল, 'হয়েছে বাবা, যাচ্ছি।'

ড্রাইভার রামলগন অনেক আগেই গাড়ী নিয়ে তৈরী হয়ে আছে।

সুরপতি মেয়েকে নিয়ে পিছনের সীটে উঠে বসলেন, অসিত গিয়ে বসল ড্রাইভারের পাশের সীটে।

সুরপতি একটু ইতঃস্তত করে বললেন, 'তুমিও তো এদিকে এলে পারতে।'

অসিত বলল, 'না না, আমি এখানে বসলেই রামলগনের সুবিধে হবে।'

বাড়ির নম্বরটা বেলেঘাটা মেইন রোডের কিন্তু অবস্থানটা ঠিক সদর রাস্তার ওপরে নয়, সরু একটি কাণা গলির মধ্যে।

সুরপতির গাড়ী সে'গলির ভেতর ঢুকল না।

অসিত একটু সংকোচের সঙ্গে বলল, 'এখানে নামতে হবে। গাড়ি আর যাবে না।'

সুরপতি বললেন 'তাতে কী হয়েছে? গাড়ি কি আর লোকের ঘরের ভিতরে যায়!'

মেয়েকে নিয়ে সুরপতি নেমে পড়লেন, অসিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চল।'

পাশেই একটা বস্তি। তার কোল ঘেষে কাঁচা নর্দমা, কয়েকটী উলঙ্গ ছেলে তার ধারে বসে নোংরা জলে ঢিল ছুড়ছে।

নাকে একটু রুমাল বুলাল সুজাতা। অসিতের সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই অপ্রতিভ ভাবে হেসে বলল, 'বেছে বেছে ভালো জায়গায় এসে বাড়ি করেছেন।'

অসিতও হাসল, 'তা ঠিক। কেন নির্বাচনটা বুঝি পছন্দ হচ্ছে না?'

বাড়ির বাইরেটা যেমন পুরোন, সুড়কি ঝরা লোনা ধরা, ভিতরটা তেমন নয়। সদর পেরিয়ে ছোট একটি উঠোন। উঠোনের তিন দিকে আরো দু'ঘর ভাড়াটে। উত্তর দিকের পাশাপাশি দু'খানা ঘর অসিতদের। সাড়া পেয়ে সবাই এগিয়ে এসেছেন। অরুন্ধতী, উমা, নীলা। দুই বোনের চোখে বিস্ময় আর কৌতুহল।

অরুন্ধতীর সঙ্গেই অসিত প্রথমে সুজাতার পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার মা, আর–'

অরুন্ধতী বললেন, 'আর বলতে হবে না। আমি চিনতে পেরেছি। এসো মা, এসো।'

তারপর সুরপতিব দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেমন আছ সুয়ো ঠাকুর পো? দেখ, শেষ পর্যন্ত না এসে পারলে না তো?'

সুরপতি বললেন 'কী করে আর পারি? যেভাবে পত্রাঘাত শুরু করেছিলেন!'

সুজাতা অরুন্ধতীর দিকে তাকিয়ে স্মিতমুখে বলল, 'আপনি চমৎকার চিঠি লেখেন।'

অসিত বলল, 'মার আশা ছিল একজন লেখিকাটেখিকা হবেন, কিন্তু হতে হতে পত্রলেখিকা পর্যন্ত হয়ে রইলেন। সাহিত্যের সাধ চিঠিতেই মেটান।'

অরুন্ধতী হেসে বললেন, 'ও আমার নিন্দা না ক'রে জলগ্রহণ করে না। এসো ভিতরে এসো।' তারপর দুই মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উমা আর নীলা। অসিতের দুই ছোট বোন।'

সুজাতা বলল, 'দেখেই বুঝতে পেরেছি।'

অসিত প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলল, 'কিছুই বুঝতে পারেন নি। ওরা বয়সে ছোট, কিন্তু প্রতাপে বড়। সবাই আমাব অভিভাবিকা। আমাকে সবারই শাসনে থাকতে হয়।'

সুজাতা হেসে বলল, 'শাসন খুব কড়া বলে তো মনে হচ্ছে না।'

নীলা বলল, 'দাদা, সুজাতা দেবীর কাছে আমাদের সবাইকে অপদস্থ করবে বলে পণ ক'রে বসেছ? এর ফল কি ভালো হবে?'

অসিত বলল, 'অপদস্থ ব'লো না, উচ্চপদস্থ বলো।'

নীলার দিকে তাকিয়ে সুজাতা বলল, 'আমার একটু আপত্তি আছে। সুজাতা দেবী বলবেন না, কেমন যেন কানে লাগে। যেন যাত্রা থিয়েটারের মত শোনায়।'

নীলা হেসে বলল, 'বেশ তাহলে সুজাতাদি।'

সুজাতা বলল, 'শুধু নামই তো যথেষ্ট।'

নীলা বলল 'এখনই নয়। আলাপটা আরো জমে উঠুক, তারপরে।'

সুরপতিকে নিয়ে অসিত পাশের ঘরে গেল। উমা আর নীলার সেই যৌথ ঘর। কালো পর্দায় ভাগ করা। নীলার সেই ছোট তক্তপোষখানার ওপর বসে সুরপতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ ঘরে কে থাকে?'

অসিত বলল 'আমার ছোট বোন নীলা।'

'এখনো বিয়ে টিয়ে দাওনি?'

অসিত বলল, 'না, ওর বড় উমার বিয়ে হয়েছিল। বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে। এখন এখানেই থাকে।'

সুরপতি বললেন, 'তোমাদের রংপুরের বাসায় যখন ওদের দেখেছি খুবই ছোট ছিল। চেহারা মনে নেই ভালো করে।'

সুরপতি হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'ইস্, অনেক দেরী হয়ে গেল। তোমার মাকে বলো আমি এক্ষুনি উঠব। আর সুজাতাকে গিয়ে একটু তাড়া দাও। সে বোধ হয় খুব জমিয়ে নিয়েছে।'

অসিত বলল, 'সে কি, এই তো সবে এলেন। এক্ষুনি উঠতে চাইছেন।'

সুরপতি গম্ভীর ভাবে বললেন, 'হ্যাঁ, দরকারী কাজ আছে।'

অসিত আর কিছু না বলে পাশের ঘরেব দোরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অরুন্ধতী মেঝের ওপর একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়েছেন। সেখানে সবাই গোল হয়ে বসে, সুজাতা অসিতের মা আর দুবোনের সঙ্গে আলাপ ক'রে চলেছে। কোন তাড়া নেই, ব্যস্ততা নেই। উমা আর নীলার সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গেছে সুজাতা, যেন সে ওদেরই একজন। ধনীকন্যার এই সরল অনাড়ম্বর ধরণটুকু অসিতের খুবই ভালো লাগল। ব্যবধান অবশ্যই আছে। বেশেবাসে কথায় বার্তায়—একটু লক্ষ্য করলেই প্রভেদটি চোখে পড়ে। তবু উচ্চশিক্ষা আর মার্জিত রুচিতে রূপ আর ধনের অহংকারকে উগ্র হ'তে দেয় নি সুজাতা। সুজাতার এই কোমল বিনম্রভাব, ওর এই নারীত্বকে মধুর

আর মনোহর করে তুলেছে। ওকে দেখে অসিতের মন এক অনির্বচনীয় সুখে পূর্ণ হয়ে উঠল।

নীলারই চোখে পড়ল প্রথমে। সে একটু মৃদু হেসে বলল, 'দাদা আর লজ্জা করতে হবে না এসে। আমাদের এ বৈঠকে অন্তত একজন অনাহুত রবাহুতের স্থান আছে, কী বলুন সুজাতাদি?'

সুজাতা হঠাৎ কোন জবাব খুঁজে পেল না। আরক্ত মুখে চুপ ক'রে রইল।

অসিত এই প্রগলভা বোনটির কথার কোন জবাব দেওয়ার চেষ্টা করল না। অরুন্ধতীর দিকে তাকিয়ে বলল 'মা, উনি এক্ষুনি উঠতে চাইছেন।'

মাষ্টার মশাই কথাটা মুখে আটকে গেল অসিতের। অন্য কোন সম্বোধনও হঠাৎ মুখে জোগাল না।

অরুন্ধতী বললেন, 'সেকি রে, এক্ষুনি উঠবেন কি!' তার পর সুজাতার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'বড় লোকেদের বোধ হয় এই নিয়ম। কারো বাড়িতে এলে খুব ব্যস্ততা না দেখালে মানায় না। কী বলো সুজাতা?'

সুজাতা হেসে জবাব দিল, 'আমাকে কেন খোঁটা দিচ্ছেন। আমি তো আর বড়লোক নই, যাওয়ার জন্যে ব্যস্তও হয়ে উঠিনি।'

অরুন্ধতী স্মিতমুখে বললেন, 'এই তো লক্ষ্মী মেয়ের কথা। আচ্ছা আমি তাঁর কাছেই যাচ্ছি। যিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, দেখি তাঁকে গিয়ে সুস্থ করতে পারি কিনা।'

ছেলেমেয়েদের সামনে এতখানি লঘুচাপল্য প্রকাশ করে ফেলে অরুন্ধতী একটু যেন লজ্জিত হয়ে পড়লেন। ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, 'যাও, ওঁকে বলো গিয়ে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, চা-টা খেয়ে তারপর যাবেন।'

অসিত বলল, 'আমি যথেষ্ট বলেছি মা।'

নীলা প্রতিবাদ ক'রে বলল, 'মিছে কথা ব'লো না দাদা। যথেষ্ট দূরের কথা, তুমি যে একটি কথাও বলোনি তা আমি দিব্যি ক'রে বলতে পারি।

মনিবকন্যার সামনেই তোমার একটিবারের জন্য মুখ ফুটল না আর তিনি তো সাক্ষাৎ মনিব।'

অরুন্ধতী ধমকের সুরে বললেন, 'আঃ থাম তো। তোর নিজের মুখ দিয়ে অনবরত খই ফুটছে। আর কাউকে কি তুই কিছু বলবার অবসর দিস্ যে সে বলবে?'

নীলা বলল, 'বাঃ রে, আমি বুঝি কারো মুখে হাত চেপে বন্ধ করে রেখেছি। আর কারো মুখে তুবড়ী ফুটলে তো আমি বাধা দেই নি।'

অরুন্ধতী রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেললেন। বললেন 'তোর সঙ্গে তর্কে কে পারবে! আমার অত সময় নেই বকবক করবার।'

সুরপতি যে ঘরে বসেছিলেন আস্তে আস্তে সেই ঘরে এসে ঢুকলেন অরুন্ধতী। সুরপতির দিকে তাকিয়ে একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তুমি না কি যাবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছ?'

সুরপতি অরুন্ধতীর দিকে তাকালেন, সংক্ষেপে বললেন, 'হ্যাঁ, একটু তাড়া আছে। দেখা সাক্ষাৎ তো হয়েই গেল, আবার কি।'

না, আর কিছু বাকি নেই, আর কোন ভয় নেই সুরপতির। অরুন্ধতী আজ পঞ্চাশ উৎরে গেছেন। অভাব অনটনের মধ্যেও তাঁর রূপ অবশ্য এখনো আছে। কিন্তু সে রূপ কোন পুরুষের বুকে আর জ্বালা ধরায় না। সুরপতির নিজের বয়সও পঞ্চাশের কাছাকাছি। এসব ব্যাপার নিয়ে জ্বলবার বয়স তাঁরও আর নেই। এসব ব্যাপারে অবশ্য শুধু বয়সটাই বড় কথা নয়। অনেকে এ বয়সেও অনেক কিছু করে। কোন কোন সমবয়সী বন্ধুর কীর্তি কাহিনীর কথা সুরপতির এখনো কানে আসে। প্রবৃত্তি আর প্রবণতাই সব চেয়ে বড় কথা। সেই প্রবৃত্তি আর সুরপতির নেই। অথচ একদিন এই নারীটির জন্যে সুরপতি কী চঞ্চলই না হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সে চাঞ্চল্য তেমন করে প্রকাশ করবার সাহস সুরপতির ছিল না। অরুন্ধতী তখন স্বামী-সন্তান-সম্পদে সৌভাগ্যবতী। তাঁর আকাঙ্ক্ষার কোথাও কোন অপূর্ণতা নেই। আর সুরপতির তখন সবই অপূর্ণ। অরুন্ধতীর

বাড়িতে তিনি তখন সামান্য একজন গৃহ শিক্ষক। দরিদ্র বেকার যুবক। চাঁদের সঙ্গে উদ্বাহু বামনের যে দূরত্ব তার চেয়েও বেশি দূরত্ব অরুন্ধতী আর স্বরপতির মধ্যে। অরুন্ধতীকে একটু দেখবার জন্যে, কোন না কোন ছলে তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলবার জন্যে, উন্মুখ হয়ে থাকতেন স্বরপতি। একটু পায়ের শব্দ, হাসির শব্দ, চুলের গন্ধের জন্যে অপেক্ষা করতেন। কী কাতরতা, কী দারিদ্র্য, কী কাঙালপনার মধ্যেই কেটেছে সেই দিনগুলি। অরুন্ধতী কি কিছুই টের পেতেন না? নিশ্চয়ই পেতেন। স্বরপতির চোখে মুখে সেই গোপন বাসনার বিচ্ছুরণ তো লক্ষ্য না করবার মত বস্তু নয়। অরুন্ধতী সবই বুঝতেন, সবই টের পেতেন, কিন্তু ভয় পেতেন না, ভয় করতেন না। না নিজেকে, না স্বরপতিকে। তিনি স্বরপতির সঙ্গে প্রচুর হাসি-পরিহাস, ঠাট্টা-তামাসা করতেন। বাজার থেকে নানারকম জিনিসপত্র স্বরপতিকে দিয়ে আনিয়ে নিতেন। তার বদলে আদর যত্ন খুবই পেতেন স্বরপতি। কিন্তু তার বেশি কিছু পেতেন না। মাঝে মাঝে স্বরপতির মনে হোতো যা তিনি চান তা কেড়ে নেবেন। সে বস্তু কোন মেয়ের কাছ থেকে ভিক্ষা করলে পাওয়া যায় না, কিন্তু জোর ক'রে কেড়ে নিলে হয়তো কিছুটা পাওয়া যায়। নেপথ্যে সেই জোর জবরদস্তির যত মহড়াই চলুক অরুন্ধতীর সামনে কোনরকম অশোভন আচরণই করতে পারতেন না স্বরপতি। নিজের এই নিষ্ক্রিয় কাপুরুষতার জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিতেন। মাঝে মাঝে জোর করে দুঃসাহস প্রকাশের চেষ্টা করতেন। অরুন্ধতী সে সব দেখে হেসে বলতেন, 'স্বরো ঠাকুরপো, তোমার মাথায় ছিট আছে। বিয়ে না করলে এ ছিট যাবে না।'

একথা শুনে স্বরপতির রাগ হোতো, অভিমান হোতো। তাঁর এই অগাধ প্রেমকে, দুর্নিবার আকর্ষণকে অরুন্ধতী বলছেন ছিট, বলছেন অবিবাহিত যুবকের মানসিক বিকৃতি। স্বরপতি একদিন বলতে পেরেছিলেন, 'আমার এই ছিট যাবে না, একটা কেন হাজারটা বিয়ে করলেও না।'

অরুন্ধতী পিঠে হাত বুলাবার ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'যাবে যাবে। সময়ে সব সারবে।'

অরুন্ধতীর ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছে। বয়স আর অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বুদ্ধি বেড়েছে, বাস্তববোধ বেড়েছে সুরপতির। হৃদয় অনেক শক্ত হয়ে গেছে। এত শক্ত যে তাতে আর কোন আঁচড় পড়ে না, সে হৃদয়ের আর ভাঙবার মচকাবার আশঙ্কা নেই, তা ছাড়া লক্ষ্য সরে গেছে, মূল্যবোধ বদলে গেছে। সুরপতিব সাধনা আরাধনার বস্তু এখন আর কামিনী নয়, কাঞ্চন। তাব রহস্য সুরপতির কাছে নারী হৃদয়ের চেয়েও নিগূঢ়, গ্রন্থি জটিল।

দিন বদলায়, সম্পর্ক বদলায়। তাঁর আর অরুন্ধতীর সম্পর্কেরও আজ পরিবর্তন ঘটেছে। আজ সুরপতি দাতা, অরুন্ধতী প্রার্থিনী। তাঁর কাছে অরুন্ধতীকে হাত পাততে হয়েছে। অবশ্য সুরপতি যা চেয়েছিলেন অরুন্ধতী তা চান না। তবু কিছু তো চান, কিন্তু চাইলেই কি মেলে। হাত পাতলেই কি আর দু হাতের আঁজলা পূর্ণ হয়? হিসেব করে করে অনেক কষ্টে কারবারকে দাঁড় করাতে হয়েছে সুরপতির। বে-হিসেবী তিনি কিছু আর করতে পারেন না, দিতে পারেন না। চাইলেও পাবেন না। হিসেবের বাইরে যাওয়ার শক্তি তাঁর আর নেই। অরুন্ধতী যা দিয়েছিলেন, তাই পাবেন। তার বেশি সুরপতি তাঁকে দেবেন না। কিছুতেই না। জগৎটাই বিনিময়েব। দান করলে তার প্রতিদান মেলে। কিন্তু কী দিয়েছিলেন অরুন্ধতী? কিছু না, একেবারে শূন্য। সেই শূন্যের বিনিময়ে সুবপতি অরুন্ধতীর ছেলেকে তবু পঞ্চাশ টাকার চাকরি দিয়েছেন। যথেষ্ট দিয়েছেন। আর কী চান অরুন্ধতী, আর কী প্রত্যাশা করেন?

সুরপতিকে নিরুত্তর দেখে অরুন্ধতী বললেন, 'ব্যাপার কী, মনে মনে ব্যবসার হিসেব করছ না কি? আমার কথার জবাব দিচ্ছ না যে।'

স্বরপতি বললেন, 'জবাব তো দিলাম। দেখাসাক্ষাৎ হয়ে গেল, এবার চলি। কাজকর্ম আছে।'

স্বরপতি একটু হাসতে চেষ্টা করলেন।

অরুন্ধতী বললেন, 'জানি তুমি আজকাল দারুণ কর্মবীর হয়ে উঠেছ।'

স্বরপতি বললেন, 'তা যদি বলেন, বীরাঙ্গনা আপনিই বা কম কিসে ?'

অরুন্ধতী মৃদুস্বরে বলছেন 'আস্তে। ওরা শুনতে পাবে।'

আর হঠাৎ অরুন্ধতীর এই সতর্কতা, এই নিচু গলায় কথা বলবার ভঙ্গি, এই একান্ত ঘনিষ্ঠ সুর ভারি ভালো লাগল স্বরপতির। মনে হলো তখন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চেষ্টা করেও যা পাননি আজ এই মুহূর্তে তাই পেলেন। এই একটিমাত্র কথায়, স্বরপতির চোখে অরুন্ধতীর রূপ যেন বদলে গেল। অরুন্ধতী যেন আর পঞ্চাশ বছরের বিধবা প্রৌঢ়া নয়, পঁচিশ বছরের পূর্ণ বিকশিতা সেই রহস্যময়ী নারী।

অরুন্ধতীর কথার জবাবে স্বরপতি বললেন, 'শুনলই বা। আমি তো আর মিথ্যে বলিনি।'

অরুন্ধতী হেসে বললেন 'সব সত্যি কথাই বুঝি গলা ছেড়ে বলতে হয় ? বেশ, তুমি কাজের মানুষ, তোমার দরকার থাকে তুমি যেতে পার। সেদিন তো আর নেই। আমার এখানে চা খেতে বলব তোমাকে কোন্ সাহসে ? আমাদের বাড়ির সস্তা চা তোমার মুখে রুচবেই বা কেন ? কিন্তু সুজাতাকে আমি যেতে দেব না। আমার যতক্ষণ ইচ্ছা, যতক্ষণ খুসি ওকে ধরে রাখব। তোমার ওপর আমার দাবী না থাকতে পারে, কিন্তু ওর ওপর আছে।'

স্বরপতি অদ্ভুত একটু হাসলেন 'তাই নাকি ? কিসের দাবি শুনি ?'

স্বরপতির বিদ্রূপের ভঙ্গিতে অরুন্ধতী প্রথমে একটু অপ্রতিভ হলেন, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে শান্তভাবে বললেন 'শুনলেই কি আর তুমি বুঝতে পারবে ? এ তো তোমার ব্যাঙ্কের হিসেবের খাতা নয়, এ

একেবারে বে-হিসেবের জিনিস। আমার উমা, নীলার ওপর আমার যে দাবি সুজাতার ওপর তার চেয়ে কম নয়। আমি ও ঘরে যাই, ছেলে মেয়েদের খেতে দিই গিয়ে। তোমার ইচ্ছা হয় তুমি যাও, সাধ্য থাকে আমার দাবি অপ্রমাণ কর।'

অরুন্ধতী মুখ ফিরিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

উঠি উঠি ক'রেও সুরপতি উঠতে পারলেন না, ডাকি ডাকি ক'রেও ডাকতে পারলেন না কাউকে।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে অরুন্ধতীর ঘরেই তাঁর ডাক পড়ল।

উমা এসে বলল, 'মার কাণ্ডই আলাদা। আপনাকে একা একা বসিয়ে রেখে চলে গেছেন। চলুন, ও ঘরে চলুন।'

সুরপতি তার দিকে তাকালেন। দেখতে প্রায় মার মতই হয়েছে উমা। অরুন্ধতীর মতই তার গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌর, কালো বড় বড় চোখ, পরিপূর্ণ সুডৌল মুখ। কিন্তু এই বয়সেই বৈধব্যের এমন শুভ্র শূন্য যোগিনী বেশ ধরতে হয় নি অরুন্ধতীকে। তখনো হরবিলাস বাবু বেঁচে ছিলেন। জজকোর্টে প্র্যাকটিস ক'রে প্রচুর রোজগার করছিলেন। সিঁদুরে, সোনায় সোহাগে এ বয়সে ভোগের পূর্ণ প্রতিমা ছিলেন অরুন্ধতী।

অকালে সর্বস্বান্ত-হয়ে-যাওয়া এই মেয়েটির ওপর কেমন একটু মমতার ছোঁয়া লাগল সুরপতির মনে। স্নেহকোমল স্বরে বললেন, 'চল মা, চল।'

ঘরে জায়গা যে নিতান্ত কম তা নয়। কিন্তু বিছানা বাক্স তোরঙ্গে তার অনেকখানি জুড়ে রয়েছে। পাশাপাশি তিন চার খানা ঠাঁই করা সেখানে কষ্ট। ঘরের সামনে যে সরু এক ফালি বারান্দা আছে সেখানেই ঠাঁই করলেন অরুন্ধতী।

সুরপতির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার ছেলে মেয়েদের আমি বারান্দা উঠানে চাটাই আর খবরের কাগজ পেতে অসংকোচে খেতে দিতে পারি। কিন্তু তোমাকে—'

সুরপতি বললেন, 'জানি আপনার যত সংকোচ শুধু আমার বেলায়।'

অনেক দিনের পুরোন, অরুন্ধতীর নিজের হাতে বোনা ফুলতোলা বড় একখানা আসন পাতা হয়েছে। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে দিয়ে অরুন্ধতী বললেন, 'বোসো ওখানে। ছেলে মেয়েদের সঙ্গে একসঙ্গে বসেই খাও, সেই ভালো।'

সুরপতির মনে পড়ল অরুন্ধতীদের রংপুরের বাড়িতে এইরকম সারি সারি ঠাঁই পড়ত। তখন দলপতি ছিলেন অরুন্ধতীর স্বামী হরগোপাল। চন্দ, বাড়ির কর্তা। একসঙ্গে বসে গল্প করতে করতে খাওয়াটা ছিল তাঁর বিলাস।

তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, 'আহা সুরপতিকে না হয় ঘরের কোনা-কানাচে বসিয়ে দাও। এমন প্রকাশ্যভাবে বামুনের ছেলের জাত মারা কি ভালো।'

অরুন্ধতী বলতেন, 'ঈস্, ভারি তো বামুন। কত জনের হাতে কত অখাদ্য যে খেয়েছে তার ঠিক আছে নাকি। তুমি ভেব না, যাওয়ার মত জাত সুরপতি ঠাকুরপোর আর এক ফোঁটাও নেই। যেটুকু আছে, সেটুকুও ও বিলিয়ে দিতে পারলেই বাঁচে।'

কে জানে অরুন্ধতীর সেদিনের কথায় কোন খোঁচা ছিল কিনা, কোন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ছিল কিনা। সুরপতি লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। বহু চেষ্টা করেও অরুন্ধতীর কথার যোগ্য জবাব দিতে পারেন নি।

আজও নিরুত্তরে তিনি অরুন্ধতীর দেওয়া বড় আসনখানায় গিয়ে বসলেন। তাঁর পাশে বসেছে অসিত। অসিতের পাশে সুজাতা আর নীলা। উমাকে কিছুতেই বসানো যায়নি। সে বিধবার আচার মেনে চলে। যখন তখন খায় না। মার সঙ্গে সঙ্গে সেও পরিবেশন সুরু করেছে। লুচি, ডাল, তরকারী, মাছের কালিয়া। সবই অরুন্ধতীর নিজের হাতের রান্না।

সুরপতি খেতে খেতে বললেন, 'এতসব আয়োজন করেছেন কেন। এর কী দরকার ছিল।'

অরুন্ধতী বললেন, 'আয়োজন আর কই। গরীব মানুষ, তোমাকে

আয়োজন করে খাওয়াবার সাধ্য আছে নাকি আমাদের। তোমরা বড় লোক। কত কী খাও।'

সুরপতি বললেন, 'তা ঠিক। আমরা বড় লোক। বড় বড় জন্তু ছাড়া কিছু খাইনে। কোন দিন হাতি, কোন দিন ঘোড়া, কী বল বুলু। আর অসিতরা বোধহয় চীনাদের খাদ্য খায়। ছুঁচো চামচিকে তেলাপোকা সব ছোট ছোট প্রাণী।'

সুরপতির এই রসিকতায় সকলেই মুখ টিপে হাসতে লাগল।

কিন্তু হাসল না নীলা। সে খেতে খেতে গম্ভীর মুখে বলল, 'হাতি চামচিকের তফাৎটা সব সময় শুধু কি চোখে দেখা যায়?

সুরপতি ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী বললে?'

অরুন্ধতী বললেন, 'ওর কথায় কান দিয়ো না, ওর কথার কোন মাথা মুণ্ডু নেই। ও আমার এক ঠোঁট-কাটা ঝগড়াটে মেয়ে, সকলের সঙ্গে ওর শুধু ঝগড়ার সম্পর্ক।'

সুরপতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই-বোনেদের সঙ্গেও তাই নাকি!'

অরুন্ধতী বললেন, 'তাছাড়া কি, দাদার সঙ্গে তেমন পেরে না উঠলেও দিদির সঙ্গে তো ওর খিটিমিটি লেগেই আছে।'

নীলা মার দিকে স্থির দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে ফের খাওয়ায় মন দিল।

সুজাতা অরুন্ধতীর দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল, 'আপনি নীলাদির নিন্দে করবেন না। ওঁর মত চমৎকার মেয়ে আর নেই।'

খাওয়া শেষ হওয়ার পর আরো আধ ঘণ্টা ধরে গল্প গুজব চলল। অরুন্ধতী অতীতের বহু ছোট খাট কাহিনী বললেন। সুরপতি যখন প্রাইভেট টিউটর ছিলেন তখন তাঁর অন্যমনস্কতা, কাজকর্মে অপটুতা, সাধারণ জ্ঞানের অভাব নিয়ে অনেক কৌতুকের গল্প করলেন। সে সব কাহিনীর মধ্যে বেশির ভাগই অতিরঞ্জন। কিন্তু সেদিকে অরুন্ধতীর ভ্রূক্ষেপ নেই। সকলের মনোরঞ্জনই তাঁর উদ্দেশ্য।

সুরপতি মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করতে লাগলেন। বললেন, 'তোমরা ওঁর কথা মোটেই বিশ্বাস কোরো না। উনি সব বানিয়ে বলছেন।'

অরুন্ধতী বললেন, 'এক বিন্দুও বানানো নয়। তোমাদের সত্যি বলছি এক হাতে স্কুলে ছাত্রছাত্রীকে শাসন করতে হোত, আর এক হাতে স্বয়ং মাস্টার মশাইকে।'

সুরপতি অরুন্ধতীর দিকে তাকালেন। ওঁর কথার মধ্যে কোন কি অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থ আছে। কিন্তু অরুন্ধতীর সঙ্গে চোখা-চোখি হোলো না। তাঁর চোখ তখন অসিত সুজাতাদের দিকে। তাঁর মুখে বাৎসল্যের স্নিগ্ধ হাসি।

হঠাৎ সুরপতি চমকে উঠলেন। অসিত আর সুজাতা পাশাপাশি বসেছে। বসবার ভঙ্গিতে মনে হয় দুজনের মধ্যে যেন অনেকদিনের আলাপ, বহুদিনের ঘনিষ্ঠতা। দীর্ঘকালের অপরিচয়ের ব্যবধান, সামাজিক আর্থিক অবস্থাগত ব্যবধান ওরা যেন অল্প সময়ের মধ্যে বড় অনায়াসে পার হয়ে এসেছে। ওরা যে একজন আর একজনকে খুব পছন্দ করেছে তা ওদের তাকাবার ভঙ্গিতে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবার আগ্রহে প্রকাশ হয়ে পড়ছে।

বিষয়টাকে তেমন প্রসন্নভাবে নিতে পারলেন না সুরপতি। তাঁর মুখ গম্ভীর আর কঠিন হয়ে উঠল। না, এ বড় অসঙ্গত, অসমীচীন, অশোভন।

সুরপতি বললেন, 'চল সুজাতা, এবার ওঠা যাক। তোমাদের পাল্লায় পড়ে আমার কাজকর্ম সব মাটি হোলো। চল, এবার যাওয়া যাক।'

সকলেই সুরপতির হঠাৎ এই ভাবান্তরে বিস্মিত হোলো। এতক্ষণ তো তিনি বেশ খোশ মেজাজেই ছিলেন। সকলের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসায় যোগ দিয়েছিলেন। হঠাৎ কী হোলো তাঁর। হয়ত সেই অসমাপ্ত দরকারী কাজের কথাটা তাঁর এতক্ষণে ফের মনে পড়েছে।

অরুন্ধতী অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'সত্যি, তুমি এসে অবধিই তো জরুরী কাজের কথা বলছ। বাজে গল্পে মিছামিছি তোমাকে আটকে রেখে না জানি কত ক্ষতিই করলাম।'

অরুন্ধতীর কথায় আন্তরিকতা ছিল। সুরপতিকে তা স্পর্শ করল। তিনি বললেন, 'না না, তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি। আপনি সেজন্যে ভাববেন না। তা ছাড়া লাভ ক্ষতি দুই নিয়েই আমাদের কারবার। লোকসান হয়, আবার পুষিয়েও নিতে হয়। কারবারীকে কিছুতেই ভয় করলে চলে না।'

ড্রাইভারকে আগেই খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। খাওয়ার পর তার একটু ঝিমুনি এসেছিল। মনিবের ধমকে তন্দ্রা ছুটল। মেয়েকে নিয়ে সুরপতি গাড়িতে উঠলেন।

এগিয়ে দেওয়ার জন্যে অসিত, উমা, নীলা সবাই এসে দাঁড়াল। অরুন্ধতী, এলেন পিছনে পিছনে। সুজাতার দিকে তাকিয়ে স্মিতমুখে স্নিগ্ধ স্বরে বললেন 'আর একদিন এসো। বাড়ি তো চেনাই রইল। যখন খুসি চলে আসবে।'

সুজাতা বলল, 'তা আসব। কিন্তু আপনি উমাদি নীলাদিদের নিয়ে একদিন যাবেন। আপনি না গেলে কিন্তু আর একদিনও আসব না।'

অরুন্ধতী বললেন 'আচ্ছা, আচ্ছা যাব। আমার কি আর বেরোবার জো আছে।'

সুজাতা বলল, 'নিশ্চয়ই আছে। আমি দিন ঠিক করে গাড়ি পাঠাব, আপনাদের যেতেই হবে। না গেলে কিন্তু আর কোন সম্পর্ক থাকবে না।'

অরুন্ধতী বললেন, 'আচ্ছা মেয়ে। অত সহজেই বুঝি সম্পর্ক তুলে দেওয়া যায়। কত ঝড় যায়, ঝাপটা যায়, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তবু টিকে থাকে, টিঁকিয়ে রাখতে হয়।'

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল। সরু গলি ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়ে বেগে চলতে লাগল গাড়ি। সহরতলী পার হয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত সহরে এসে পৌঁছল সুজাতারা। কিন্তু একেবারে নিজেদের বাড়ির সামনে না এসে পড়া পর্যন্ত সে কিছু টেরই পেল না। মাঝে মাঝে রাস্তার দিকে তার চোখ পড়লেও তার সমস্ত মন পড়ে ছিল অসিতদের বাড়িতে তাদের পরিবারটির সঙ্গে। হাসি, গল্পে, আলাপে

আলোচনায় ভারি চমৎকার একটি বিকেল আর সন্ধ্যা আজ কাটল সুজাতার। এমন একটি পারিবারিক স্বাদ সে যেন জীবনে আর কোন দিন পায় নি। বাবার কোন ধনী বন্ধুর বাড়িতে নয়, নিজেদের দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয় কুটুম্বের বাড়িতে নয়। আজ যা পেল তা যেন সম্পূর্ণ অনাস্বাদিত। এতদিন ছিল নিঃসঙ্গ দ্বীপের যেন এক বন্দিনী মেয়ে। আজ ছাড়া পেয়েছে। আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু শুধু কি পেয়েই এল, নিয়েই এল সুজাতা? কিছু কি দিয়ে আসতে পারে নি? না দিতে পারলে কি নেওয়া সম্পূর্ণ হয়, নিয়ে আনন্দ হয় এত?

মাসখানেক পরে একদিন জেনারেল ম্যানেজার অবনী মোহনের ঘরে ডাক পড়ল অসিতের। বিল ডিপার্টমেণ্টের কয়েকজন সহকর্মী তার মুখের দিকে তাকাল।

সুধীর বলল, 'কী ব্যাপার, ভুল চুক কিছু করেছেন নাকি অসিত বাবু?'

প্রশান্ত বলল, 'না না এ নির্ঘাৎ ট্রান্স্ফারের ব্যাপার। দেখুন গিয়ে একবার কোথায় ঠেলে দেয়। বোম্বে, না মাদ্রাজ।'

ইনচার্জ প্রৌঢ় মনিময় বাবু বললেন, 'এখানে বসে আর গবেষণা ক'রে দরকার নেই আপনাদের। মিঃ চ্যাটার্জী যখন ডেকে পাঠিয়েছেন তাড়াতাড়ি চলে যাওয়াই ভালো।'

অসিত কোন কথা না বলে কলমটা রেখে জেনারেল ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঘরখানির আকার অনেকটা ত্রিভুজের মত। সুন্দর সুপরিচ্ছন্ন। পুবে আর উত্তরে দু'টি ক'রে বড় বড় জানালা। মাঝখানে সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলের ওপর দামী দোয়াতদানী, রঙীন কাগজ চাপা, টেবিল ক্যালেণ্ডার। প্রত্যেকটি আসবাবে রুচি আর আভিজাত্যের ছাপ।

অবনী ছাড়া আর কোন লোক ছিল না। অসিতের সঙ্গে নির্জনে কথা বলবার জন্যই অবনী হয়ত এই ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিল। সে ঘরে ঢুকতেই

সামনের গদি আঁটা চেয়ারগুলির একটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে অবনী স্মিতমুখে বলল, 'বসুন।'

অসিত একটা চেয়ারে বসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অবনীর দিকে তাকাল।

অবনী বলল, 'কেমন লাগছে ব্যাঙ্কের কাজ-কর্ম? খুব ভাল খুব বোরিং মনে হচ্ছে না তো।'

অসিত বলল, 'না না তা কেন। ভালোই লাগছে।'

অবনী হেসে বলল, 'ভালো লাগবে। ওপর থেকে বিষয়টাকে একটু নীরস মনে হতে পারে কিন্তু যদি একটু ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করেন, দেখবেন এর চেহারা অন্যরকম। দেখবেন নেশান বিল্ডিংএর কাজে এর স্থান কত বড়।'

অসিত বলল, 'তা ঠিক। আমার অবশ্য সেইভাবে কাজ করবারই ইচ্ছা। নানা জায়গায় তো ঘুরে বেড়ালাম কোথাও কোন সুবিধে হোলো না। এবার দেখি চেষ্টা ক'রে ব্যাঙ্কিংটাকে যদি ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে পারি।'

অবনী বলল, 'হ্যাঁ, তাই নিন। আমরা সকলেই তাই চাই; আপনার কাজকর্মের কথা আমরা শুনেছি। চেয়ারম্যানের সঙ্গে এই নিয়ে কথাও হয়েছে। আমাদের এই ইনষ্টিটিউসনে যোগ্য লোককে যোগ্য স্থান দেওয়া হয়। চেয়ারম্যানের ভাষায় শালগ্রাম দিয়ে যাতে বাটনা বাটা না হয় তার দিকে আমরা লক্ষ্য রাখতে চেষ্টা করি।'

অবনী একটু হাসল।

অসিত অবনীর দিকে তাকিয়ে তার আসল বক্তব্যের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

অবনী বলল, 'শুনুন, আপনাকে একটা ফার্স্ট ক্লাস ব্রাঞ্চের ম্যানেজার করেই আমাদের পাঠাবার ইচ্ছা। কিন্তু এখন তেমন কোন পোষ্ট খালিও নেই, তাছাড়া আপনার আরো কিছু অভিজ্ঞতা বাড়াবারও দরকার আছে। আপাততঃ আপনি সেণ্ট্রাল এষ্টাব্লিস্মেণ্টে আসুন। আমাদের যে সব ব্র্যাঞ্চ আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কাজটা দেখুন আপনি।'

অসিত বলল, 'আমার আপত্তি নেই। আপনারা যেখানে কাজ করতে বলবেন সেখানেই করব।'

অবনী বলল, 'শুনে খুসি হলাম। কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হ'তে পারছিনে।'

অসিত বিস্মিত হয়ে বলল, 'কেন।'

অবনী বলল,'আজ কালকার কোন employeeর মুখে বেশি আনুগত্যের কথা শুনলে ভয় হয়। যা দিনকাল।' কিন্তু পরক্ষণে নিজেই হেসে উড়িয়ে দিল কথাটা। 'কিছু মনে করবেন না, আমি ঠাট্টা করছিলাম। এর মধ্যে আনুগত্যের কোন কথাই উঠতে পারে না। আমরা পরস্পরের কলীগ, এক সঙ্গে কাজ করতে এসেছি। আমাদের দুজনের আনুগত্যই ইনষ্টিটিউসনের কাছে। কী বলুন, তাই না?'

অসিত ঘাড় নেড়ে অবনীর কথায় সায় দিল।

তারপর কয়েক মিনিট ধরে নতুন কাজের ধরণটা অসিতকে বুঝিয়ে দিল অবনী। বিভিন্ন ব্রাঞ্চের কাজকর্ম কী ভাবে চলছে, তাদের ম্যানেজার এ্যাকাউনট্যান্টের ষ্টেটমেণ্টগুলি পরীক্ষা করা, তাদের কাছে চিঠিপত্র লেখা, চিঠির জবাব দেওয়া প্রধানত এ ধরণের কাজগুলিই অসিতকে দেখতে হবে। কাজের যা ধরণ তাতে অবনীর সঙ্গেই তার প্রত্যক্ষ যোগ থাকবে, তার কাছেই দায়ী থাকতে হবে অসিতকে। মাঝখানে আর কোন বড় অফিসার থাকবে না।

অসিত বলল, 'মানে আপনার personal assistant.'

অবনী হেসে বলল, 'অফিসের ভাষায় বলতে গেলে ওই রকম একটা নামই দিতে হয় বটে। কিন্তু আসলে আপনার বন্ধুত্বই আমার কাম্য। আপনার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয়ের সুযোগ যাতে আরো বাড়ে সেইজন্যেই এ ব্যবস্থা করেছি।' বলে অবনী একটু হাসল 'আশা করি, আপনার কোন আপত্তি নেই?'

একটু যেন পরিহাসের সুর অবনীর গলায়।

অসিত বলল, 'না না, আপত্তির কী আছে। এ তো আমার সৌভাগ্য।'

এবার অবনীর মনে হোলো অসিত খোঁচাটা ফিরিয়ে দিয়েছে।

কথা শেষ ক'রে অসিত চলে যাচ্ছিল অবনী বাধা দিয়ে বলল, 'চিঠিটা আপনি এখান থেকেই নিয়ে যান। পরে পিওন বুকে সই করে পাঠালেই হবে।'

টাইপ করা একটি চিঠি অসিতের হাতে দিল অবনী। চাকরির স্থায়িত্বের এবং বেতন বৃদ্ধির সংবাদ আছে চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরিত এই চিঠিতে। অসিতকে একশ টাকা মাইনে ও কুড়ি টাকা ভাতা দিতে পেরে কর্তৃপক্ষ খুসি হয়েছেন।

কিন্তু অসিতকে তেমন খুসি দেখাল না। মাত্র একশ কুড়ি! জেনারেল ম্যানেজার যেখানে বারশো পান সেখানে মাত্র একশ কুড়ি টাকায় অসিতকে তাঁর সহকারিতা করতে হবে! কিন্তু পরক্ষণে নিজেরই হাসি পেল অসিতের। কার সঙ্গে কিসের তুলনা করছে সে। অবনীমোহন ব্যাঙ্কিংএর ডিগ্রী পাওয়া বিলাত-ফেরৎ মানুষ। আর সে সগু নিযুক্ত একজন সাধারণ কেরাণী। তুলনার কথা তো উঠতেই পারে না। বরং ক'মাস যেতে না যেতে তার এই আকস্মিক পদোন্নতি আর বেতনবৃদ্ধি সম্পূর্ণ অভাবিত ব্যাপার। নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়ে ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের কাছে এজন্য তার বরং কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

অসিতের মুখের দিকে তাকিয়ে অবনী তার মনের ভাবটা কিছু কিছু আন্দাজ করে বলল, 'অবশ্য মাইনেটা আপনার যোগ্যতার তুলনায় তেমন কিছু নয়। আমি চেয়ারম্যানকে বলেওছিলাম কথাটা। কিন্তু তিনি মাথা নাড়লেন। বললেন, এর চেয়ে বেশি দেওয়ার সাধ্য ব্যাঙ্কের নেই। অবশ্য এ ধরণের সুযোগও এখানে খুব রেয়ার। বহু এম্.এ. ডবল এম্.এ. এখানে কাজ করছেন। দু'তিন বছরেও তাঁরা আপনার র‍্যাঙ্কে আপনার স্যালারিতে উঠতে পারেন নি।'

অসিত ভাবল জিজ্ঞেস ক'রে তাহ'লে তার ওপরই বা হঠাৎ এমন

দাক্ষিণ্য বর্ষণ কেন হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্নটা অশোভন হবে, নিজের স্বার্থের প্রতিকূল হবে ভেবে চুপ ক'রে রইল। একটু বাদে অবনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসছে, হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। ইঙ্গিতে অসিতকে বসতে বলে রিসিভারটা তুলে নিল অবনী। ফোনের ভিতর দিয়ে যে কণ্ঠ সে শুনতে পেল তাতে তার মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। অবনী বলল, 'ভালোই হোলো সুজাতা তুমি ফোন করলে। এই মুহূর্তে একটা সুখবর দেওয়ার জন্যে আমিই তোমাকে রিং করতে যাচ্ছিলাম।'

অসিত চলে যাওয়ার উপক্রম করতেই অবনী তাকে হেসে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'দাঁড়ান। সুজাতা তো আপনারও খুব পরিচিত, বলতে গেলে বন্ধু। সুখবরটা আপনিই ওকে ফোনে বলে দিন।'

একটু যেন আরক্ত হয়ে উঠল অসিতেব মুখ। তাহলে কি নিজের যোগ্যতা দক্ষতায় তার এত তাড়াতাড়ি মাইনে বাড়ে নি। বাপের কাছে, ভাবী স্বামীর কাছে, সুজাতার সুপারিশের ফলেই অফিসে তার এই দ্রুত উন্নতি ঘটেছে। মাত্র একশ কুড়ি টাকা মাইনে পাওয়ার মত কৃতিত্ব আর কর্মক্ষমতাটুকুও কি তার নেই। অসিত অবশ্য সুজাতাকে নিজে কোন অনুরোধ করেনি। উমা নীলাকে নিয়ে অরুন্ধতী একদিন সুজাতাদের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন। নিমন্ত্রণ সত্বেও অসিত সেদিন যায়নি। কিন্তু ছেলের অসাক্ষাতে অরুন্ধতী যে তার মাইনে বাড়াবার জন্যে সুজাতার কাছে অনুরোধ করেছেন, নিজের মাকে ততখানি আত্মমর্যাদাহীন বলে ভাবতে অসিতের কষ্ট হোলো। হয়ত স্পষ্ট ক'রে কিছু বলেননি অরুন্ধতী। সুজাতাই সব দেখে শুনে আন্দাজ করে নিয়ে অবনীকে অনুরোধ করেছে। আর ভাবী স্ত্রীকে খুসি করবার জন্যেই অবনী অসিতের ওপর এই সামান্য দাক্ষিণ্যের পরিচয় দিয়েছে।

অবনীর কথার জবাবে অসিত বলল, 'আপনি যদি অনুমতি দেন মিঃ চ্যাটার্জী আমি যাই। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।'

অবনী একটু হেসে বলল, 'কিন্তু সুজাতার সঙ্গে কোন কথাই বলবেন না?'

অসিত একটু আরক্ত হয়ে বলল, 'না।'

অসিতের লজ্জায় কৌতুক বোধ করল অবনী, বলল, 'আচ্ছা, যান আপনি।'

অসিত চলে গেলে অবনী আবার ফোনে আলাপ সুরু করল, 'কী রকম সুখবর? অনুমান কর।'

ওপাশ থেকে সুজাতা জবাব দিল, 'আমার অনুমান করবার ক্ষমতা নেই, তুমি বল।'

অবনী বলল 'অসিত বাবুর প্রমোশন হয়েছে। তোমার বাবা তাঁকে মীরাট ট্রানস্ফার করতে চেয়ে ছিলেন। কিন্তু আমি রাজী হইনি।'

সুজাতা বলল, 'কেন?'

অবনী হেসে বলল, 'তাঁর মেয়ের কথা ভেবে।'

সুজাতা বলল, 'তুমি বড় যা তা বলছ। তোমাদের অফিসের কে কোথায় ট্রানস্ফারড হোলো না হোলো তাতে আমার কি এসে যায়।'

অবনী বলল, 'যায় না বুঝি? কিন্তু আমাদের মত সাধারণ লোকদের বেশ এসে যায়। আমরা ভেবে দেখলাম অসিত বাবুর মত লোককে হেড অফিসে ধরে রাখতে পারলেই আমাদের লাভ বেশি।'

সুজাতা বলল, 'তোমরা ব্যাঙ্ক চালাচ্ছ, বড় বড় পোষ্টে কাজ করছ, লাভ লোকসানের কথা তোমরা বুঝবে। ও সব কথা আমাকে শুনিয়ে কী হবে। আমি যা বলছি শোন। আজ সিনেমায় যেতে পারব না। টিকিট কাটার দরকার নেই। কথাটা জানাবার জন্যেই তোমাকে ফোন করেছি।'

অবনী বলল, 'সে কি কথা। টিকিট যে অনেকক্ষণ আগেই কেটে রেখেছি।'

'কিন্তু আমার যে ভয়ানক মাথা ধরেছে।' সুজাতা বলল, 'টিকিট দুটো

আর কাউকে দিয়ে দিও। টাকাটা না হয় দণ্ড হিসেবে আমিই দেব তোমাকে।'

অবনী কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল 'তা দিয়ো। দণ্ডই বলো, পুরস্কারই বলো, তুমি যা দাও তাই হাত পেতে নেব। কিন্তু এমন একটা সুখবর পেয়েও তোমার মাথা ধরা যাচ্ছে না?'

সুজাতা এবার বিরক্ত হয়ে বলল, 'ওই এক কথা ছাড়া আর যদি তোমার কিছু বলবার না থাকে আমি ফোন ছেড়ে দিচ্ছি।'

অবনী বলল, 'না, না, ছেড়ো না। রোজ তো আর সকাল সকাল ফিরতে পারিনে। ব্যাঙ্ক ছুটি হয়ে গেলেও তোমার বাবা আটকে রাখেন। ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ উন্নতির জল্পনা কল্পনা বসে বসে শুনতে হয়। কিন্তু মন পড়ে থাকে বর্তমানের একজন বাস্তবিকার কাছে।'

এবার ফোনের ভিতর দিয়ে মৃদু হাসির শব্দ শোনা গেল। 'তাই নাকি? বলতে হবে তো বাবার কাছে। এমন অন্যমনস্ক জেনারেল ম্যানেজার দিয়ে তিনি ব্যাঙ্ক চালাবেন কী করে? রিপোর্ট করলে চাকরি যাবে যে।'

অবনী বলল, 'যাক চাকরি। তুমি যদি থাক, আমার সব থাকবে। তাহলে ওই কথা রইল। সাড়ে চারটের মধ্যে আমি সোজা যাব তোমাদের ওখানে। তারপরেও যদি তোমার মাথা ধরা থাকে তখন স্থান কাল পাত্রী বুঝে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।'

সুজাতা হেসে বলল, 'আচ্ছা এসো। মাথা একবার ধরলে তা ছাড়ে। কিন্তু তোমার বেলায় তো সে কথা বলা যায় না।'

'তবু ভালো, দেরিতে হলেও কথাটা বুঝতে পেরেছ।'

হেসে রিসিভারটা রেখে দিল অবনী।

এলাহাবাদ যাওয়ার আগে অবনী সুজাতাকে খুব গম্ভীর ও বিষণ্ণ দেখে গিয়েছিল। এত তাড়াতাড়ি বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হচ্ছে না, অথচ সুরপতি আর অবনীর আদেশ অনুরোধের চাপ পড়ায় তার মন আরো

বিগড়ে যাচ্ছে। অবস্থাটা বুঝতে অবনীর বাকি ছিল না। প্রথম প্রথম অবনীও একটু বিরক্ত হয়েই উঠেছিল। কিন্তু তারপর স্থির ভাবে অবনী ভেবে দেখেছে ধৈর্য হারিয়ে লাভ নেই। সে যদি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে সুজাতা আরো বেঁকে বসবে। তার চেয়ে যে ভাবে চলছে সেই ভাবেই চলুক। যা করবার সুরপতি নিজেই করবেন। তিনি নিশ্চয়ই সুজাতাকে বেশি দেরি করতে দেবেন না। গরজ দেখানটা অবনীর সম্মানের পক্ষে হানিকর। তার চেয়ে খানিকটা নিস্পৃহতা আর ঔদাসীন্যের ভঙ্গি আনা ভ'লো।

ইউ, পির গোটা তিনেক ব্রাঞ্চ পরিদর্শনেব কাজ শেষ করে অবনী কলকাতায় ফিরে এল। কিন্তু সুজাতাদের সাদার্ণ এভিনিয়ুর বাড়িতে ফিরে গেল না। সুরপতি দু' দু' বার যেতে অনুরোধ করলেন কিন্তু অবনী কাজের অজুহাতে তা এড়িয়ে গেল। এরপর সুরপতি একদিন হেসে বললেন, 'ওহে, আমি নয় বুলুই যেতে বলেছে তোমাকে। আজ রাত্রে আমাদের ওখানে খাবে। উঁহু, আজ আব কোন ওজর শুনব না।'

অবনী আর বেশি আপত্তি করতে পারেনি।

খাওয়ার সময় কোমরে আঁচল জড়িয়ে সুজাতা নিজে পরিবেশন করেছে। রান্নায় ঝাল নুনটা পরিমিত হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছে সাগ্রহে।

অবনী খেতে খেতে মৃদু স্বরে বলেছে, 'এত গরজ কেন। নিজের হাতের রান্না বুঝি?'

সুজাতা বলেছে 'তোমার বুঝি ধারণা অন্যের হাত নিয়েই আমার যত মাথা ব্যথা?'

এই কদিনে হঠাৎ ভারি তরল, প্রগলভ হয়ে উঠেছে সুজাতা। দেখে অবনী কিছুটা বিস্মিতই হোলো। কিছুদিন আগেকার সেই বিষণ্ণ ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে দেখে তার ভালোই লাগল। ভোজন পর্ব শেষ হওয়ার পর নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে সুজাতা অবনীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'খুব রাগ করেছিলে নাকি? একেবারে দেখা সাক্ষাৎ পর্যন্ত বন্ধ?'

অবনী বলেছিল, 'বল কি, রাগ অভিমান ও সব তো তোমাদেরই এক চেটে। ওগুলি কি আমাদের মানায়?'

সুজাতা হেসে বলেছিল, 'যা বলেছ, সত্যি মানায় না।'

হাসিটুকু কিন্তু সত্যিই সুজাতাকে সেদিন খুব মানিয়েছিল। অবনীর মনে হয়েছিল অনেকদিন এমন ক'রে ও হাসেনি, মন খুলে কথা বলেনি।

অবনী একটুকাল তার দিক তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'একটা কথা বলব। তোমাকে কিন্তু আজ ভারি নতুন লাগছে।'

সুজাতা একটু লজ্জিত হয়ে মুখ নামিয়ে বলেছিল, 'এই বুঝি আরম্ভ হোলো?'

অবনী বলেছিল 'আরম্ভ তো আজ হয়নি, মাঝে মাঝে ছেদ পড়ে। তাই ফের গোড়া থেকে শুরু করতে হয়।'

এরপর দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ করে ছিল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিল সুজাতা, 'চল এবার ও ঘরে। বাবা অনেকক্ষণ একা বসে আছেন।'

অবনী হেসে বলেছিল 'তিনি মাঝে মাঝে একা থাকতেই ভালবাসেন। তারপর তোমার খবর কী বলো। তুমিও কি দিনগুলি একা একাই ঘরে বসে কাটিয়ে দিলে?'

সুজাতা বলেছিল, 'তা কেন? আমি আর বাবাও সেদিন বেড়িয়ে এলাম।'

'কতদূরে গিয়েছিলে?'

'বেশি দূরে নয়, এই বেলেঘাটা পর্যন্ত। সব সময় দূরের বেড়ানটাই বুঝি বেড়ানো।'

অবনী বলেছিল, 'তা কেন, ধারে-কাছেও বেড়াবার অনেক জায়গা আছে। কোথায় গিয়েছিলে বল, ভ্রমণ কাহিনীটি শুনি।'

কাহিনীটা সবিস্তারেই বলেছিল সুজাতা। অসিতের বেলেঘাটার অবস্থা, তার দারিদ্র্য, অরুন্ধতীর স্নেহ, উমা আর নীলা দুই বোনের

স্বভাবের বৈপরিত্য খুঁটে খুঁটে সবই অবনীকে জানিয়েছিল। তারপর হঠাৎ বলে উঠেছিল 'যাই বলো অসিত বাবুর মত একজন qualified ভদ্রলোক তোমাদের ব্যাঙ্কে মাত্র পঞ্চাশ টাকার মাইনেয় পড়ে আছেন এটা শুধু তাঁর পক্ষেই নয় তোমাদের পক্ষেও লজ্জার কথা।'

ঈর্ষার সূঁচ যে একটু বেঁধেনি একথা অবনী অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেই সামান্য যন্ত্রণাবোধকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হেসে বলেছিল, 'তাই নাকি ? তা নালিশটা তোমার বাবাকে জানালেই তো হয়।'

সুজাতা বলেছিল, 'সব নালিশই যদি তাঁকে জানাতে যাব তবে এত বড় জেনারেল ম্যানেজারটি রয়েছেন কিসের জন্যে ?'

অবনী বলেছিল, 'আচ্ছা কথাটা মনে রইল।'

কিছুদিন বাদে প্রস্তাবটা সুরপতির কাছে অবনীই করেছিল। অসিত বাবুকে এবার একটা চান্স দিলে হয়। অবনী খোঁজ নিয়ে জেনেছে সব ডিপার্টমেন্টের কাজই তিনি মোটামুটি শিখে নিয়েছেন। ওর সম্বন্ধে যে রিপোর্ট গেছে তা সন্তোষজনক বলা যায়।

সুরপতি অবনীর মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, 'বেশ তো, মীরাট ব্রাঞ্চে একজন এ্যাকাউনট্যাণ্ট দরকার। যে ছিল সে নাকি কাজ ছেড়ে দিয়েছে, তুমিই তো সেদিন বলছিলে। অসিতকে সেখানে পাঠাতে পার।'

অবনী বলেছিল, 'না, ওখানে অন্যলোক দেব ঠিক করেছি।'

যে যুবকটির ওপর সুজাতার সহানুভূতি জন্মেছে তাকে দূরে চোখের আড়ালে পাঠাতে চায় না অবনী। বরং তাকে কাছে কাছে রাখবে। পরীক্ষা ক'রে দেখবে কতখানি তার যোগ্যতা, কতখানি শক্তি। তারপর কোনদিন দ্বৈরথ যুদ্ধে যদি নামতেই হয়, প্রতিদ্বন্দ্বীকে সব রকম সুযোগ সুবিধা দিয়েই নামবে। নিঃসম্বল ক্ষীণবল দীনাতিদীন এক যুবকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আনন্দ নেই। অবনী মনে মনে হাসল।

খাস বেয়ারা নীলরতন এসে সেলাম জানিয়ে দাঁড়াল। বড় বাজারের লৌহ ব্যবসায়ী জগবন্ধু দাস কার্ড পাঠিয়েছেন।

দাস মশাই ব্যাঙ্কের সম্ভ্রান্ত পার্টি। কারেণ্টে, ফিকস্‌ড ডিপজিটে মোটা টাকা রেখেছেন।

অবনী বলল, 'আসতে বলো তাঁকে।'

ব্যক্তিগত অনুরাগ বিরাগের ভাবনা ছেড়ে ফের বিষয় কর্মে ফিরে আসতে পেরে কাজের মানুষ অবনী মোহন খুসি হয়ে উঠল।

পরদিন থেকে গদি আঁটা চেয়ার ড্রয়ার ওয়ালা বড় একখানা টেবিলের একক অধিপতি হোল অসিত। সারা অফিসের অনেকগুলি ঈর্ষাকাতর চোখ তাকে বার বার বিদ্ধ করতে লাগল। অফিসের নানা ডিপার্টমেণ্ট, ষ্টোররুমে, ছাদের ওপরে টিফিন খাওয়ার ঘরে তার এই আকস্মিক পদোন্নতি নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলল। এতদিন যারা অসিতের বন্ধু ছিল, তারা যেন হঠাৎ বিরোধী পক্ষের লোক হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু অল্প বয়সের অল্প মাইনের কেরানীরাই নয়, এ গ্রেডের বয়স্ক অফিসাররা পর্যন্ত অসিতের দিকে ঈর্ষা কুটিল চোখে তাকাচ্ছেন। কর্তৃপক্ষের এই নতুন অনুগ্রহ-ভাজন যুবকটি আসন দখল করে বসবে তাই বোধ হয় তাঁদের আশঙ্কা। অবশ্য মুখে সকলেই শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। চীফ এ্যাকাউণ্টাণ্ট শ্রীপতিবাবু, হেড অফিসের এ্যাকাউণ্টাণ্ট বিনয়বাবু, বিল, লোন, ক্লিয়ারিং ডিপার্টমেণ্টের ইনচার্জরা সবাই হাসি মুখে বললেন অসিতের এই আকস্মিক সৌভাগ্যে তাঁরা সত্যিই খুব খুসি হয়েছেন।

অসিত অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'আপনারা খুসি হয়েছেন এ খুবই আনন্দের কথা, আমি নিজে কিন্তু তেমন উল্লসিত হবার কারণ দেখছিনে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'না, না, অসিতবাবু, আনন্দের কারণ আছে বইকি, তিনমাসের মধ্যে এত উন্নতি এ ব্যাঙ্কে আর কারো হয়নি।'

অসিত বলল, 'উন্নতির কী দেখলেন। চেয়ার টেবিলটার একটু হাল ফিরেছে এই যা। আসলে বিশেষ কিছু বদল হয়নি।'

চীফ এ্যাকাউন্ট্যান্ট শ্রীপতি ভটচায মোটা-সোটা প্রৌঢ় বয়সের ভদ্রলোক। তিনি তাঁর চেয়ার থেকে চশমার ওপর দিয়ে তাকালেন অসিতের দিকে, 'হবে মশাই, হবে। দুটো দিন সবুর করুন, কেবল ওপরের রঙ চঙ না, ভিতরের শাঁস জলও হাতে পাবেন। এ জায়গায় কেবল খোসা দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হয় না, যে পায় সে সবই পায়। যোগ্যতা যখন আছে, ভয় কি আপনার।'

শ্রীপতিবাবুর কথাটা ভারি ভালো লাগল অসিতের। তিনি অনেক দিনের পুরোন কর্মচারী। ব্যাঙ্কের একেবারে গোড়া থেকে আছেন। মাত্র চল্লিশ টাকা মাইনেয় ছিলেন অফিসে। এখন শ চারেক টাকা পাচ্ছেন। কর্তৃপক্ষের বিশেষ আস্থাভাজন ব্যক্তি। তাঁর মুখে নিজের যোগ্যতার কথাটা শুনে অসিত খুসি হোল। সত্যি, তার যা যোগ্যতা তাতে একশ কুড়ি টাকার চেয়ে বেশি মাইনে পাওয়ার অধিকার তার আছে। সেই তুলনায় দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক অনেক কমই দিচ্ছে তাকে। ব্যাঙ্কের কেরানীকুল যত ঈর্ষাকাতরই হয় হোক, আড়ালে আবডালে যতই চোখ চাওয়া চাওয়ি আর গা টোপাটেপি করুক তাতে কিছু এসে যায় না অসিতের। সে তো অন্যায় ভাবে কোন সুযোগ নেয়নি।

ব্যাঙ্কের ছ'তলায় টিফিন রুম। টিফিনের অর্ধেক খরচ ব্যাঙ্ক বহন করে। কর্মচারীরা প্রত্যেকে দু'টাকা দেয়। ব্যাঙ্ক বাদ বাকি টাকাটা পূরণ করে। এ বদান্যতা নেহাৎ কম নয়। কারণ দু'টাকার টিকিটে রোজ চারখানা করে লুচি মেলে। দালদায় ভাজা হলেও, আর সে লুচির আকার স্থূল বাতাসার মত হলেও, এটা যে ব্যাঙ্কের বদান্যতা স্বীকার করতেই হয়। শুধু লুচি নয়, সেই সঙ্গে একখণ্ড করে মাছেরও ব্যবস্থা থাকে। এ ছাড়া মাসে দুদিন ডিম, দুদিন মাংস হয়। এসব সত্ত্বেও চুরির অভিযোগ শোনা যায়। ঠাকুর চাকর চুরি করে এবং তাদের যিনি চালান তিনিও অপবাদ থেকে মুক্ত থাকেন না। ব্যাঙ্কের এক একজন কর্মচারীর ওপর এসব ব্যবস্থার ভার পড়ে। কিন্তু ঝামেলা আর বিরূপ সমালোচনার ভয়ে এ দায়িত্ব কেউ নিতে চান না। মাস

কয়েক যাবৎ লোন ডিপার্টমেণ্টের সুরেশ তালুকদারের ওপরই ভারটা রয়ে গেছে।

প্রথম মাসখানেক অসিত এই টিফিন কার্ড করেনি। চা-টা বাইরে থেকেই খেয়ে আসত। সহকর্মী শ্যামল সরকার একদিন বলল, 'ওকি করছ। ওতে খরচ যে আরো বেশি পড়ে যাবে। কার্ড করে নাও, কার্ড করে নাও।'

অসিত বলেছিল, 'কিন্তু রোজ রোজ ওই দালদার লুচি—'

শ্যামল জবাব দিয়েছিল, 'দালদার হোক নারকেল তেল হোক ক্ষিদের সময় তবু তো কিছু পেটে ঢোকে। তাই বা আসে কোত্থেকে।'

অসিত হেসে বলেছিল, 'তা অবশ্য ঠিক।'

দ্বিতীয় মাস থেকে অসিত কার্ড করে নিয়েছে। কিন্তু লোকের ভিড় যখন বেশি থাকে অসিত তখন খেতে যায় না বরং সবাই চলে আসবার পরে সে গিয়ে টিফিনরুমে ঢোকে। তখন ঘরে দু'চারজনের বেশি লোক থাকে না। ঠাকুর ব্রজবিলাস সহানুভূতি জানিয়ে বলে, 'রোজ এত দেরি করে আসেন বাবু, সব যে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।'

আজও অসিত হাতের কাজ সেরে সবাইর শেষে টিফিনরুমে ঢুকতে যাচ্ছে, হঠাৎ ভিতর থেকে নিজের নাম কানে আসায় দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকে নিয়ে দুজন সহকর্মীর আলাপ চলছে। একজনের গলা চিনতে পারল অসিত, সেই বিষ্ণুবাবু, ব্যাঙ্কে এসে প্রথম দিন যার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দ্বিতীয় লোকটির সঙ্গে অসিতের এখনো পরিচয় হয়নি। বোধ হয় অন্য কোন ব্রাঞ্চ থেকে বদলী হয়ে এসেছে।

'কি নাম বললেন বিষ্ণুবাবু, অসিত চন্দ ?'

'হ্যাঁ, মশাই হ্যাঁ। এ নাম আজকাল ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটি বেয়ারা থেকে অফিসারের মুখে মুখে ফিরছে আর এঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই ? কেবল দিল্লী লক্ষ্ণৌ করে বেড়াচ্ছেন ?'

'তাই তো দেখছি। তাহলে আলাপটা এবার করে নিতে হয়। কিন্তু ব্যাপার কী বলুন তো ? ভদ্রলোকের হঠাৎ এমন ভাগ্যোদয় হোল কী ক'রে ?'

'ভাগ্যোদয় কি সাধে হয় প্রমোদবাবু? সবই যোগাযোগের ব্যাপার। আমি চেয়ারম্যানের ড্রাইভারের কাছে সব শুনেছি।'

'কী শুনেছেন বলুন না।'

'না মশাই বড়ঘরের কথা, ও সব আলোচনায় আমাদের কাজ কি। এ সব জায়গায় দেয়ালেরও কান থাকে প্রমোদবাবু।'

'আহা বলুনই না ব্যাপারটা। কে আর বলতে যাচ্ছে। চেনেন তো আমাকে। আমি অত মুখ পাতলা মানুষ নই। আমার কাছ থেকে কেউ কোন কথা জানতে পারবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

সহকর্মী বন্ধুর সাগ্রহ অনুরোধ এড়াতে পারলেন না বিষ্ণুবাবু, তাছাড়া মুখরোচক বিষয়টি তাঁরও একেবারে ঠোঁটের আগায় এসে রয়েছে। গলা নামিয়ে বললেন, 'ছোকরার মার সঙ্গে নাকি আমাদের চেয়ারম্যানের আগে বেশ মাখামাখি ছিল। আবার এদিকে চেয়ারম্যানের মেয়ের নাকি নজর পড়েছে ওর ওপর। খানাপিনা পর্যন্ত দেওয়া হয়ে গেছে এর মধ্যে। এক রক্ষা কবচের চোটেই অস্থির, আর এ একেবারে ডবল রক্ষা কবচ। উন্নতি অসিত চন্দের হবে না, হবে কি আপনার আমার।'

'যা বলেছেন। তাহ'লে আমাদের জেনারেল ম্যানেজারের আসন নড়ে উঠেছে বলুন।'

'তা জানিনে। তবে ও ছেলে সহজ পাত্র নয়। স্ুঁচ হয়ে ঢুকছে, ফাল হয়ে বেরোবে। তা আমি প্রথম দিনই দেখে বুঝতে পেরেছি।'

শুনতে শুনতে দুই কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল অসিতের। খাওয়ার আর প্রবৃত্তি রইল না, ইচ্ছা করল না টিফিন ঘরে ঢুকতে। ফিরে গিয়ে লিফটের সামনে দাঁড়াল।

নিজের টেবিলে ফিরে এসেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাজে মন দিতে পারল না অসিত। ভিতরে একটা অদ্ভুত অস্বস্তির জ্বালা বোধ করতে লাগল। ছি ছি ছি, সুরপতিবাবুর পরিবারের সঙ্গে তাদের সহজ মেলা মেশায় যে এমন কদর্থ হবে তা সে ধারণা করতে পারেনি। ড্রাইভারের কি এত সাহস

হয়েছে যে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে এমন কুৎসা রটাবে? না কি তার কাছ থেকে পাওয়া তিলকে বিষ্ণুবাবুই তাল করে তুলেছেন। অসিত অনুমান করতে পারল এ আলোচনা শুধু বিষ্ণুবাবু আর প্রমোদবাবুর মধ্যেই আটকে থাকবে না। ব্যাঙ্কের সমস্ত ডিপার্টমেণ্টেই ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়বে। তার আড়ালে আবডালে সবাই এই নিয়ে হাসাহাসি করবে। কারো কাছে সম্মান সম্ভ্রম তার আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না। এ ব্যাঙ্কের চাকরি তাকে ছেড়ে দিতেই হবে। অন্য কোথাও কাজ যোগাড় করে নেবে অসিত। এখানে থেকে সকলের কুৎসা অপবাদের লক্ষ্যস্থল হয়ে মর্যাদা হারাবে না।

টিফিন রুমের চাকর হরিপদ খাবার প্লেট হাতে সামনে এসে দাঁড়াল। অস্ফুট স্বরে ডাকল, 'বাবু'।

অসিত চমকে উঠল, 'কী?'

তারপর খাবারের প্লেট দেখে অসিতের হঠাৎ মেজাজ বিগড়ে গেল। হরিপদ ধমকে উঠে বলল, 'এসব তোমাকে আনতে বলেছে কে।'

হরিপদ বলল, 'আজ্ঞে, বাবু, ঠাকুরই বলে দিল আমাকে। কাজের চাপে বাবু ওপরে আসবার সময় পাচ্ছে না। খাবারটা তুইই দিয়ে আয়। খেয়ে নিন বাবু, জিনিস নষ্ট করে লাভ কি। ক্ষিদেও তো পেয়েছে।'

হরিপদের সহানুভূতি অসিতকে এবার স্পর্শ করল। খানিক আগের রূঢ়তার জন্যে ভারি লজ্জিত হোল অসিত। চৌদ্দ পনের বছরের ছেলে। কালো রোগাটে চেহারা, দেখলে মায়া হয়। যে বয়সে পড়াশুনো করার কথা সেই বয়সে পেটের দায়ে চাকরিতে নেমেছে। ছিঃ, ওকে কেন ধমকাতে গেল অসিত। ওর কী দোষ। হরিপদকে ডেকে অসিত এবার স্নেহ কোমল স্বরে বলল, 'তুই খেয়ে নিয়েছিস তো?'

হরিপদ লজ্জিত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, বাবু। ঠাকুর বলল, তা আপনার আর ওপরে যেতে হবে না বাবু, আমি রোজ এখানে আপনার খাবার দিয়ে যাব।'

অসিত ঘাড় নেড়ে বলল, 'আচ্ছা'।

খেতে খেতে মনের অবস্থা বদলে গেল অসিতের। ওসব মিথ্যা নিন্দা কুৎসায় তার বিচলিত হবার কী আছে। সে কেন পালাবে। বরং সমস্ত প্রতিকূলতা আর বিরূপতার সামনে দাঁড়াবে অসিত। সকলের কাছে প্রমাণ করবে নিজের যোগ্যতার জোরেই সে বড় হয়েছে। কাপুরুষের মত পালিয়ে গিয়ে সব অপবাদ সে কিছুতেই স্বীকার করে নেবে না। বরং সুযোগ সুবিধা মত বিষ্ণুবাবুকে দু'চার কথা শুনিয়ে ছাড়বে।

দিন তিনেকবাদে ছুটির পর অফিস থেকে বেরোচ্ছে অসিত, শুনতে পেল পিছন থেকে কে তার নাম ধরে ডাকছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল শ্যামল। এক সময়ে কলেজের সহপাঠী ছিল। সহকর্মী হিসাবে এতদিন বাদে ফের দুজনের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে।

শ্যামল বলল, 'সপ্তাখানেকের জন্য ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে সুখবরটি শুনতে পেলাম। তোমার কিন্তু নিজে থেকেই খবরটা দেওয়া উচিত ছিল অসিত।'

অসিত বলল 'বারে, তোমার সঙ্গে আমার তো এই মাত্র দেখা হোল। খবর দেওয়ার সময় পেলাম কই। তাছাড়া এমন সুখবর নয় যে যেচে গিয়ে দিয়ে আসতে পারি।'

শ্যামল বলল 'বাঃ অফিসে মাইনে বাড়ল, মর্যাদা বাড়ল, চাকরী জীবনে এও যদি সুখবর না হয় তাহালে সুখবর কাকে বলে শুনি। ওসব কথায় ভুলছিনে। কী খাওয়াবে বল। কোন্ রেষ্টুরেণ্টে নিয়ে যাবে ঠিক করে ফেল।'

অসিত শ্যামলের মুখের দিক তাকাল। কলেজে পড়বার সময় ও একটু মুখচোরা ছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখত। কারো সঙ্গে তেমন মিশতো না। প্রফেসার তো ভালো, স্বল্পপরিচিত কোন সহপাঠীরও মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারত না। তার বন্ধুচক্রের সদস্যদের সংখ্যা দুই বা তিনের বেশি ছিল না। আর তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল অসিত।

চাকরীতে ঢুকে শ্যামলের স্বভাবের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে অসিত লক্ষ্য করলো। আগের মত ততখানি মুখচোরা স্বভাব আর নেই।

শ্যামলের কথার জবাবে অসিত বলল, 'রেষ্টুরেণ্টে ঢুকবার মত পয়সা পকেটে নেই। তবে তুমি যদি দয়া করে আমার বাসায় আস এক কাপ চা জুটতেও পারে।'

বাসায় যাওয়ার কথায় একটু সংকোচ বোধ করল শ্যামল, বলল্ 'না না সে বরং আর একদিন যাওয়া যাবে। আজ থাক।'

অসিত বলল 'থাকবে কেন চল। আমার মা আর বোনেরা সবাই তোমার নাম শুনেছে। এবার সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয়টা হোয়ে যাক।'

শ্যামল এ কথায় আরও কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল 'না অসিত আজ আমার অন্য কাজ আছে। আর একদিন বরং যাবো।'

কিন্তু অসিত কিছুতেই ছাড়ল না। শিয়ালদায় এসে প্রায় জোর করেই বন্ধুকে বেলেঘাটার বাসে টেনে তুলল।

বাসায় এসে শ্যামল অরুন্ধতীকে ডেকে বলল, 'মা, আজ শ্যামলকে নিয়ে এসেছি। আমার সেই কলেজী আমলের বন্ধু, মনে আছে তো।'

অরুন্ধতী কথাটার সরাসরি জবাব এড়িয়ে গিয়ে বললেন 'এসো বাবা এসো।'

বড় ঘরের আধখানা জুড়ে তক্তপোষ পাতা। তার ওপর সতরঞ্চি বিছানো। সেখানেই বসবার ব্যবস্থা হোলো। অসিত ছোট বোনকে ডেকে বলল, 'নীলা, এদিকে আয়। শ্যামলকে এক কাপ চা করে দে। কিছুতেই আসতে চায় না। শেষে এক কাপ চায়ের লোভ দেখিয়ে এ পর্যন্ত টেনে এনেছি।'

অরুন্ধতী হেসে বললেন, 'ওর কথাই ওইরকম, বাবা তুমি কিছু মনে কোর না।'

নীলা অসিতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা এত ভালো চা খাইনে, দাদা, যে কাউকে তার লোভ দেখানো যায়।'

অসিত শ্যামলের সঙ্গে নীলার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার ছোট বোন। কিন্তু সব সময় ওর কাছ থেকে নিন্দামন্দ না হয় উপদেশনির্দেশ শুনতে হয় আমাকে। স্কুল মাষ্টারী ক'রে ক'রে ও অভ্যাস ওর মজ্জাগত হয়ে গেছে। আর শ্যামল সরকারের নাম তো তোরা জানিসই। আগে কবি হিসাবে খ্যাতি ছিল এখন দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের সুদক্ষ পাসিং অফিসার।'

শ্যামল নমস্কার জানিয়ে অপ্রতিভভাবে বলল, 'অসিত বাড়াবাড়ি করতে ভালোবাসে।'

নীলা স্মিত মুখে হাত তুলে নমস্কার জানাল। কোন জবাব দিল না। এই সৌম্য দর্শন লজ্জানম্র যুবকটির সামনে সে যেন হঠাৎ বড় সংকোচ বোধ করছে। তার সেই স্বাভাবিক প্রগলভতা কোথায় যে লুকিয়েছে তার যেন আর কোন সন্ধান মিলছে না।

শ্যামল নীলার দিকে একটুকাল তাকিয়েই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল। নিজের মুগ্ধতা সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠেছে। পাছে আর কারো চোখে ধরা পড়ে এই তার ভয়।

নীলা বলল, 'আমি যাই দাদা।'

অসিত ঘাড় নাড়ল।

পাশের ঘরে উমা এতক্ষণ শ্রীমদভাগবতে মগ্ন ছিল হঠাৎ কী একটা কথা মনে পড়ায় উঠে এসে দোরের পাশে দাঁড়াল। ঘরের ভিতর থেকে তার খানিকটা দেখা যায়, পুরোপুরিটা চোখে পড়ে না। একটুকাল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে উমা মৃদু স্বরে ডাকল, 'দাদা'।

অসিত শ্যামলের সঙ্গে অফিসের কথা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। একটু চমকে উঠে বলল, 'কে? ও উমা? কী ব্যাপার, আয় ঘরে আয়।'

উমা সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকল না। আগের মত আড়াল থেকেই বলল, 'আমার পোষ্টকার্ড খানা এনেছ?'

অসিত বলল, 'না রে আজও ভুলে গেছি।'

আর কোন কথা না বলে উমা চলে যাচ্ছিল অসিত তাকে আবার

ডাকল, 'যাচ্ছিস যে। আয় ভিতরে আয়। শ্যামলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

যেন পরম অনিচ্ছায় উমা এসে ভিতরে ঢুকল।

সংক্ষেপে দুজনের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর শ্যামল আর উমা নমস্কার বিনিময় করল। মুহূর্তের জন্যে শ্যামল যেন পলক ফেলতে ভুলে গেল। এমন রূপ সাধারণতঃ চোখে পড়ে না। বিনা প্রসাধনে বিনা আভরণে এ রূপ চোখকে ধাঁধিয়ে দেয়। সরু চুলপেড়ে একখানা ধুতি উমার পরণে। ব্লাউজের সাদা হাতা অনেকখানি নেমে এসেছে, গলায় সরু চিক চিকে একগাছি হার ছাড়া আর কোন আভরণ নেই। প্রখর রূপকে বরং ঔদাসীন্যের আবরণেই ঢাকবার চেষ্টা আছে। কিন্তু তবু তা ঢাকা পড়েনি, বরং কিসের এক ধরণের অতৃপ্তি আর ক্ষোভ ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে। উমার এই রূপের সঙ্গে সেই ক্ষুব্ধতার যেন তেমন সামঞ্জস্য নেই। ওর কৌতূহলী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটু অস্বস্তি বোধ করল শ্যামল। তাড়াতাড়ি বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন বসুন।'

উমা মৃদু হেসে বলল, 'না, না আপনারা কথা বলুন, আমার একটু কাজ আছে।'

অসিত বলিল, 'কাজের মধ্যে তো কতকগুলো সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করা। তার সময় পরে অনেক পাবি। এখন একটু রান্না ঘরে যা তো। চা টা হোলো কিনা দেখ গিয়ে।'

উমা হেসে বলল, 'সে সব দেখবার জন্যে আরো অনেক লোক আছে দাদা, তার জন্যে ভাবনা কি।'

বলে উমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ঠিক নিজের ঘরের দিকে গেল না। রান্না ঘরে যেখানে অরুন্ধতী আর নীলা বসে খাবার তৈরী করছিল, তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

নীলা বলল, 'এই যে দিদি। তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে। যাও এবার খাবারের প্লেট দু'খানা ওঁদের দিয়ে এসো।'

উমা হেসে বলল, 'এত কষ্ট ক'রে খাবার তৈরী করতে পারলি আর হাতে ক'রে দিয়ে আসতে পারবি নে? নীলা আজ হঠাৎ কী রকম লজ্জাবতী হয়েছে দেখছ মা?'

অরুন্ধতী বললেন, 'দেখেছি। তোরা দুই বোনে তর্ক কর, আর ওরা অফিস থেকে এসে শুকনো মুখে বসে থাকুক। তোদের জ্বালায় আর পারিনে বাপু।'

নীলার দিকে একবার তাকিয়ে খাবারের প্লেট আর জলের গ্লাস, অসিত আর শ্যামলকে দিয়ে এল উমা। দু'বার ক'রে যেতে হোল তাকে। তারপর ফিরে এসে বলল, 'চা বোধ হয় তুইই দিয়ে আসতে পারবি নীলা চা দিতে তো আর লজ্জা নেই।'

নীলা বলল, 'না লজ্জা কিসের, আমার চা দিতেও লজ্জা নেই, খাবার দিতেও লজ্জা করত না, কিন্তু সবই যদি আমি গিয়ে গিয়ে দিয়ে আসতাম তাহলে আরেকজনের মুখের দিকে কি আর তাকান যেত?'

আচমকা খোঁচা খেয়ে রাগে গুম হয়ে রইল উমা, আর সেই সুযোগে দু'হাতে চায়ের কাপ তুলে নিয়ে নীলা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

উমাকে খোঁচা দিলে হবে কি, নীলার লজ্জা করছিল ঠিকই। শ্যামলের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতেই সে চোখ নামিয়ে নিয়েছে, দ্বিতীয়বার আর তাকাতে পারেনি। চোখে চোখে কতদিন সুধীরও তো তাকিয়েছে কিন্তু সে চাহনির একটিমাত্র পরিষ্কার অর্থ, তাতে রাখা-ঢাকা কিছু থাকত না। শ্যামলের এই লজ্জানম্র দৃষ্টির সাথে আরও কিসের যেন একটু ব্যঞ্জনা মিশে আছে।

শ্যামলের কবিতা নিয়ে তিন ভাই বোনের মধ্যে অনেকদিন আলোচনা হয়েছে। ওর কবিতা পড়ে ওর চেহারা সম্বন্ধে নীলার যে ধারণা হয়েছিল আজ দেখল সে চেহারার সাথে এ চেহারার মিল নেই। কালো কোঁকড়ান একমাথা চুল, টানা নাক চোখ, আশ্চর্য ফর্সা রং, কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে কেমন যেন একটা রোদে পোড়া রুক্ষ ভাব। প্রথম দর্শনে সবটুকু ধরতে

পারেনি বরং ধরা দিতে হয়েছে। ওর সামনে দাঁড়িয়ে নীলার মনে হয়েছিল শুধু একটি কৌণিক দৃষ্টি চালিয়ে শ্যামল বুঝি সব দেখে নিল।

ঘরে ঢুকে নীলা দেখল পরোটা খেতে খেতে দুই বন্ধু অফিসের আলোচনায় মত্ত হয়ে উঠেছে। তক্তপোষের ওপর চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে নীলা বলল, 'দাদা, চা—'

দু'জনে হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ টেনে নিল। সামান্য একটু চুমুক দিয়ে শ্যামল বলল, 'বাঃ চমৎকার চা হয়েছে তো, অথচ শুনেছিলাম এ বাড়িতে নাকি ভাল চা আসে না, গুণটা তাহলে চায়ের না, হাতের।'

নীলা হেসে বলল, 'হাতেরও নয়, গুণটা মুখের। একটু আগে বাড়িয়ে বলার জন্যে দাদাকে দোষ দিচ্ছিলেন, কিন্তু বাড়াবাড়িতে আপনারা কেউই কম যান না।'

শ্যামল হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না।

অসিত বলল, 'নীলার সঙ্গে কথায় পেরে উঠবে না শ্যামল। তার চেয়ে হার মানাই ভাল, তবে দুঃখ এই প্রথম দিনে প্রথম কথায়ই তুমি হেরে গেলে।' তারপর নীলার দিকে আড়চোখে চেয়ে বলল, 'অবশ্য জায়গা হিসেবে হার মেনে সুখ আছে।'

নীলা একটু আরক্ত হয়ে উঠল। দাদার মুখে কিছু আটকায় না। চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু অসিত বাধা দিয়ে বলল, 'যাসনে, দাঁড়া। অতিথি অভ্যাগত বাসায় এলে কি ওরকম পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালে চলে, বোস ওখানে, আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেলে প্লেট কাপ নিয়ে যাবি, সুপুরি হরতকি যার যা লাগে এনে দিবি, এসব বলে দিতে হবে কেন, ভদ্রতা-টদ্রতাগুলো একটু শেখ দেখি?

নীলা বুঝতে পারল ওর আড়ষ্টতার ষোল আনা সুযোগ নিচ্ছে অসিত। এখন না, আগে শ্যামল চলে যাক তারপর এর মজা দেখাবে। নীলা ফিরে দাঁড়াল কিন্তু বসল না। শ্যামল বলল, 'ও কি আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।'

অসিত বলে উঠল, 'উঁহু, আপনি নয়, তুমি। নীলাকে তুমি অসঙ্কোচে তুমি বলতে পার শ্যামল। ও আমার দিদি নয়, বোন। অবশ্য আর কিছুক্ষণ বসে গেলে দেখবে ও এক ফাঁকে দিদি হয়ে উঠেছে।'

'আঃ তুমি কি আজ থামবে না দাদা?' নীলা চাপা গলায় ধমক দিল।

অসিত বলল, 'হ্যাঁ আমি থামি, আর তোরা শুরু কর।'

শ্যামল আর নীলা দু'জনেই এবার আরক্ত হয়ে উঠল। নীলা পালিয়ে এল ঘর থেকে।

যাওয়ার আগে অরুন্ধতী এসে দরজার সামনে দাঁড়ালেন। শ্যামল নিচু হয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, 'এবার আসি মাসিমা।'

অরুন্ধতী বললেন, 'এস বাবা মাঝে মাঝে, শহরের এক কোণে পড়ে আছি, কে বাবা এসে খোঁজ নেয়। আর খোঁজ খবর নেবে কি, সে সময় কোথায় মানুষের। আমিই বা ক'জনের খোঁজ নিতে পারি। তবু যদি তোমরা আস যাও, মেয়ে দু'টোও দু'চারটে কথা বলার লোক পায়। তা নইলে তো দু'বোনে লেগেই আছে। আমি বলি এখন কি আর তোরা ছোট আছিস, কিন্তু আমার কথা শুনলে তো! আর ঐ এক ছেলে অসিত। আর তো কোন কাজে লাগে না, পারে কেবল বোনেদের সঙ্গে ঝগড়া করতে।'

শ্যামল হেসে বলল, 'কাজে লাগবে না কেন মাসিমা। অসিত আর সে অসিত নেই, রীতিমত কাজের মানুষ হ'য়ে উঠেছে। তা নইলে তিন মাসে কেউ লিফ্‌ট পায়। আমাদের ব্যাঙ্কে ও তো রেকর্ড করে ফেলল।'

শ্যামলের কথায় একটু যেন চমকে উঠল অসিত। ওর এই আকস্মিক প্রমোশনে শ্যামলের মনেও কি ঈর্ষার ছোঁয়াচ লেগেছে, না কি এ কেবল অসিতের নিজের মনেরই দুর্বলতা। ওর শোনার ভুল, দেখার ভুল। না, শ্যামলকে অত ছোট ভাবতে কষ্ট হয় অসিতের।

ছেলের প্রশংসায় মনে মনে বুঝি খুশি হলেন অরুন্ধতী। বললেন, 'আরেকদিন এসো কিন্তু শ্যামল।'

শ্যামল বলল, 'আসব বৈকি মাসিমা। আমাদের মত বাউণ্ডলেদের অত বেশি আপ্যায়ন করবেন না, শুধু কি একা আসব, দলবল নিয়ে এসে দেখবেন হাজির হব। তখন আবার বিরক্ত হয়ে উঠবেন। ভাববেন, পাপ বিদেয় হলে বাঁচি।'

অরুন্ধতী হেসে উঠলেন, 'কথা শোন ছেলের।'

শ্যামলের পিছনে পিছনে সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল অসিত। যেতে যেতে গীতার একটি শ্লোকের স্থললিত আবৃত্তি কানে ভেসে এল শ্যামলের।

প্রজাহাতি যথা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্,
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্ট. স্থিত প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।

বাঁশীর মত মধুর কোমল কণ্ঠ। শ্যামলের বুঝতে বাকি রইল না এ স্বর কার। তবু একবার জিজ্ঞাসা করল, 'গীতা পড়ে কে অসিত?'

অসিত জবাব দিল, 'আবার কে, উমা। ও তো দিন রাত কেবল গীতা আর ভাগবত নিয়েই পড়ে আছে।'

'ওকে অন্য বই টই কিছু এনে দিতে পার না।'

অসিত বলল, 'এনে দিতে হবে কেন, বই কি বাড়িতেই কিছু কম আছে, কিন্তু পড়লে তো।'

শ্যামল জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা সুধীরবাবু মারা গেছেন কতদিন হল?'

অসিত জবাব দিল, 'তা বছর চারেক হল বই কি।'

শ্যামল বলল, 'শোকটা উমা সামলে উঠতে পারছে না আজও। বই-পত্তর নিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে থাকে ভালোই, কিন্তু কেবল ধর্মগ্রন্থ কেন, ওতো শুধু শাসন আর অনুশাসনে কড়াকড়ি। মনের ওপর তার ফলটা কি সব সময় ভাল হয় অসিত?'

অসিত বলল, 'না, তা হয় না। কিন্তু কারো মনের ওপর, মেজাজের ওপর জুলুম করতে যাওয়াও ভুল। ওকে আমি অনেকদিন অনেক করে বুঝিয়েছি, আজকাল আর কিছু বলি না। করুক ওর যা খুশি।'

শিয়ালদহে বাস থেকে নেমে শ্যামল দেখল বেশ একটু রাত হয়েছে, আকাশে ক্ষীণ এক ফালি চাঁদ। ঝিরঝিরে একটু হাওয়া দিল হঠাৎ। কেমন শীত শীত করছে, মাঘ মাস শেষ হয়ে এলো। শীত যায় বসন্ত আসে। এক ঋতু গিয়ে আরেক ঋতু আসে। কিন্তু রাজধানীর মানুষের সে হিসাব রাখার সময় কই? কাজ আর কাজ। সবাইর চোখেই তো কাজের ঠুলি বাঁধা। তবু মাঝে মাঝে ঠুলি এক সময় সবে যায়, তাকাতে ইচ্ছা করে আকাশের দিকে, চাঁদের দিকে। অনেক কাল আগের লেখা একটা কবিতার লাইন শ্যামলের মনে গুণ গুণ করে উঠল— 'এবার বসন্ত বৃথা গেল'—মনে পড়ল সেও একদিন কবিতা লিখত। কিন্তু সে খাতা অনেকদিন বুজে গেছে, তার বদলে খুলেছে দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের মজবুত চামড়ার বাঁধাই চারখানা লেজার। সবগুলির পাতায় শ্যামলকে চোখ বুলাতে হয়, স্বাক্ষর রাখতে হয়। কিন্তু কেবল বিরাট বিরাট খাতাইতো নয়, সেগুলি কোলে করে ভাঙা চোরা, নানা চেহারার যে মানুষগুলি বসে থাকে তাদের দিকে না তাকিয়েও তো পারা যায় না। এক একটি মানুষ নয়, যেন এক একটি রহস্যময় রাজত্ব। এই নিয়ে অসিতের সঙ্গে শ্যামল একদিন তর্ক করেছিল! অসিত বলেছিল, 'কি জানি আমার কাছে ত সবই সমান মনে হয়। এক ঘরে বসে এরা যে কেবল একই ধরণের কাজ করে তাই নয়, এদের ক্ষুদ্রতা সঙ্কীর্ণতা, ঈর্ষা বিদ্বেষ সব কিছুতেই এক আশ্চর্য ঐক্য দেখেছি। সে ঐক্য তুমি আর কোন সমাজে খুঁজে পাবে না শ্যামল।' শ্যামল প্রতিবাদ করেছিল। বলেছিল, ওটা তোমার একেবারে বাইরের দেখা। আরেকটু ভালো করে মিশলে দেখতে প্রত্যেকটি মানুষের সমস্যা আলাদা। আর শুধু এক একটি মানুষই বা কেন ওদের পিছনে যে একেকটি পরিবার আছে তাদের ছায়া দেখতে পাও না ওদের মধ্যে। আমি তো পাই। একেক সময়ে মনে হয় শুধু ছায়া নয়,

মানুষগুলিকে যদি দেখতে পেতাম! ওদের লেজারগুলি টেনে নিয়ে ওদের সকলের কথা লিখে রেখে যেতে পারতাম! কবিতা নয় অসিত, আমি গল্পই লিখব।' অসিত হেসে বলেছিল 'তার চেয়ে শ্যামল তুমি গল্প কবিতা লেখো তাও তোমার হাতে ভাল খুলবে।'

সারকুলার রোড ধরে সিধে হাঁটতে লাগল শ্যামল। মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা বাস একটানা হেঁকে চলেছে, মানিকতলা—শ্যামবাজার। শ্যামবাজার, শ্যামবাজার। উঠে পড়লেই হোত। বাসা তো একেবারে কাছে নয়। কিন্তু আজ যেন হেঁটে যেতেই ভাল লাগছে। ভালো লাগছে চারদিকে চোখ তুলে তাকাতে। বেশ আছে অসিত। মা আর বোনেদের নিয়ে পরিপাটি গুছানো ছোট সংসার। শ্যামল তো আজ পর্যন্ত বাসাই করে উঠতে পারল না। বাবা মা দেশের বাড়িতেই রয়ে গেলেন। তাদের আনার জন্য শ্যামল কম চেষ্টা করেনি। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে আসতে বাবার মত হয়নি কিছুতেই। কলকাতার পাকাপাকি বাসা একটা করতে গেলেই বিয়ের প্রশ্ন ওঠে, কিন্তু সামান্য আয়ে বিয়ের বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। তাছাড়া মাইনে যা পায় তার সবটুকুও তো নিজের নয়। পিসীমা কাশীবাসী হয়েছেন, মাসের প্রথমেই তাঁকে কিছু পাঠিয়ে দিতে হয়। ভাই আছে একটি, নিজের কাছে থাকে, বঙ্গবাসীতে আই, এ, পড়ছে। ঘরণী না থাকলেও ঘর একখানা ভাড়া নিয়েছে শ্যামল, সুকিয়া স্ট্রীটে একতলায়, দু'ভাই থাকে। ওদের ব্যাঙ্কের একটা ছোকরা বেয়ারা এসে দু'বেলা রান্না করে দিয়ে যায়, শোয় অন্যত্র। এতক্ষণে ভাইয়ের কথা মনে পড়ল শ্যামলের। পড়াশুনো হয়ে গেলে ও শ্যামলের অপেক্ষায় বসে থাকবে। শ্যামল বাসায় না ফেরা পর্যন্ত বিমল খেতে বসবে না। তা সে যত রাতই হোক।

কিন্তু বাসায় পৌঁছে শ্যামল দেখল বিমল একা নয়, কার সঙ্গে যেন গল্প করছে। আর একটু কাছে যেতেই লোকটিকে শ্যামল চিনতে পারল। অফিসের বিষ্ণুবাবু। বিষ্ণুবাবুর বাসা বেশি দূরে নয়। ছুটি ছাটার

দিনে আসেন মাঝে মাঝে, এসে গল্প-গুজব করে যান কিছুক্ষণ। আজ তাঁকে এ সময় দেখে শ্যামল একটু অবাক হল।

শ্যামলকে দেখে বিষ্ণুবাবু বললেন, 'এসো ভাই এসো। তোমার জন্যেই বসে আছি।'

শ্যামল বলল, 'কি ব্যাপার বলুন তো?'

বিষ্ণুবাবু বললেন, 'আর ব্যাপার! এ দিকে তো এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসে আছি।'

কাণ্ডটা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন বিষ্ণুবাবু। আজ অফিস ছুটি হওয়ার একটু আগে ম্যানেজারের ঘরে হঠাৎ বিষ্ণুবাবুর ডাক পড়ল। কলিগরা চোখ টেপাটেপি করতে লাগল, কদিন আগে অসিতবাবুর ভাগ্য ফিরেছে, আজ বুঝি বিষ্ণুবাবুরও কপাল খুলে যায়। আজকাল ম্যানেজারের ডাক মানেই তো সুডাক। কিন্তু বিষ্ণুবাবু কি সেই কপাল করে এসেছেন, না অসিতবাবুর মত চেয়ারম্যান দুহিতার মন মজানোর বয়স আছে। তাঁর একেবারে উল্টো বার্তা। প্রথমে তো ধমকের পর ধমক। ম্যানেজারের কাছে যত তোতলাতে থাকেন বিষ্ণুবাবু, তত ধমক খেতে হয়। ধমকের ঝড় একটু থামলে বিষয়টা তিনি বুঝতে পারলেন। ব্যাঙ্কের বড় তোয়াজের পার্টি জগবন্ধু দাসের চেক ডিসঅনার হয়ে ফেরৎ গেছে। তার মূলে আছে বিষ্ণুবাবুর অন্যমনস্কতা। আর চেক ফেরৎ যাওয়া মানেই তো পাওনাদারের কাছে পার্টিকে বেইজ্জত করা। জগবন্ধু ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে আচ্ছা করে ম্যানেজারকে ধমকে দিয়েছে আর সেই ধমক হাজার গুণ হয়ে বিষ্ণুবাবুর কাছে এসে পৌঁছেছে। ম্যানেজার অবনী মোহন শেষ কথা বলে দিয়েছে, এর ফাইন্যাল ডিসিশন হবে কাল সকালে, চেয়ারম্যানের ঘরে। বিষ্ণুবাবুর চাকরি তো যায় যায়।

সব শুনে শ্যামল বলল, 'কিন্তু আমি এর কী করতে পারি বলুন।'

বিষ্ণুবাবু ম্লানমুখে বললেন, 'না তোমরা আর কী করবে। আমার

ভাগ্যে যা আছে তা হবেই, তা কেউ রুখতে পারবেনা। তবু দেখ একবার বলে কয়ে এ যাত্রা যদি ঠেকাতে পার।'

শ্যামলবাবু একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি জানি, কেন যে আপনাদের এত ভুল হয়।'

বিষ্ণুবাবু লজ্জিত হয়ে একটুকাল চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন 'সেভিংস ডিপার্টমেণ্টে ছিলাম, বেশ ছিলাম। আবার ঠেলে দিল কারেণ্ট লেজারে। কাজের চাপ তো যত ঐখানে। এখন কি আর সেই বয়স আছে শ্যামল, না চোখের সেই জোর আছে। এ সব ঐ বেটা অবনীর চক্রান্ত। কেবল চবকির মত এ ডিপার্টমেণ্ট সে ডিপার্টমেণ্ট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে।' বিষ্ণুবাবু আরেকটু এগিয়ে এলেন শ্যামলের কাছে। যেন ভারি একটা গোপনীয় বিষয়ের পরামর্শ করছেন তার সাথে। তারপর বললেন, 'আমি বলি শ্যামল, তুমি অসিতকে একটু ধর। ও বললে ম্যানেজার ওর কথা ফেলতে পারবে না। আর আমরা যে যাই বলিনা কেন অসিত আসলে খাঁটি ছেলে। দু'কথা বেশ গুছিয়েও বলতে পারবে।'

শ্যামলের মুখে সামান্য একটু হাসির আভাস ফুটে উঠল, পথে যেতে যেতে অসিত সবই ওর কাছে বলেছে। হঠাৎ মাইনে বাড়া নিয়ে তাকে যারা যারা কুৎসিত ইঙ্গিত করতে ছাড়েনি বিষ্ণুবাবু তাদের একজন, অথচ এখন এই বিপদের সময় তার ওপরই সবটুকু নির্ভর করতে বিষ্ণুবাবুর লজ্জা করছে না। আশ্চর্য এদের মনের গড়ন, অদ্ভুত এদের ভয়। অবশ্য ভয় পাওয়ারই কথা। বিষ্ণুবাবুর চাকরি গেলে তাঁর মত লোকের এ বাজারে ফের চাকরি জোটানো সহজ নয়। বিষ্ণুবাবু তো একা নন, তাঁর ভাগ্যের সাথে আরও চার পাঁচটি প্রাণীর ভাগ্যের সুতো বাঁধা। ওর মুখে শ্যামল যেন তাদের মুখেরও ছায়া দেখতে পেল। শ্যামল জানে অসিতকে কেন কাউকে বলেই কোন লাভ হবে না। এমন কি অবনী পর্যন্ত সরে দাঁড়াবে, যা করবার করবেন চেয়ারম্যান সুরপতি। সুরপতিকেও কি চিনতে বাকি আছে শ্যামলের? তিনি কোনদিক দেখবেন না, বিষ্ণুবাবুর দিকে

চোখ তুলে তাকাবেন না পর্যন্ত, তাকাবেন শুধু ব্যাঙ্কের সুনামের দিকে। সুরপতি সব সইতে পারেন। কিন্তু ব্যাঙ্কের সামান্যতম বদনামও তিনি সহ্য করতে পারেন না। তাঁর মতে আসলে ব্যাঙ্ক মানে তার গুড্ উইল, তার সুনাম। এই সুনাম তিনি তিলে তিলে অর্জন করেছেন। কারো অবহেলায়, অনবধানতায় তা তিনি খোয়াতে পারবেন না। এ ব্যাঙ্কে নিষ্ঠা যোগ্যতার পুরস্কার যেমন আছে, তেমনি অমনোযোগীর ক্ষমা নেই। প্রত্যেকটি লোককে কাজে নেয়ার সময় একথা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। হয় নিজে নয়ত অবনীর মারফতে জানিয়ে দিয়েছেন এ ব্যাঙ্কের সাথে তাঁর রক্তের সম্পর্ক। কিন্তু রক্তের সম্পর্ক শুধু কি তাঁরই, যারা গায়ের রক্ত জল করে খাটছে তাদের নয়?

পরদিন সুরপতির বিচারে একবারে চাকরি গেল না বিষ্ণুবাবুর। তাঁকে শুধু তিনমাসের জন্য সাসপেণ্ড করা হল। এ ঘটনা নতুন নয়, দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে আরও দু' একবার এমন ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সেদিন থেকে আরেকটি নতুন জিনিষের সূত্রপাত হ'ল। দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের টিফিন রুমে দালদায় ভাজা লুচি চিবুতে চিবুতে নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ভূপতিবাবুও বললেন, 'না না এ বড় অন্যায়, এর একটা প্রতিকার হওয়াই দরকার, বিষ্ণুবাবু ভুল করেছেন ঠিকই, কিন্তু সে এমন কিছু মারাত্মক ভুল নয়। তার জন্যে একেবারে তিন মাসের সাসপেনসন? এ জুলুম ছাড়া কি?'

শ্যামল বলল, 'কিন্তু প্রতিবাদ করব বললেই তো করা যায় না। তার জন্যে তৈরী হওয়া চাই, sacrifice করতে পারা চাই। পারবেন করতে?'

পাশে বসে রেকর্ড কীপার মাধব বাবু চা খাচ্ছিলেন। বয়সে সবার চেয়ে না হলেও অনেকের চেয়ে বড়। লোকটি একটু রসিক প্রকৃতির। ভূপতিবাবুর হয়ে জবাবটা তিনিই দিলেন, 'কি রকমের sacrifice চাও বল তো ভায়া?'

শ্যামল বলল, 'sacrifice আজই কাউকে করতে হবে না। আপনারা

শুধু দয়া করে ছুটির পর সবাই হাজির থাকবেন। আজই আমাদের ইউনিয়ন ফর্মড হবে।'

'ইউনিয়ন?' মাধববাবু অবাক হয়ে বললেন, 'ব্যাঙ্কের আবার ইউনিয়ন কী হে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এ কি কল কারখানা পেয়েছ? আজ ইউনিয়ন করবে আর কাল যেই সে কথা চেয়ারম্যানের কানে উঠবে অমনি সব কটাকে কান ধরে ব্যাঙ্কের বাইরে বার করে দেবে, ফের নতুন লোক এনে বসাবে। আমি বাপু ওসবের মধ্যে নেই।'

শ্যামল অসহিষ্ণুভাবে জবাব দিল, 'আপনি ছাড়াও আরো অনেক লোক আছে। আমরা কাউকে মতের বিরুদ্ধে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আসতে বলিনে।'

মাধববাবু বললেন, 'তা আর থাকবে না কেন। তুমি আছ, আমাদের তিন নম্বর লেজারের সুরেশ আছে। তোমাদের কি। মাগ-ছেলে তো নেই। নির্বিকার সাংখ্যের পুরুষ তোমরা। তোমাদের চাকরি থাকল আর গেল বয়ে গেল। একটা পেট টিউশনি করেও চালিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু—'।

ভূপতিবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'আহা হা আপনি অত চটে যাচ্ছেন কেন মাধববাবু। ইউনিয়ন করলেই যে রোজ কুঁদে চেয়ারম্যানকে মারতে যেতে হবে তার কি মানে আছে। আমরা অন্ততঃ আমাদের সুবিধা অসুবিধাগুলো তো কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারব।'

'জানিয়েই বা লাভ কী হবে?' মাধব বাবু প্রশ্ন করলেন, 'আর কর্তৃপক্ষ, কর্তৃপক্ষ করে চেঁচাচ্ছেন, পক্ষ তো আসলে একটি, স্বয়ং সুরপতি। তার কাছে কাঁদুনি গেয়ে কোনদিন কিছু হয়নি, আজও হবে না। বেশ তো করতে হয় করুন, কিন্তু আমি ও সবের মধ্যে যেতে পারব না।'

শুধু মাধব বাবুই নয়, আরও কয়েকজন বাদ পড়লেন, ইচ্ছে করেই দূরে সরে রইলেন। কিন্তু যারা রাজি হল দেখা গেল তাদের দলই ভারি হয়ে উঠেছে। সমস্ত ব্যাঙ্কময় চাপা একটা উত্তেজনা। সুরপতির মত

জাঁদরেল চেয়ারম্যানের সাথে লড়বার জন্য ভারি এক হাতিয়ার যেন এদের হাতে এসে যাচ্ছে। কাজকর্মের ফাঁকে কেবল সেই আলোচনা, সেই ফিসফিসানি।

সাদা এক সিট কাগজের মাথায় মিটিংয়ের নোটিশ টাইপ করান হ'ল। তারপর শ্যামল গিয়ে সকলের কাছে ঘুরে ঘুরে তাতে সই আনল। কয়েকটা চিঠির ড্রাফট নিয়ে ব্যস্ত ছিল অসিত। ব্যাঙ্কের জরুরী কাজে অবনীকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যেতে হয়েছে। কিন্তু যাওয়ার আগে তার ঘাড়ে নিজের কাজও কিছু চাপিয়ে দিতে ভোলেনি। অসিতের সামনে শ্যামল নোটিশের কাগজখানা মেলে ধরল।

অসিত জিজ্ঞাসা করল, 'বিষয়টা কি ?'

মৃদু হেসে শ্যামল বলল, 'পড়ে দেখ।'

অসিত পড়ল। কিন্তু কোন কথা বলার আগেই অবনীর বেয়ারা এসে খবর দিল।

'বাবু ফোন এসেছে।'

অসিত চোখ তুলে তাকাল, 'আমার না ম্যানেজারের? বলে দে ম্যানেজার এখন নেই, বাইরে গেছেন।'

বেয়ারা বলল, 'না বাবু আপনারই নাম ধরে ডাকছে, বলল এক্ষুণি ডেকে দিতে।' চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে অসিত উঠে দাঁড়াল।

ম্যানেজারের ঘরে এসে অসিত দেখল টেবিলের ওপর টেলিফোনের রিসিভারটা নামানো রয়েছে। সেটা তুলে নিয়ে অসিত বলল, 'হ্যালো।'

'কে অসিত বাবু ?'

'হ্যাঁ আমি অসিত চন্দ কথা বলছি।'

'আমি সুজাতা।'

'তা আপনার গলার স্বর শুনেই বুঝতে পেরেছি।'

'পেরেছেন ? আশ্চর্য। আমি ভেবেছিলাম আমাদের বাড়ির ঠিকানার মত গলার স্বরও বুঝি ভুলে গেছেন।'

'আমার স্মরণশক্তির ওপর আপনার মোটেই বিশ্বাস নেই দেখছি।

'তা না থাকলেও আপনার বাক-শক্তির ওপর আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই শক্তির কাছে আমি সাহায্য চাইছি।'

'সে শক্তি তো আপনারও কিছু কম দেখছি নে। কি ব্যপার বলুন তো?'

'সব কথা কি ফোনে বলা যায়? অফিস ছুটির পর আপনি সোজা এখানে চলে আসুন। তখন বলব'।

'আচ্ছা।'

'তাহলে এই কথা রইল। ভুলে যাবেন না তো।'

'না।'

অসিত ফোন ছেড়ে দিল। এই নেতিবাচক শব্দটির মধ্যে কথা শেষ হলেও নিজের অস্তিত্ব সে যেন নতুন করে অনুভব করল।

সুজাতা তাকে ডেকেছে, যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করেছে। এ যেন তার জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

নিজের ঘরে ফিরে এল অসিত। শ্যামল তখনো তার সামনের চেয়ারটায় বসে ছিল। অসিতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার হাসছ যে?'

অসিত অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'কই হাসছি না তো।'

শ্যামল আর কোন কথা না বলে নোটিশের কাগজ খানার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'তাহলে সই করে দাও এবার।'

অসিত আর একবার লেখাটা পড়ল। আজই ছুটির পরে ছাদের ওপর ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের এক বৈঠক ডেকেছে শ্যামল। সেখানে ইউনিয়ন গড়ে তোলা সম্বন্ধে আলোচনা হবে। ছুটির পর। কিন্তু ছুটির পরে সুজাতা যে যেতে বলেছে অসিতকে। সুজাতা বড় চমৎকার ক'রে কথা বলে। তার গলাও বেশ মিষ্টি। ফোনে সেই গলার মাধুর্য যেন আরো বেড়ে যায়।

শ্যামল বলল, 'আমি তাহলে উঠি অসিত। হাতে কাজ আছে।'

বন্ধুর কথায় অসিতের চমক ভাঙল। ছিছি এ সব কি ভাবছে সে। সহকর্মীদের স্বার্থের চেয়ে একটি মেয়ের আমন্ত্রণই তার কাছে বড় হোল।

শ্যামলকে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, 'আরে বসো বসো। কাজের লোক কখনো কাজের দোহাই পাড়ে না। কাজ তো আমারও আছে।'

সামনের চেয়াটায় বন্ধুকে বসতে বলল অসিত, তারপর একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'কবি মানুষ হয়ে এসব ইউনিয়ন টিউনিয়নের মধ্যে যাচ্ছ যে শ্যামল, ব্যাপার কি।'

শ্যামল মৃদু হাসল, 'তাই যদি বল, কবি হয়ে ব্যাঙ্কে দশটা পাঁচটা কলমপেষাটাও তো কম অদ্ভুত ব্যাপার নয়।'

শ্যামল একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বলল 'বিষ্ণু বাবুর কথা শুনেছ তো?'

অসিত সংক্ষেপে বলল, 'শুনেছি।'

শ্যামল বলল, 'কত সামান্য একটা কারণে তাঁকে সাসপেণ্ড করা হোল তাও শুনেছ বোধ হয়।'

অসিত বলল, 'সবই শুনেছি শ্যামল। ব্যাপারটা বড়ই দুঃখের'।

শ্যামল একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, 'দেখ অসিত কোন প্রতিকারের চেষ্টা না করে আমরা সবাই যদি শুধু মৌখিক দুঃখ জানিয়েই যাই তাহলে কারো পক্ষেই কোন লাভ হবে না।'

আশে পাশের টেবিল থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক অসিতের দিকে তাকালেন। প্রৌঢ় চীফ একাউন্ট্যাণ্ট শ্রীপতি ভট্টাচার্যও চশমার ওপর দিয়ে একবার চেয়ে দেখলেন। অসিত বলল, 'আচ্ছা তুমি এবার এসো। যা বলবার তা তো মিটিংয়েই বলতে পারবে।'

শ্যামল অপ্রতিভ হয়ে উঠে নিজের সীটে গিয়ে বসল।

অসিতও মনে মনে একটু লজ্জিত হোল। শ্যামলকে কড়া কথা না বললেও চলত। কিন্তু ওর কাণ্ডজ্ঞান কম। এ সব কথা কি এত লোকের মধ্যে বলতে হয়। বিষ্ণুবাবুর কথা মনে পড়ল অসিতের। ভদ্রলোক তার

পদোন্নতিতে হিংসা করেছেন। তার নামে নানা রকম কুৎসা রটনা করেছেন। সেজন্যে তাঁর ওপর মনে মনে অসিতের খুবই বিদ্বেষ এসেছিল। কিন্তু মৌখিক অপমানই তো নয়. তিনি মাস মাইনে বন্ধ রাখলে ভদ্রলোক স্ত্রীপুত্রকে খাওয়াবেন কি।

পাঁচটার পর থেকেই মিটিংএর তোড়জোড় শুরু করল শ্যামল। ছাদের ওপর ছোট টিফিন রুমেই সভার ব্যবস্থা করা হোল। খানকয়েক টুল সেখানে পাতা আছে। বেয়ারাদের বলে গোটা দুই মাদুর আনিয়ে রাখল শ্যামল। লোক যদি বেশি হয় তাদের বাইরে বসতে দেওয়া যাবে। কিন্তু সাড়ে পাঁচটা বাজল, ছটা বাজল সব শুদ্ধ জন দশেকের বেশি লোক জমল না। প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে এসেছিল শ্যামল। কিন্তু তাঁরা কেউই এলেন না। কারো অফিসের কাজে এখনো ফুরসুৎ মেলেনি। কেউ বা অফিস সেরে অন্য দরকারী কাজে বেরিয়ে পড়েছেন। চীফ এ্যাকাউন্টান্ট শ্রীপতি ভট্টাচার্যকে শ্যামল অনুরোধ করেছিল সভাপতিত্ব করবার জন্য। কিন্তু তিনি রাজী হন নি এমনকি উপস্থিতও হন নি। সবচেয়ে আশ্চর্য যাঁকে উপলক্ষ্য করে এই সভার আয়োজন সেই বিষ্ণুবাবু পর্যন্ত আসেন নি। অবস্থা দেখে নৈরাশ্যে নিরুদ্যম হয়ে পড়ল শ্যামল। অসিতকে ডেকে বলল, 'দরকার নেই আর মিটিং করে। সবাইকে চলে যেতে বল।'

অসিত একটু হেসে বলল, 'এত অল্পেই হাল ছেড়ে দিলে চলবে কি ক'রে শ্যামল। অত হতাশ হচ্ছ কেন।'

শ্যামল জবাব দিল, 'এদের সম্বন্ধে আশা কি ক'রে রাখি বল। এই দু'বছর ধ'রেই তো দেখছি। এই টিফিন রুমে বসে কত আলোচনা সমালোচনাই না এরা করে। রোজ গরম গরম বক্তৃতা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। কিন্তু আজ সবাইকে যখন একসঙ্গে ডাকা হোল তখন আর কারোর সাড়া নেই।'

অসিত বলল 'এটা শুধু এই অফিসের বৈশিষ্ট্য নয়। সব জায়গারই এই

রীতি। তবু এদের নিয়ে কাজ চালাতে হবে শ্যামল। যাঁরা এসেছেন তাঁদের নিয়েই সুরু করে দাও।'

লেজার কীপার সুরেশ রায়ও বলল, 'তাই করুন শ্যামলবাবু। আর যদি দেরী করেন যারা এসেছে তারাও চলে যাবে।'

তিন জন পরামর্শ ক'রে সভাব কাজ আরম্ভ করাই ঠিক করল। সুরেশ প্রস্তাব করেছিল অসিতবাবুই সভাপতি হোন। কিন্তু অসিত বলল এই ঘরোয়া বৈঠকে কাউকে সিংহাসনে বসাবার দরকার হবে না। সকলেই এখানে সমান আসনের অধিকারী। ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের সকলের স্বার্থ যেখানে জড়িত সেখানে এই জনবিরলতা খুবই লজ্জার তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এতে নিরাশ হলে চলবে না। প্রত্যেক সংগঠনের গোড়াকার ইতিহাস প্রায় এই একই রকম। শুরুতে তার আকার ছোট, যেমন ছোট বীজ, যেমন ছোট অঙ্কুর। কিন্তু তাই ক্রমে মহীরূহে রূপ নেয়। তাবপর ইউনিয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করল অসিত। সকলের সমবেতভাবে দাবী জানাবার এই হোল একমাত্র মাধ্যম। ব্যক্তিগতভাবে কারো ওপর অন্যায় অবিচার হলে এই ইউনিয়নই তাব প্রতিকারের চেষ্টা করতে পারে।

কে একজন পিছন থেকে অস্ফুটস্বরে বলল, 'আপনাকে আর স্কুল মস্টারী করতে হবে না মশাই। ইউনিয়নের মাহাত্ম্য আমরা জানি। এবার কি করতে চান চটপট বলুন। আমাদের আরো কাজকর্ম আছে। দুটো টিউশন সেরে তবে বাড়ি ফিরতে হবে।'

অসিত তখন বিষ্ণুবাবুর ঘটনাটা সকলকে সংক্ষেপে জানাল। আজ তাঁর ওপর যে অবিচার করা হয়েছে, কাল তা অন্য যে কোন কর্মচারীর ওপর হ'তে পারে। তাই এখন থেকে সবাইকে সতর্ক হতে হবে। এখন তাদেব বেশি কিছু করবার সাধ্য নেই। কিন্তু বেচারা বিষ্ণুবাবুর বিষয়টা যাতে কর্তৃপক্ষ ফের বিবেচনা ক'রে দেখেন ইউনিয়নের হয়ে সেই অনুরোধ অন্ততঃ তারা জানাতে পারে।

সেই পিছনের বক্তা ছেলেটি বলল, 'এর মধ্যে আবার ইউনিয়ন টিউনিয়ন টেনে আনছেন কেন। অত যদি দরদ থাকে নিজে একবার চেয়ারম্যানকে গিয়ে বলুন না। তাহলেই ভদ্রলোকের চাকরিটি থেকে যাবে।'

অসিত বলল, 'আপনার নাম কি।'

'কেন রিপোর্ট করবেন না কি ?'

'না রিপোর্ট করবার মত কিছু নেই। আপনার মত স্পষ্ট বক্তা ভবিষ্যতে ইউনিয়নের অনেক কাজে লাগবেন। সেইজন্যেই নাম ধাম জানতে চাইছি।'

শ্যামল বলল, 'ওর নাম নিরঞ্জন হালদার। লোন ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন।' তারপর নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার কাছ থেকে এমন ব্যবহার আশা করিনি নিরঞ্জনবাবু।'

নিরঞ্জন হঠাৎ একথার কোন জবাব দিল না।

অসিত বাধা দিয়ে বলল 'থাক শ্যামল থাক। আমিই ওর কথার জবাব দিচ্ছি। আপনারা যদি চান, আমি চেয়ারম্যানের কাছে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করতে পারি। কিন্তু অনুরোধটা যদি সকলের পক্ষ থেকে করা হয় তাহলেই সেটা আরো জোরালো হয়ে ওঠে।'

নিরঞ্জন বলল, 'জোরালো হবে কি ঘোরালো হবে তা জানিনে মশাই। ব্যক্তিগতভাবেই করুন আর নৈর্ব্যক্তিকভাবেই করুন কাজ হাসিল হলেই হোল।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিরঞ্জন উঠে দাঁড়াল। তার সঙ্গে আরো কয়েকজন উঠে গেল। স্থির হোল ইউনিয়ন গড়ে তোলা যখন গেলই না তখন বিষ্ণুবাবুর সম্বন্ধে বিবেচনার জন্যে একটা দরখাস্ত করা হবে। আর সেই দরখাস্তে স্বাক্ষরের জন্যে ছোট বড সব কর্মচারীকেই অসিত আর শ্যামল অনুরোধ করবে। এই অগঠিত ইউনিয়নের অস্থায়ী সম্পাদক হোল শ্যামল। অসিতের অসম্মতি সত্ত্বেও শ্যামলের আগ্রহে তার বন্ধুকেই সভাপতি করা হোল। তারপর আরো খানিকবাদে সকলেই বিদায় নিল।

শ্যামল অসিতকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল 'আমি ভারি লজ্জিত হচ্ছি অসিত।'

অসিত একটু হেসে বলল 'কেন তোমার ডাকা মিটিংয়ে লোক এল না বলে? কিন্তু কারো আসা না আসা তো তোমার হাতে নেই।'

শ্যামল বলল, 'সে কথা নয়।'

অসিত বলল, 'তবে কোন কথা।'

শ্যামল একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল।'

অসিত বলল, 'অত ভাবছ কি। বলেই ফেল না।'

শ্যামল আস্তে আস্তে বলল, 'ওদের মন বড়ই ছোট। এখানে নিরঞ্জন কেবল একজন নয়। ওরা অনেকেই তোমাকে বিশ্বাস করতে চায় না অসিত। ওদের ধারণা তুমি কর্তৃপক্ষের লোক।'

অসিত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল তারপর আহতস্বরে বলল, 'তাই যদি বুঝতে পেরে থাক আমাকে তোমাদের দলে না টানাই উচিত ছিল।'

শ্যামল বলল, 'এ তোমার রাগের কথা। ওরা খারাপ মনে করলেই তো আর তুমি খারাপ হয়ে যাচ্ছ না। একটা কিছু গড়ে তুলতে হলে কেবল যে বাইরে থেকেই আমরা বাধা পাব তাই নয় ভিতর থেকেও এমন অনেক বাধা বিঘ্ন আসবে। তার জন্য আমাদের তৈরী থাকতে হবে।'

শিয়ালদহ মোড় থেকে শ্যামল বিদায় নিল। কিছুক্ষণ আগে থেকে সুজাতায় নিমন্ত্রণের কথা অসিতের মনে পড়ছিল। কিন্তু বন্ধুকে তা জানাতে কেমন যেন একটা সংকোচও বোধ করছিল অসিত। তার মনে হচ্ছিল এই আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই শ্যামল ভাল অর্থে নেবে না। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে সে পরিহাস করবে। তার কাছে গোপন করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কিন্তু আমন্ত্রণ পেয়েছে বলেই কি যাওয়া সঙ্গত হবে অসিতের? সুজাতাদের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতার কথা শ্যামল আজ না জানুক একদিন তো টের পাবেই। তখন অসিতের সম্বন্ধে ধারণা কি আরো খারাপ হয়ে যাবে না তার? কিন্তু ধারণা খারাপ হ'লেই

তো আর অসিত খারাপ হবে না। ইউনিয়ন করবে বলে সুজাতার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয় রাখতে কোন ক্ষতি নেই। নিমন্ত্রণ করলে তা রাখতে যাওয়া শিষ্টাচার, রীতি। সেই রীতি লঙ্ঘন করবার কোন কারণ ঘটেনি।

ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে দেখল অসিত। সাতটা প্রায় বাজে। সান্ধ্য নিমন্ত্রণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এত দেরীতে যাওয়াটা কি শোভন হবে? কিন্তু সুজাতা তো ঘড়ির কাঁটায় সময়কে বেঁধে দেয় নি। ছুটির পরে যেতে বলেছে। আরো কিছুক্ষণ ইতস্তত: করে অসিত দক্ষিণগামী একটা বাসে উঠে পড়ল।

বাড়ির সামনে খান দুই গাড়ি দাঁড়িয়ে। কি ব্যাপার। কোন জন্ম-দিনটিনের অনুষ্ঠান আছে না কি। কিন্তু অসিত যে খালি হাতে এসেছে। তেমন কোন ব্যাপার থাকলে তাকে বড়ই অপ্রস্তুত হ'তে হবে। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আর একবার দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠল। ভিতরে যাবে না ফিরে যাবে।

একটু বাদেই পুরোন চাকর নীলাম্বরের নজরে পড়ে গেল অসিত। নীলাম্বর তাকে চিনে রেখেছে। অসিতের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'এই যে আসুন, এই ঘরে আসুন। আমি আপনার জন্যই এখানে দাঁড়িয়ে আছি।'

নীলাম্বরের পিছনে পিছনে একতলার একটি হল ঘরের দোরের সামনে এসে অসিত থেমে দাঁড়াল। তরুণ বয়সী আরো দশ বারোটি নারী পুরুষ জড়ো হয়েছে। বাঁ দিকে মেয়েরা বসেছে, ডান দিকে ছেলেরা। মাঝখানে একটি মেয়ে কি যেন সবাইকে পড়ে শোনাচ্ছে।

অসিতকে দেখে সকলেই দোরের দিকে তাকাল। ভিতর থেকে সুজাতা উঠে এসে বলল, 'আসুন, দেরি দেখে ভাবলাম আপনি বুঝি আর এলেনই না।'

অসিত বললে, 'কিন্তু এমন সভা-সমিতির আয়োজন করবেন তা তো আমাকে জানাননি।'

সুজাতা একটু কৈফিয়তের সুরে বলল, 'সভা সমিতি কিছুই নয়। এ আমাদের একটি ঘরোয়া ক্লাব। ভিতরে এসে বসুন, সব শুনবেন।'

অসিত ঘরের ভিতরে এলে ক্লাবের সভ্য সভ্যাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল সুজাতা। তারপর ত্রিশ বত্রিশ বছরের আর একটি শ্যামবর্ণা মেয়েকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি বীথিকা গুপ্ত। আমাদের যাত্রী সঙ্ঘের সম্পাদিকা। এ্যাডভোকেট সমীরণ গুপ্তের স্ত্রী।'

বীথিকা স্মিত মুখে চুপ করে রইল।

সুজাতা বলল, 'আর অসিতবাবুর কথা তো আপনাকে আগেই বলেছি বীথিদি। একে আমাদের যাত্রী সঙ্ঘের সভ্য করে নিতে হবে।'

বীথিকা হেসে বলল, 'তুমি যখন সুপারিশ করছ তখন নিতে হবে বইকি।'

অসিত বলল, 'শুধু ওঁর সুপারিশই যথেষ্ট? আমার মতামতের বুঝি কোন প্রয়োজন নেই।'

বীথিকা অসিতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেন আপনার কি অমত আছে নাকি?'

অসিত বলল, 'যতদূর মনে হচ্ছে দলটা ডাকাতির। কিন্তু ও বিদ্যায় আমার মোটেই পটুতা নেই। এ সঙ্ঘের সভ্য হব কোন ভরসায়।'

অসিতের কথায় সভ্যাদের মধ্যে হাসির শব্দ শোনা গেল।

বীথিকা বলল, 'আপনি ঘাবড়াবেন না। ডাকাতির কায়দা কানুন সব এখানে শিখিয়ে নেওয়া হয়। তার জন্যে আমরা আলাদা ফী নিইনে।'

অল্প সময়ের মধ্যেই মহিলাটি বেশ অন্তরঙ্গ সুরে আলাপ জমিয়ে তুললেন দেখে অসিতের খুব ভালো লাগল।

একটু বাদে বীথিকা গম্ভীর স্বরে বলল, 'চুরি ডাকাতি নয়, সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার জন্যেই এই আসর আমরা গড়ে তুলেছিলাম অসিতবাবু। কিন্তু কিছুতেই একে টিকিয়ে রাখতে পারছি না। যাত্রীসঙ্ঘের মেম্বারদের

আজ সম্বাদ্ধবে নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু এত চেষ্টা চরিত্রের পরেও দেখছেন তো এ্যাটেনডেনসের নমুনা।'

অসিত বলল, 'সমীরণ বাবু, অবনী বাবু এরা সব আসেন না।' প্রশ্নটা শেষ ক'রে সুজাতার দিকে তাকাল অসিত।

সুজাতা একটু আরক্ত হয়ে বলল, 'ভাইসপ্রেসিডেন্টের লিষ্টে ওদের নাম আছে। বীথিদি মোটা টাকার চাঁদা ওদের কাছ থেকে আদায় করে নেন। কিন্তু ওরা নিজেরা বড় একটা আসতে চান না।'

অসিত বলল, 'কেন?'

বীথিকা বলল, 'তাঁরা সবাই কাজের মানুষ। এসব ব্যাপারকে বোধহয় ছেলেমানুষি মনে করেন।'

অসিত এ কথার পরে আর কোন মন্তব্য করল না।

ঘরের এক কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে আর একটি যুবক এতক্ষণ এদের আলাপ শুনছিল। এবার সে বলে উঠল, 'মিসেস গুহ আমাদের বৈঠক বোধ হয় আজকের মত শেষ হয়ে গেছে, এবার আমরা উঠতে পারি।'

সুজাতা বাধা দিয়ে বলিল, 'না না বিনয়বাবু একটু বসুন আপনারা। আমি এক্ষুনি আসছি।'

বলেই পাশের ঘরে চলে গেল সুজাতা। একটু বাদে চাকর এসে প্রত্যেকের সামনে খাবারের প্লেট রেখে দিতে লাগল। সভ্য সভ্যাদের মধ্যে কিছু বেশি মাত্রার উৎসাহের সঞ্চার হোল। খানিক বাদে বড় ট্রেতে করে চায়ের কাপগুলি নিয়ে এল নীলাম্বর।

অসিত বলল, 'এত ভোজ্য পানীয়ের ব্যবস্থা সত্বেও যদি আপনারা আসর না জমিয়ে তুলতে পারেন আমাদের যে অখ্যাতি হবে মিসেস গুহ।'

বীথিকা বলল, 'অখ্যাতি হবে কি, হয়েছে। আপনাদের মত দু'একজন খ্যাতিমান এসে এবারে হাল না ধরলে আর ক্লাবের রক্ষা নেই।'

কিছুক্ষণ পরে সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেল। অতবড় হল ঘরে এখন

শুধু দুজন অসিত আর সুজাতা। অসিত যথাসম্ভব দূরত্ব রক্ষা ক'রে সরে বসেছে। সুজাতা কি একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে অসিতের কাছ থেকে কিছু শোনবারই প্রতীক্ষা করছে সে। কিন্তু অসিতও যে শুনতেই চায়।

আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর অসিত বলল, 'এবার আমিও চলি। রাত হয়ে যাচ্ছে।'

সুজাতা বই থেকে মুখ তুলে বলল, 'এখনই যাবেন?'

অসিত বলল, 'হ্যাঁ এবার উঠি। দূর তো কম নয়।'

সুজাতা কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'আমাদের ক্লাব কেমন লাগল আপনার?'

অসিত একটু হাসল, 'এত তড়াতাড়ি কি সে কথা বলা যায়?'

সুজাতা বলল, 'বুঝতে পারছি আপনার তেমন ভালো লাগে নি। কিন্তু আমরা যদি চেষ্টা করি একে নিশ্চয়ই ভালো লাগাবার মত করে গড়ে তুলতে পারি এ বিশ্বাস আমার আছে।'

'আমরা' কথাটা অসিতের কানে ভারি মধুর লাগল। সুজাতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বেশ তো।'

একটু পরে সুজাতার কাছে বিদায় নিয়ে ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল অসিত। বাস স্টপেজের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবল আজ একই দিনে দু' দুটি সভায় উপস্থিত থাকবার সুযোগ হোল। সভ্য সংখ্যায় দুটি সভাই প্রায় সমান। তবু এদের ধরণ স্বতন্ত্র। নিজেদের সেই ইউনিয়ন গড়ে তোলার কথা অসিত কেন সুজাতাকে বলতে পারল না। সুজাতা বিস্মিত হবে, ক্ষুণ্ণ হবে এই আশঙ্কা কি ছিল অসিতের মনে। নিশ্চয়ই না। বলবার সময় আসুক তখন বলবে বই কি। অসিত কিছুই গোপন করবে না। শ্যামলের কাছেও না, সুজাতার কাছেও না।

দিন কয়েক বাদে ছুটির পর শ্যামল ফের একদিন অসিতের বাসার দিকে রওনা হোল। দুদিন ধরে অসিত অফিসে যায় না। ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে বলে খবর পাঠিয়েছে। কেমন আছে একবার দেখে আসা দরকার. তা ছাড়া বিষ্ণুবাবুর ব্যাপারটা সম্বন্ধেও শ্যামল তার সঙ্গে পরামর্শ করবে। তিনি প্রায় রোজ এসে শ্যামলকে ধরছেন, 'একটা কিছু বিধি ব্যবস্থা করে দাও। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কি এই বুড়ো বয়সে না খেয়ে মরব।'

ইউনিয়ন গড়ে তোলবার উদ্যম অমন করে ব্যর্থ হওয়ায় শ্যামল সকলের ওপরই চটে ছিল। বিষ্ণুবাবুকে ও খুব ঝাঁঝাল গলায় জবাব দিয়েছে, 'মরে গেলে মরবেন। আমার কি করবার আছে বলুন।'

কিন্তু পর মুহূর্তে এই শীর্ণদেহ ম্লানমুখ প্রৌঢ়টির দিকে তাকিয়ে শ্যামলের মন নরম হয়েছে, নিজের রূঢ় ভাষার জন্যে লজ্জা বোধ করেছে ভিতরে ভিতরে। কোমল স্বরে বলেছে, 'আপনি তো এ ব্যাঙ্কে অনেকদিন কাজ করছেন। কত বন্ধু বান্ধব আপনার। তাঁদের কাউকে ধরুন না।'

বিষ্ণুবাবু বলেছেন, 'ভুল করছ শ্যামল, কেউ কারো জন্যে এখানে টু শব্দটি করবে না। সবাই যার নিজের চাকরি রাখতে নিজের নিজের ইনক্রিমেণ্ট প্রমোশন নিয়ে ব্যস্ত। বলে তো নিজের জন্যে বলবে। নিজের আত্মীয়কুটুম্বের চাকরির জন্যে ধরাধরি করবে পরের জন্যে পরে বলতে যাবে কেন বল তো।'

শ্যামলের ইচ্ছা হয়েছে বলে, 'তা যদি না যায় পরের জন্যে সত্যিই কেউ যদি কিছু না করে তাহলে আপনি আমার কাছে এসেছেন কোন ভরসায়।'

মনে এলেও শ্যামল অবশ্য মুখ ফুটে কথাটা বলেনি। কারণ কার কাছ থেকে বিষ্ণুবাবু যে কিছু প্রত্যাশা করছেন এতেই বোঝা যায় মানুষের ওপর এখনো তাঁর বিশ্বাস আছে। পরের বিপদে আপদে পর যে একেবারে নিশ্চেষ্ট থাকবে না একথা তিনি এখনো ভিতরে ভিতরে মানেন। কিন্তু

সহকর্মী বন্ধুদের ওপর বিষ্ণুবাবুর যদি তেমন আস্থা না থেকে থাকে তাহলে তাঁকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। বয়স্ক প্রবীণ সহকর্মীদের শ্যামলও তো এতদিন ধরে দেখে আসছে। প্রত্যেকেই একেকজন ব্যক্তিকেন্দ্রিক বড় পরিবারকেন্দ্রিক পুরুষ। স্ত্রী পুরুষ নিয়ে গড়া চার দেয়াল ঘেরা একএকটি ঘরই তাঁদের পৃথিবী। তার বাইরে যে জগৎ আছে, মানুষ আছে সেদিকে তাঁদের যেন কোন খেয়ালই নেই। অন্ততঃ নিজেরা যাঁরা পারিবারিক মানুষ তাঁদের তো অন্যের পরিবারের তার স্ত্রী পুত্রের দুঃখ দুর্দশার কথা বুঝতে পারা উচিত। কিন্তু তাও যে তাঁরা পারেন না সে অভিজ্ঞতা শ্যামলের এই কয়েকদিনেই হয়েছে। প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টের কর্তার কাছে সে অনুনয় বিনয় করেছে। বিষ্ণুবাবুর জন্যে তাঁরা চেয়ারম্যানকে একবার বলুন। কিন্তু প্রত্যেকেই শ্যামলের প্রস্তাবটাকে একেবারে অসম্ভব আর অবাস্তব বলে মনে করেছেন। কারো মনের ভাব শুধু মৃদু হাসি কি মাথা নাড়ায় ব্যক্ত হয়েছে কেউ বা দয়া করে দু একটি ভাষায় তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। বিষ্ণুবাবুর ব্যাপার নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কী হয়েছে। চাকরি তো তাঁর একেবারে যায় নি। বরং এ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলে একেবারে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। সুরপতি বড় সহজ লোক নন। এ সব ব্যাপারে বরং ভাড়ি কড়া, তাঁর মুখ থেকে একবার যা বেরোয় তা খণ্ডণ হয় না।। সহকর্মীদের এ সব যুক্তিজালের মধ্যে তাঁদের ঔদাসীন্য আর হৃদয়হীনতাই চোখে পড়েছে শ্যামলের। তাঁদের কাউকেই সে ক্ষমা করতে পারে নি। অবশ্য শ্যামল জানে বিষ্ণুবাবু এঁদেরই একজন। তিনিও আত্মসর্বস্ব স্বার্থপর। তবু তিনি আজ বিপন্ন। তাঁর দোষের কথা না ভেবে তাঁকে সাহায্যের উপায়ই সবাইকে আজ খুঁজে বের করতে হবে। বাস স্টপেজে নেমে বড় রাস্তা পার হয়ে সরু গলির পথ ধরল শ্যামল। খানিকটা এগিয়ে অসিতদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। বার দুই কড়া নাড়তেই মৃদু কণ্ঠে সাড়া এল, 'যাই'। তারপর খিল খোলার শব্দ, তারপর সংক্ষিপ্ত মধুর আমন্ত্রণ, 'আসুন।' শ্যামল চোখ তুলে দেখল উমা। শুধু

গীতার সংস্কৃত শ্লোকই নয়, প্রকৃত বাংলা শব্দও ওর মুখে অদ্ভুত মিষ্টি লাগে।

শ্যামল ভিতরে ঢুকবার আগে জিজ্ঞাসা করল, 'অসিত কেমন আছে?'

উমা মৃদু হেসে বলল, 'ভালো। আজই ভাত খেয়েছে।' তারপর আর একবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, 'আসুন, ভিতরে আসুন।' শ্যামল এবার উমার পেছনে পেছনে ওদের বড় ঘর খানিতে গিয়ে ঢুকল।

তক্তপোষের ওপরে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে অসিত পুরোন একটা মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছিল। অরুন্ধতী নিচে বসে চাল বাছতে বাছতে বললেন, 'এই সন্ধ্যা বেলা ও সব বই টই রেখে দে অসিত। কি যে তোদের অভ্যাস হয়েছে, সব সময় চোখের সামনে একটা কিছু নিয়ে থাকাই চাই।'

অসিত হেসে বলল, 'তুমিও তো একটা কিছু নিয়ে না থেকে পার না মা।'

অরুন্ধতী বললেন, 'আমার সঙ্গে তোর তুলনা।'

এই সময় শ্যামলকে নিয়ে উমা ঘরে ঢুকল।

উমা বলল, 'দেখ মা কে এসেছেন।'

অরুন্ধতী ফিরে তাকিয়ে শ্যামলকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, 'এসো বাঁবা এসো।'

শ্যামল স্মিত মুখে বলল, 'ভালো আছেন মাসীমা?'

অরুন্ধতী বললেন, 'তোমরা কি ভালো থাকতে দাও যে ভালো থাকব? এই দেখ না ছেলে আবার কদিন ধরে জ্বর বাধিয়ে বসেছে।'

অসিত বন্ধুকে কাছে ডেকে বলল, 'এসো শ্যামল। মার সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। একটু সর্দি জ্বর কি ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়েছে আর কি রক্ষা আছে। এমন মাতৃস্নেহের পাল্লায় তুমি যদি পড়তে—'

শ্যামল একটু হেসে বলল, 'তা ঠিক, পাছে স্নেহের বাঁধনে হাঁসফাঁস

করতে হয় তাই বাবা মার কাছ থেকে দূরে সরে এসেছি। শত ডাকাডাকি করলেও আর কাছে যাই না।'

অরুন্ধতী বললেন, 'কথা শোন ছেলের। বড় হয়ে গেলে তোমরা আমাদের এড়িয়ে চলতেই চাও।'

শ্যামল বলল, 'একেবারে এড়াতে পারি কই, মাকে এড়াই তো মাসীমা এসে জোটেন।'

অরুন্ধতী হাসিমুখখানা উমার দিকে ফিরিয়ে বললেন, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছিস। যা এবার শ্যামলের জন্যে একটু চা টা ক'রে আন।'

শ্যামল বলল, 'ওকে অত তাড়া দিতে হবে না মাসীমা। আমি যখন এসেছি চা-ও যথা সময়ে আসবে।'

কিন্তু মায়ের কথা শোনার পর উমা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে গেল। মা মানুষকে ভারি অপ্রস্তুত করতে পারে ভারি লজ্জা দিতে পারে। সত্যিই কি উমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাউকে দেখছিল। ছিঃ। শ্যামল বাবু না জানি কী-ই মনে করলেন।

শ্যামল অরুন্ধতীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'একজনকে তো চা করতে পাঠালেন। আর একজন কই।' বলে একটু যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল শ্যামল। বন্ধুর বোন সম্বন্ধে এই ঔৎসুক্য কতটুকু শোভন হবে তাই ভাবল। অরুন্ধতী সহজভাবে বললেন, 'নীলার কথা জিজ্ঞেস করছ? সে তো স্কুল থেকে এখনো ফেরেনি। দেখ মেয়ের কাণ্ড। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে তো সেই সাড়ে চারটেয়। ছটা বাজতে চলল এখনো বাড়ি আসার নাম নেই। এখনো কি ছাত্রীরা ওর কাছে পড়বার জন্যে বসে আছে। অসিত তুই একটু বলে দিস্ তো নীলাকে।'

অসিত বলল, 'দেব মা, দেব। অত ভাববার কিছু নেই। নীলা পথ ঘাট সব চেনে। কোথাও হারিয়ে যাবে না। কোন ভয় নেই তোমার।'

অরুন্ধতী বললেন, 'না আমার ভয় ভাবনা কিসের। এখন তোমরা

প্রত্যেকেই বড় হয়েছ। যার যার ভাল নিজেরা বুঝতে শিখেছ। আমার ভয় ভাবনাকে কি আর তোমরা গ্রাহ্য করবে ?'

চালের ডালা নিয়ে অরুন্ধতী উঠে চলে গেলেন।

অসিত হেসে বলল, 'আচ্ছা মুস্কিল হয়েছে মাকে নিয়ে। কথায় কথায় রাগ, কথায় কথায় অভিমান। আগে কিন্তু এমনটা ছিল না। বয়স বাড়লে বোধহয় মান যাওয়ার ভয়টাও বাড়ে শ্যামল। ভালো কথা বিষ্ণু বাবুর খবর কি।'

শ্যামল বলল, 'তার বহু ভাগ্য যে এখনো তাঁর কথা তোমার মনে আছে।'

অসিত হেসে বলল, 'তুমি আমার মার উপযুক্ত বোনপো। লোককে অনর্থক অনুযোগ দিতে পারলে তুমি আর কিছু চাও না। বিষ্ণুবাবুর কথা আমার না হয় মনে নেই। কিন্তু তোমরাই বা মনে রেখে কী করতে পেরেছ শুনি ?'

শ্যামল নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে বলল, 'সত্যি অসিত কিছুই ক'রে উঠতে পারিনি। খোটা দেওয়ার তোমার অধিকার আছে। এতদিন ধরে প্রত্যেকটি সিনিয়র অফিসারের কাছে আমি গেছি। কিন্তু এ ব্যাপারে কারো কিছু সাহায্য সহানুভূতি পাওয়ার আশা নেই। বেশ, চাইনে কারো সাহায্য। আমি একাই যাব।'

জুতোর শব্দে শ্যামল পিছন ফিরে তাকাল। নীলা এসে বাইরে দাঁড়িয়েছে। হাতে দড়ি বাঁধা একরাশ খাতা।

শ্যামলের দিকে চোখাচোখি হ'তে নীলা একটু হেসে বলল, 'ও, আপনি।'

সারাদিনের খাটুনিতে নীলার মুখে একটু ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। কিন্তু শ্যামলের মনে হোল এটুকু ক্লান্তি যেন প্রসাধনের মত ওর মুখের সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। উমার মত মুখের ডৌল অত নিখুঁৎ নয় নীলার। গায়ের রঙও ময়লা। কিন্তু ওর স্বাভাবিক সপ্রতিভতা দেহের সব খুঁৎ যেন ঢেকে দিয়েছে।

অসিত বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আয়, ঘরে আয়। মা তো তোর জন্যে মহা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। হাসছিস যে। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?'

নীলা বলল, 'তা হচ্ছে।'

'তবে?'

নীলা সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'শ্যামলবাবু একা একা কোথায় যাবেন বলে তোমাকে ভয় দেখাচ্ছিলেন দাদা?'

অসিত হেসে বলল 'ও, বাইরে থেকে শ্যামলের আস্ফালনটা বুঝি তোরও কানে গেছে।'

নীলা লজ্জিত হয়ে বলল, 'ছিঃ দাদা ওকি কথা। আমি কি তাই বলেছি।'

অসিত বলল, 'ভাষায় বলিস নি বটে, কিন্তু ভঙ্গিতে অনেকটা সেই রকমই ফুটে উঠেছে।'

নীলা বলল, 'তুমি মানুষের নামে বড় মিথ্যে কথা বলতে পার দাদা। তারপর শ্যামলের দিকে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি একা একা কোথায় যাওয়ার সঙ্কল্প করছিলেন?'

শ্যামল লক্ষ্য করল ঠিক আগের দিনের আড়ষ্টতা নীলার মধ্যে আর নেই। ওর কথাবার্তার এই সহজ সরস ভঙ্গি শ্যামলের ভালোই লাগল। শ্যামল মৃদু হেসে বলল, 'দূর দুর্গম কোন দেশে নয়। কাছেই। একটা বিশেষ দরকারে আমাদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করবার কথা বলছিলাম।'

নীলা বলল, 'ও।'

শ্যামল বলল, 'আপনি হাসছেন। কিন্তু আপনি যদি আমাদের ব্যাঙ্কের কোন কেরাণী হতেন তাহলে টের পেতেন ব্যাপারটা অত সহজ নয়।'

নীলা মৃদু হেসে বলল, 'কেরাণী না হয়েও তা টের পাচ্ছি।'

শ্যামল বলল, 'কি করে।'

নীলা বলল 'আপনাদের দেখে।'

চায়ের কাপ হাতে উমা এবার ঘরে ঢুকল। বোনের দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে কাপটি শ্যামলের দিকে এগিয়ে দিল উমা। তারপর বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

নীলা ওর পেছনে পেছনে বাইরে এসে উমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'অমন বিনা বাক্য ব্যয়ে চলে এলে যে দিদি।'

উমা একটু পিছিয়ে গিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, 'বাক্যের জন্যে তো তুমিই আছ।'

নীলা বলল, 'তা ঠিক। আমার কথা তোমার কাজ। আসতে না আসতেই চায়ের কাপটি হাতে ক'রে নিয়ে হাজির। দু মিনিটও সবুর সইল না।'

উমা মুহূর্তকাল নীলার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ছোট বোনের এই তরল প্রগলভতায় যেন মহা বিরক্ত হয়েছে তেমনি ভঙ্গি ক'রে বলল, 'দেখ নীলা, ও সব বাজে রসিকতা তোর ভাল লাগতে পারে আমার মোটেই লাগে না। আমি তোকে বারণ ক'রে দিচ্ছি ওসব ঠাট্টা আমার সঙ্গে তুই আর করতে আসিস নে। আশ্চর্য, এত কাণ্ডের পরও ঠাট্টার সাধ তোর আজও মিটল না।'

এত সামান্য ব্যাপারে সেই পুরোন কলঙ্কের খোঁটা যে উমা তাকে দিয়ে বসবে তা নীলা ভাবতে পারেনি। এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'না দিদি মিটল আর কই।'

উমা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার বোনের দিকে তাকিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ ক'রে দিল।

রান্না ঘর থেকে অরুন্ধতী তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন। তারপর চাপা গলায় শাসনের সুরে বললেন, 'কী আবার হোল তোদের।'

নীলা বলল, 'কিছু হয় নি মা।'

অরুন্ধতী বললেন, 'কিছু হয়নি! আচ্ছা বাইরের একজন লোকের সামনেও কি তোরা এমন করবি। লজ্জা সরমের মাথা কি তোরা একেবারেই খেয়েছিস?'

নীলা মৃদুস্বরে বলল, 'না মা, একেবারে খেতে পারিনি।'

একথা শুনে অরুন্ধতী যেন বাকশক্তি হারিয়ে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

নীলা আর কোন কথা না বলে খাতাগুলি সামনের একটা জল চৌকির ওপর নামিয়ে রেখে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

খানিক বাদে হাত মুখ ধুয়ে সে যখন বেরিয়ে এল তার মুখে বিরাগ বিদ্বেষের কোন চিহ্নই আর দেখা গেল না।

তাদের যৌথ ঘরে উমা একা গিয়ে খিল এঁটে দিয়েছে দেখে নীলা ফের অসিতদের ঘরেই চলে এল। দুই বন্ধুর মধ্যে তখন ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে জোর আলোচনা চলছে।

দোরের পাশে দাঁড়িয়ে নীলা একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'আসতে পারি ?'

শ্যামল বলল, 'নিশ্চয়ই, আসুন না।'

অসিত হেসে বলল, 'তোর আর অত ভদ্রতা করতে হবে না। আয় বোস এসে এখানে।'

বিষ্ণুবাবুর ব্যাপারটা নিয়েই দুই বন্ধুর মধ্যে তর্ক হচ্ছিল। অসিত বলছিল তাদের যা বক্তব্য লিখে চেয়ারম্যানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যাক। তারপর সেই আবেদনে যদি কোন ফল না হয় তখন না হয় কয়েকজনে মিলে সুরপতিবাবুর কাছে হাজির হওয়া যাবে।

শ্যামলের ধারণা ওসব আবেদন নিবেদনে কোন কাজ হবে না। সুরপতিবাবু যে ধরণের মানুষ তাতে তিনি কাগজখানা হয় ছিঁড়ে ফেলবেন না হয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য চেপে রাখবেন। তার চেয়ে যা বলবার মুখে মুখে বলা আর সঙ্গে সঙ্গে জবাব আদায় করাই ভালো।

অসিত বলল, 'কিন্তু তেমন জবাব যদি তিনি না দেন।'

শ্যামল বলল, 'তখন যা হয় অবস্থা বুঝে করা যাবে।'

তারপর হঠাৎ নীলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার কী মত ? আপনি কী বলেন ?'

নীলা লজ্জিত হয়ে বলল, 'আপনাদের অফিসের ব্যাপারে আমি কী বলব। তাছাড়া কী হয়েছে না হয়েছে আমি তো ভালো করে কিছু জানিইনা।'

শ্যামল বলল, 'জানেন না, জেনে নিন।'

প্রথম দিকে নীলার মনে হয়েছিল শ্যামল বুঝি লাজুক মুখচোরা। কিন্তু এখন দেখা গেল তা মোটেই না। দু' একদিনেই অপরিচয়ের সংকোচ আর আড়ষ্টতা শ্যামল কাটিয়ে উঠতে পারে। সৌজন্য শিষ্টাচারের ছোট ছোট সিঁড়িগুলি সে লাফে লাফে ডিঙিয়ে যায়। শ্যামলের বেলায় এই উল্লঙ্ঘনকে মোটেই অশোভন বা অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। তার প্রকৃতির সঙ্গে এই ব্যস্ততা আর দ্রুততার যেন বেশ সঙ্গতি আছে।

দু' তিন মিনিটের মধ্যে বিষ্ণুবাবুর কাহিনীটা শ্যামল নীলাকে আনুপূর্বিক বুঝিয়ে বলল। সামান্য ভুলের জন্যে তাঁকে কী ভাবে suspend করা হয়েছে মানের দায়ে নয় প্রাণের দায়ে তিনি কী ভাবে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন তাঁর এই বিপদে সহকর্মীরা কেমন নির্বিকার উদাসীন হয়ে রয়েছেন তার বিবরণ দিতে শ্যামলের বেশি সময় লাগল না।

সব কথা শুনে নীলা বলল, 'বেচারা ভদ্রলোক তো তাহলে সত্যিই খুব অসুবিধায় পড়েছেন।'

শ্যামল বলল, 'রোজ এসে আমার কাছে ধন্না দিচ্ছেন। কিছু করতেও পাচ্ছি না আবার কিছু না করেও কোন স্বস্তি পাচ্ছি না।'

নীলা হঠাৎ বলে ফেলল, 'আমি হলে এরূপ অস্বস্তি ভোগ করতাম না। সোজা সুরপতি বাবুর কাছে গিয়ে বলতাম আপনি এমন অন্যায় করতে পারবেন না।'

নীলার ভঙ্গি দেখে অসিত হেসে বলল, 'আর সুরপতিবাবু তোর পিঠে হাত বুলিয়ে বলতেন, খুকি পুতুল খেলার পক্ষে জায়গাটা সুবিধের নয়, যাও ঘরের কোণে কি তক্তপোষের তলায় বসে খেল গিয়ে।'

নীলা রাগ করে বলল, 'দাদা তোমার পিঠে যে সে হাত বুলিয়ে যায় বলে আমার পিঠে হাত দেওয়ার কারো সাধ্য নেই।'

তারপর একটু থেমে বলল, 'তাছাড়া অন্যায়কে অন্যায় বলা যদি পুতুল খেলা হয়, সে খেলা আমি চিরদিন খেলতে রাজী আছি।'

শ্যামল একটুকাল বিস্মিত মুগ্ধ চোখে নীলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমারও সেই কথা। এত ভাববার এত ভয় করবার কী আছে অসিত। আমরা তো লাঠি-সোটা নিয়ে হৈ হাঙ্গামা করতে যাচ্ছি না। শান্ত ভদ্রভাবেই চেয়ারম্যানকে অনুরোধ ক'রে বলব বিষ্ণুবাবুর কেসটা আপনি দয়া ক'রে আর একবার বিবেচনা ক'রে দেখুন স্যার।'

অসিত একটু চিন্তা ক'রে বলল, 'বেশ তাই যদি তোমরা সবাই মিলে স্থির ক'রে থাক, আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। আমার আর আপত্তির কী আছে।'

শ্যামল বলল, 'ও কি কথা হোল। তুমি আমাদের সঙ্গে কেন যাবে আমরাই বরং তোমার সঙ্গ নেব। বুদ্ধি বিবেচনার কোন একটা বিষয় সাজিয়ে গুছিয়ে বলবার তোমার মত আমাদের মধ্যে কেউ আর নেই। তুমি সত্যিই আমাদের মুখপাত্র, অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা।'

অসিত একটু হেসে বলল, 'থাক থাক। তুমি যত প্রশংসাই যত সুখ্যাতিই কর, আমার সম্বন্ধে নীলার ধারণা মোটেই বদলাবে না। কী বলিস নীলা?'

পরদিন অসিত অফিস গেলে শ্যামল স্থির করল আর কাল বিলম্ব নয় সেইদিনই সুরপতিবাবুর সঙ্গে তারা দেখা করবে। লোন ডিপার্টমেণ্টের শৈলেন কর লেজারের সত্য চাটুয্যেও তাদের সঙ্গে যেতে রাজী হোল। দুজনেরই বয়স পঁচিশের নিচে। বেপরোয়া স্পষ্ট বক্তা হিসাবে দুজনেরই খ্যাতি আছে।

ছুটির পরে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন সুরপতিবাবু। চারজন গিয়ে তাঁর টেবিলের সামনে দাঁড়াল। তিনি চশমার পুরু কাঁচের ভিতর দিয়ে সকলের মুখে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার। আমার হেড অফিসে কি মাত্র এই চারজন ক্লার্ক? আর বেশি নেই?'

স্বরপতির টেবিলের সামনে সারি সারি খান চারেক গদি আঁটা চেয়ার রয়েছে। আশে পাশে সোফা কোচেরও অভাব নেই। কিন্তু কর্মচারীদের কাউকে বসতে বললেন না স্বরপতি। তারা দাঁড়িয়েই রইল।

একটু বাদে অসিত সবিনয়ে বলল, 'আপনি বিরক্ত হবেন বুঝতে পেরেও একটা জরুরী ব্যাপারে আপনার কাছে না এসে পারলাম না।'

স্বরপতি রুপালী এ্যাসট্রেতে চুরুটের ছাই ঝেড়ে শান্তভাবে বললেন, 'বিরক্ত হব জেনেও যখন এই দলবল নিয়ে এসেছ তখন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খুব জরুরী। বিষয়টা শুনি।'

অসিত একবার শ্যামলের দিকে তাকাল তারপর একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আমরা বিষ্ণুবাবুর কেসটা সম্বন্ধে আপনাকে একটু বলতে এসেছি।'

স্বরপতি ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমার সময় কম। ভণিতার দরকার নেই। যা বলবার বলে ফেল।'

অসিত মৃদু হেসে বলল, 'আমরা তাড়াতাড়িই বলব। কিন্তু আপনাকে একটু ধীরে সুস্থে ধৈর্য ধরে শুনতে হবে। সামান্য ভুল চুকের জন্যে বিষ্ণুবাবুকে অমন গুরুতর শাস্তি দেওয়াটা—'

স্বরপতি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কোনটা সামান্য আর কোনটা গুরুতর সে বিচার যদি তুমিই করবে, তাহলে এই চেয়ারে তুমি এসে বোস অসিত।'

অসিত বলল, 'আপনি রাগ করছেন।'

স্বরপতি বললেন, 'এটা রাগের কথা নয়, বিচার বিবেচনার কথা।'

শ্যামল এবার বলল, 'আপনাকে বিবেচনা করবার জন্যেই অনুরোধ করছি। বিষ্ণুবাবুর অনেক পোষ্য। এই সামান্য আয়ে তাঁর সংসার চলা কঠিন। এরপর যদি দু' একমাস তার মাইনে বন্ধ থাকে ছেলেপুলে নিয়ে সব শুদ্ধ উপোস করতে হবে।'

শ্যামলের কথার কোন জবাব না দিয়ে স্বরপতি অসিতের দিকে

ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন, 'তোমরা কি চতুর্মুখে চেঁচাবার জন্যে জোট বেঁধে এসেছ ?'

অসিত বলল, 'না না, আমি একাই বলছি। সত্যি বিষ্ণুবাবুর সংসারের জন্যে—'

সুরপতি বললেন, 'তোমরা একজন বিষ্ণুবাবুর সংসারের কথা ভাবছ, আমাকে হাজার হাজার পরিজনের জন্যে মাথা ঘামাতে হয়। কর্মচারীদের অনিয়ম অনাচারে ব্যাঙ্কের সুনাম যদি নষ্ট হয়, তাহলে কারবার বন্ধ ক'রে দিতে হবে। আর তাতে কত জন বিষ্ণুবাবুর স্ত্রীপুত্রকে নিরন্ন হতে হবে সে কথা ভেবে দেখেছ ?'

এই ধমকের জবাবে হঠাৎ কেউ কোন কথা বলতে পারল না। সুরপতিবাবু বলে চললেন, 'এ ভাবালুতার জায়গা নয় অসিত। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা নিয়ে কারবার। লোকে তাদের কষ্টের ধন আমার হাতে বিশ্বাস ক'রে রেখে যায়। আর আমাকে দিন রাত জেগে সেই ধনকে পাহারা দিয়ে রাখতে হয়। সে পাহারা সিন্দুকে চাবি তালা দিয়ে নয় সব ঝুঁকি নিজের ঘাড়ে নিয়ে দেশের কল্যাণের জন্যে সে টাকা দশ জনের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে। এরই নাম ব্যাঙ্কিং। ব্যক্তিগত ভাবালুতায় যদি একবার ভাসতে শুরু করি তাহলে সব ভেসে যাবে।'

উত্তেজিত সুরপতি একটু থেমে দম নিলেন তারপর তাদের চলে যাওয়ার ইঙ্গিত ক'রে বললেন, 'আচ্ছা এবার এসো তোমরা। জেনারেল ম্যানেজার এক্ষুণি আসবেন এখানে। তাঁর সঙ্গে অনেক দরকারী কথাবার্তা আছে।'

তবু অসিত একবার শেষ চেষ্টা ক'রে বলল, 'যদি এবারের মত তাঁকে ক্ষমা করেন—'

সুরপতি অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বললেন, 'তাঁকে ক্ষমাই করা হয়েছে। অন্য কোথাও হ'লে তিনি একেবারেই discharged হতেন।'

কলিং বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে সুরপতি বললেন, 'অবনী বাবুকে আসতে বল এ ঘরে।'

অসিতরা আর দেরি না ক'রে চেয়ারম্যানের ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ব্যাঙ্কের বাইরে এসে অসিত শ্যামলদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম।'

শ্যামল গম্ভীর মুখে সংক্ষেপে বলল, 'হুঁ।'

এই প্রথম পরাভবে শ্যামল যে ভেঙে পড়েছে তা তার মুখ দেখে মনে হোল না। সুরপতির এই ব্যবহারে সে মোটেই বিস্মিত হয় নি। বরং চেয়ারম্যান যদি তাদের প্রার্থনা সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর করতেন তাহলেই বিস্ময়ের কারণ ঘটত: আর কিছু না হোক, কজনে মিলে যে বিষয়টা নিয়ে সুরপতির সামনে দাঁড়াতে পেরেছে এও কম কথা নয়। ব্যাঙ্কের ইতিহাসে এমন ঘটনাও এই প্রথম।

বিষ্ণুবাবুর বিষয়টা বিবেচনা ক'রে দেখবার জন্য অসিতরা চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করে আসবার পর আরো দু' সপ্তাহ গেল। কিন্তু বিষ্ণুবাবু মাইনে পেলেন না।

সন্ধ্যার পর তিনি আজ নিজেই অসিতদের বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। অপরিচিত এই প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখে অরুন্ধতী মাথায় আঁচল টেনে দিলেন। তারপর মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনি কাকে চান?'

বিষ্ণুবাবু বললেন, 'অসিতবাবুকে। তিনি আছেন?'

অরুন্ধতী স্মিতমুখে বললেন, 'আছে। আসুন, ভেতরে আসুন।'

তাঁর অসিত আজ এত বড় এত গণ্যমান্য হয়েছে যে বাপের বয়সী বৃদ্ধও তাকে অসিতবাবু বলে ডাকছেন। ভেবে মনে মনে হাসলেন অরুন্ধতী। তারপর ঘরের ভিতর থেকে ছেলেকে ডেকে বললেন, কে এক ভদ্রলোক তোমায় খোঁজ করছেন। বোধ হয় তোমাদের অফিসের কেউই হবেন।'

একটু আগে অফিস থেকে ফিরে অসিত বোনদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। বিষ্ণুবাবুকে দেখে উঠে এসে বলল 'আরে আপনি যে, আসুন আসুন ঘরে আসুন।'

অসিতের গলায় একটু অতিরিক্ত উল্লাসের সুরই ফুটে উঠে থাকবে। কিন্তু বিষ্ণুবাবুর চেহারা দেখে নিজের উৎসাহের আধিক্যে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ল অসিত। এই কয়েকদিনেই ভাবনা চিন্তায় একেবারে আধখানা হয়ে গেছেন বিষ্ণুবাবু। মুখে সপ্তাহখানেকের দাড়ি জমেছে গায়ে একটা ময়লা পুরান র‍্যাপার জড়ানো। পায়ে একজোড়া জীর্ণ স্যাণ্ডাল। অসিতের মনে পড়ে গেল বিষ্ণুবাবু আজ মাইনে পাননি। এবার মৃদু বিষণ্ণ গম্ভীর স্বরে অসিত বলল, 'আসুন বিষ্ণুবাবু।'

বিষ্ণুবাবু একবার ইতস্তত করে বললেন, 'ঘরের ভিতরে যাব?'

অসিত বলল 'আসুন না। আমাদের সদর অন্দর বলে আলাদা কিছু নেই। আসুন। ওরা আমার দু' বোন উমা আর নীলা। আর ইনি বিষ্ণুবাবু।'

নীলা হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বলল, 'ও।'

তারপর কৌতূহলী দৃষ্টিতে বিষ্ণুবাবুর দিকে তাকাল। এর সমস্যা নিয়েই শ্যামল আর তার দাদা এতদিন ধরে এত আলোচনা করেছে।

কিন্তু বিষ্ণুবাবুর চোখে কোন কৌতূহল ফুটে উঠল না। নীলাদের নমস্কারের বিনিময়ে শিষ্টাচার মেনে কোন নমস্কারও করলেন না তিনি। অসিতের দিকে তাকিয়ে শুরুতেই কাজের কথা পাড়লেন, 'আমার কী ব্যবস্থা করলেন অসিতবাবু?'

অসিত একটু বিব্রতভাবে নীলার দিকে তাকিয়ে বলল 'যা একটু চা টা ক'রে আনতো।'

ইঙ্গিত পেয়ে উমা আর নীলা দু'বোনই ঘর থেকে চলে এল।

বিষ্ণুবাবু বললেন, 'চা-টায়ের দরকার নেই অসিতবাবু। আমার কী উপায় করলেন তাই বলুন। আমি যে আপনাদের ভরসাতেই আছি।'

তক্তপোষের একধারে বিষ্ণুবাবুকে বসতে বলে অসিত আস্তে আস্তে বলল, 'আপনি তো জানেন আমরা চেষ্টার ত্রুটি করিনি। এখনো সাধ্যমত চেষ্টা করছি—'

বিষ্ণুবাবু বললেন 'সবই তো বুঝলুম। কিন্তু সংসারটা কী করে চালিয়ে রাখব বলুন। এতগুলি কাচ্চা বাচ্চা। অথচ একটা পয়সা নেই ঘরে।'

অসিত বলল, 'কিছু তো অজানা নেই বিষ্ণুবাবু। বিপদে পড়লে মানুষকে ধৈর্য ধরে থাকতে হয়। আমরা সহজে ছাড়ব না। আমরা আর একবার চেয়ারম্যানের কাছে যাব ঠিক করেছি।'

বিষ্ণুবাবু বললেন, 'আর গেছেন আপনারা। ততদিন আমি বোধ হয় সারা হয়ে যাব।'

অসিত একটু হেসে বলল, 'বিপদে আপদে অত অধীর হলে চলে না বিষ্ণুবাবু। মাথা ঠিক রাখতে হয়।'

বিষ্ণুবাবু অসিতের দিকে তাকিয়ে দুঃখিত ভাবে বললেন, 'আমার মত বুড়ো মানুষকে ওসব কথা আর বেশি বোঝাতে হবে না অসিতবাবু। ওসব উপদেশ আমিও অনেককে দিয়েছি।'

অসিত একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, 'না না বিষ্ণুবাবু, এসব কী বলছেন। আপনাকে উপদেশ দেওয়ার ধৃষ্টতা আমাদের কারোরই নেই। শুধু অবস্থাটা বুঝে বলছি।'

বিষ্ণুবাবু বললেন, 'অবস্থা খুবই বুঝেছি অসিতবাবু, কিন্তু রাত পোহালে ছেলেপুলেগুলির সামনে কী ধরে দেব সেই কথাটা আমাকে আপনারা বুঝিয়ে দিন।'

অসিত লক্ষ্য করল বিষ্ণুবাবুর চেহারাও যেমন রুক্ষ, কথাবার্তার ধরণও তেমনি নীরস কাঠখোট্টা রকমের। তাঁর ভাষায় কোন অনুনয়ের সুর নেই। অসিতরা তাঁর পরিবার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করতে যেন বাধ্য, তাদের ওপর যেন জন্মগত দাবী আছে বিষ্ণুবাবুর। মনের অপ্রসন্নতা মুখে ফুটতে দিল না অসিত। আগের মতই শান্তভাবে বলল, 'আপনার সমস্যার সমাধান করা তো কারো একার সাধ্য নয় বিষ্ণুবাবু। আমরা সাধ্য-মত চেষ্টা করছি। ইচ্ছা আছে ব্যাঙ্ক থেকে কিছু কিছু চাঁদা তুলে দেব।

শ্যামলের সঙ্গে সেই আলোচনাই হয়েছে। আজকে গোটা দশেক টাকা আমার কাছ থেকে নিন আপনি। নিয়ে দু'একদিন খরচপত্তর চালান। তারপর দেখি কতদূর কী ক'রে ওঠা যায়। আপনি কোন সংকোচ করবেন না। পরে এক রকম সুবিধে মত দিয়ে দিলেই হবে।'

নীলা চা আর খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল। দুটো সিঙ্গারা আর একটি সন্দেশ আনিয়ে নিয়েছে গলির মোড়ের মিষ্টির দোকান থেকে। তাই ডিসে ক'রে সাজিয়ে বিষ্ণুবাবুর সামনে দিল। তিনি নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বললেন, 'আবার এসব কেন।' কিন্তু একটা সিঙ্গারা যখন ভেঙে মুখে দিলেন তখন আহারে তাঁর স্পৃহার অভাব আছে বলে মোটেই মনে হোল না অসিতের। সিঙ্গাড়ার টুকরো মুখে দিয়ে চিবানো বন্ধ ক'রে তিনি বললেন 'নিজে তো রাক্ষসের মত খাচ্ছি অসিতবাবু। ওদিকে বাড়িতে বাচ্চাগুলির যে কী অবস্থা— ।'

নীলা আর সেখানে দাঁড়াল না। তাড়াতাড়ি সরে এল সামনে থেকে।

অসিত বলল, 'আপনি কিছু ভাববেন না। তাদের ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই হবে।'

উঠে গিয়ে মার কাছ থেকে একখানা দশ টাকার নোট চেয়ে এনে বিষ্ণুবাবুর সামনে রেখে দিল অসিত। তিনি হাত মুছে নোট খানাকে ভাজ করে সযত্নে ঘড়ি পকেটে রেখে দিয়ে বললেন, 'আপনার আশ্রয় যখন নিয়েছি একটা গতি আমার হবেই তা আমি জানি।' একটুকাল চুপ করে রইলেন বিষ্ণুবাবু তারপর হঠাৎ বললেন, 'কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না অসিতবাবু পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।'

অসিত সবিনয়ে বলল, 'বলুন কী করতে পারি।'

বিষ্ণুবাবু বললেন, 'বলব বইকি, আপনাকে ছাড়া আর কাকে বলব অসিতবাবু। বলবার মত আর আছে কে। আর তাছাড়া যাকে তাকে বলে লাভই বা কি।

তারপর একটু গলা নামিয়ে বিষ্ণুবাবু ফের বললেন, 'আমি বলি কি

অসিত বাবু ওসব দল বেঁধে টেঁধে কোন লাভ হবে না। চেয়ারম্যান তেমন লোকই নন। পাঁচ জন কেন পঁচিশ জন জোট বেঁধে গেলেও তিনি তাঁর জিদ ছাড়বেন না। কিন্তু একজন যদি বলে তার কথা তিনি নিশ্চয়ই শোনেন।'

অসিত বলল, 'বলুন অফিসের কার কথায় কাজ হবে। কাকে দিয়ে বলাব!'

বিষ্ণুবাবু ফিস ফিস ক'রে বললেন, 'অফিসের কাউকে দিয়েই কোন সুবিধে হবে না অসিত বাবু। ম্যানেজারই বলুন, একাাউনট্যাণ্টই বলুন কারো সাধ্য নেই চেয়ারম্যানের কথার ওপর কথা বলে। সে সাহসই নেই কারো। শুধু একজন পারে।'

অসিত বলল, 'কে সে?'

বিষ্ণুবাবু বললেন, 'চেয়ারম্যানের মেয়ে। সুজাতা। শুনেছি তার সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে। আপনি যদি একটু তাকে বলেন—'

অসিত উত্তেজিত স্বরে বলল, 'অসম্ভব। আমি তা বলতে পারব না।

বিষ্ণুবাবু কাতরভাবে বললেন 'আপনি নিজের জন্যে তো বলবেন না আমার জন্যে বলবেন। এতই যখন করছেন দয়া করে এই উপকারটুকু করুন, অসিতবাবু। মুখ ফুটে আপনি তাকে একবার বলুন তাহলে সব হবে।'

বলতে বলতে হঠাৎ অসিতের দু'খানা হাত জড়িয়ে ধরলেন বিষ্ণুবাবু। অসিত মুহূর্তকাল স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'আপনি যা বলছেন, তা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আমার যতটুকু সাধ্য আমি তা করেছি। আমাকে মাপ করবেন।'

বিষ্ণুবাবুও অসিতের দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হোল খুব একটা কঠিন রূঢ় কথাই তিনি বলে বসবেন। কিন্তু না একটু বাদে তাঁর মুখ থেকে ঠিক আগের মতই নরম অনুনয়ের ভাষা বেরিয়ে এল।

বিষ্ণুবাবু বললেন, 'সম্ভব না হলে আর বলবেন কি করে অসিতবাবু। আমি ভেবেছিলাম বুঝি সম্ভব হবে। যাক, আপনাকে অনর্থক বিরক্ত করে গেলাম। কিছু মনে করবেন না। আপনি যা উপকার করেছেন মায়ের পেটের ভাইও আজকাল তা করে না। আপনার কাছে চিরকালেব জন্যে কেনা হয়ে রইলাম।'

কৃতজ্ঞতার এই অতিশয়োক্তি বড়ই কৃত্রিম মনে হোল অসিতেব। অদ্ভুত এক বীতস্পৃহায় এমন কি বিদ্বেষে তার সমস্ত মন ছেয়ে গেল। নিঃশব্দে বিষ্ণুবাবুকে সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল অসিত। সাধাবণ সৌজন্য রাখবার জন্যেও একটা কথা তার মুখ থেকে বেরোল না।

ছেলে গম্ভীর মুখে ফের ঘরে এসে বসল দেখে অরুন্ধতী তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটু হেসে বললেন, 'কী হোল রে। ভদ্রলোকের সঙ্গে চটাচটি করে এলি নাকি!'

অসিত বলল, 'না চটাচটি করতে যাব কেন। কিন্তু মানুষের আবদাবেব একটা সীমা আছে।'

নীলা কোথায় ছিল এগিয়ে এসে ফোড়ন কেটে বলল, 'আছে নাকি। আমার তো মনে হয় নেই।'

অরুন্ধতী মেয়েকে তাড়া দিয়ে বললেন, 'তুই যা তো এখান থেকে। সব কথার মধ্যেই তোব এসে হাজির হওয়া চাই, না?' তারপর ছেলেব দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা কবলেন, 'ভদ্রলোক কী বললেন তোকে—'

বিষ্ণুবাবুর বক্তব্যটা এবার মাকে জানাল অসিত। অনুরোধটা যে মোটেই রুচিসম্মত নয়, ন্যায়সঙ্গত নয় সে সম্বন্ধেও তার মতামতটা খুব জোবের সঙ্গেই প্রকাশ কবল।

অরুন্ধতী বললেন, 'তা দেখলিই বা বলে, যদি তাতে ভদ্রলোকের উপকার হয়—'

অসিত উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, 'না মহা উপকার হলেও আমি তা পারব না। আমার তা পারা উচিত নয় মা।'

'দেখ ভেবে যা ভালো বোঝ।' বলে অরুন্ধতী ফের রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন। কিন্তু নীলা সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল না। সে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'পারলে মন্দ হোত না দাদা। এই উপলক্ষ্যে সুজাতার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎটা হয়ে যেত। অনেকদিন তো যাওনা ওদিকে।'

অসিত এবার চটে উঠে বলল, 'দেখ নীলা তুই বড়ই বেড়ে গেছিস। তোর ধারণা ওই ধরণের ঠাট্টা তামাসা সকলের সব সময় ভাল লাগে।'

নীলা গম্ভীর ভাবে বলল, 'না, আমার সে রকম ধারণা নেই। তবে কোন কোন লোকের, কোন কোন সময় খুবই ভালো লাগে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু ঠাট্টার কথা থাক দাদা। বিষ্ণুবাবুর জন্যে সুজাতাকে তুমি অনুরোধ করতে পারবে না, কি করতে চাও না সেকথা আলাদা, কিন্তু পারা একেবারে উচিতই নয়, এমন কথা অত জোর ক'রে তুমি বলতে পার না।'

অসিত রুক্ষস্বরে বলল, 'কেন পারব না শুনি? প্রত্যেকেরই একটা প্রিন্সিপ্‌ল্ আছে। আমি আমার সেই প্রিন্সিপ্‌ল্ মেনে চলি।'

নীলা একটু বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল, 'সে কথা অবশ্য ঠিক। তবে সে প্রিন্সিপ্‌ল্‌টা নিজের বেলায় একরকম আর অন্য লোকের বেলায় অন্য রকম।'

অসিত বলল, 'তার মানে?'

নীলা জবাব দিল, 'মানেটা সোজা। তোমার নিজের চাকরির বেলায় মেয়েদের সাহায্য যে তুমি নাওনি একথা তুমি হলফ ক'রে বলতে পার না। সাধ্যমত মাও তোমাকে সাহায্য করেছে, সুজাতাও যে একেবারে না করেছে তা নয়। বিষ্ণুবাবুর মত নিজে যদি তুমি কোন দিন অমন বিপদে পড় তাহ'লে ফের তোমাকেও হয়ত ভিখারী শিব সেজে সুজাতার দোরে গিয়ে হাত পাততে হবে। কিন্তু পরের জন্যে অতখানি করা যায় না, অতখানি পারা যায় না। সেই কথাটুকু স্বীকার করলেই সব গোলমাল মিটে যায়।'

বলতে বলতে নীলা ঠোঁট টিপে একটু হাসল, 'ওসব বড় বড় কথা আউড়ে লাভ নেই দাদা। নিজের মনের কাছে নিজে যত পরিষ্কার থাকা যায় ততই ভালো।'

নীলার কথা শুনে খানিকক্ষণ স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে বসে রইল অসিত। তার এই ছোট বোনটির দৃষ্টি বড় বক্র। সে মানুষের সব কিছু যাচাই করে নিতে চায়। মানুষের শুভ বুদ্ধি সদুদ্দেশ্য ও মর্যাদাবোধের মধ্যেও নীলা অনেক মেকি জিনিস আবিষ্কার করে। ওর যুক্তি বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য আছে। সে কথা অসিত অস্বীকার করে না। কিন্তু যুক্তির তীক্ষ্ণতাই কি সব? যদি মায়া মমতা, সহানুভূতিই না থাকল ওর মনে তাহলে শুষ্ক যুক্তির পথ ওকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে কে জানে। অসিত বারবার নিজের মনকে যাচাই করে দেখল। কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করতে পারল না বিষ্ণুবাবুর ওপর তার কর্তব্যের ত্রুটি হয়েছে। সুজাতার কাছে এই নিয়ে আবেদন নিবেদন করতে যাওয়ার প্রস্তাবে কিছুতেই তার মন সায় দিল না। তার পৌরুষে আর সম্ভ্রমবোধে বাধল। অসিতের মনে হোল আসলে নীলাও ব্যাপারটা সমর্থন করে না; শুধু তাকে চটাবার জন্যে, জব্দ করবার জন্যেই অমন তর্ক করেছে।

বিষ্ণুবাবু কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন না। বসে থাকবার তাঁর জো ছিল না। ব্যাঙ্কের চীফ একাউন্ট্যান্ট শ্রীপতি ভট্টাচার্য থাকেন মধু বোস লেনে। বিষ্ণুবাবু সেই রাত্রেই তাঁর বাসায় গিয়ে উপস্থিত হ'লেন।

ডাক শুনে শ্রীপতিবাবু তাঁর দোতলার ঘর থেকে নিচে নেমে এলেন। রাস্তার ধারের ঘর খানিতে একধারে তক্তপোষ পাতা। তার ওপর শ্রীপতি বাবুর ছোট ভাই ভূপতি দুটি ছেলেকে পড়াচ্ছিল। বিষ্ণুবাবুকে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকলেন শ্রীপতিবাবু। দেয়াল ঘেঁষে তিনখানা চেয়ার পাতা রয়েছে। তার একখানির দিকে চেয়ে বললেন, 'বোসো। কী ব্যাপার হে বিষ্ণু। এত রাত করে যে।'

শ্রীপতিবাবু ব্যাঙ্কের বহুদিনের পুরোন কর্মচারী। সুরপতিবাবুর ব্যাঙ্কের

সেই স্কুল থেকে আছেন। মাইনে ও পদমর্যাদায় দু'তিন জন তাঁর ওপরে চলে গেলেও শ্রীপতিবাবু ব্যাঙ্কে একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে রয়েছেন। এই একান্ত বিশ্বস্ত আর অনুগত কর্মচারীটিকে সুরপতি বাবু খুবই প্রীতির চোখে দেখেন। তখনকার আমলের অনেক পুরোন কর্মচারীকেই তিনি নানা অজুহাতে ব্যাঙ্ক থেকে সরিয়ে দিয়েছেন কিন্তু শ্রীপতিবাবুর আসন অটুট রয়েছে। এখনো সুরপতিবাবু শ্রীপতি ভটচাযের সঙ্গে বৈষয়িক অবৈষয়িক নানা ব্যাপারে পরামর্শ করেন। বাড়িতে কোন কাজ-কর্ম হলে সেখানে সব চেয়ে আগে শ্রীপতিবাবুর ডাক পড়ে। ব্যাঙ্কে তাঁর প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি সম্বন্ধে কারো মনেই কোন সন্দেহ নেই। ক্ষমতা আছে শ্রীপতি-বাবুর। কিন্তু সেই ক্ষমতা তিনি যত্রতত্র ব্যবহার করেন না। সাধারণ অনুনয় বিনয়ে তাঁর মন গলে না। এদিক থেকে নির্মম নিষ্ঠুর বলে খানিকটা অখ্যাতি আছে শ্রীপতিবাবুর। সবাই বলে সুরপতির অনুকরণে অনেকটা তাঁর ছাঁচে ঢেলে নিজেকে তিনি তৈরী করে নিয়েছেন। সুরপতির মত অতটা ভয় তাঁকে কেউ না করলেও সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলে। পারতপক্ষে কেউ তাঁর কাছে ঘেঁষে না।

বিষ্ণুবাবুও যতদূর সম্ভব তাঁকে এড়িয়েই চলেছেন। এমন বিপদের দিনেও শ্রীপতিবাবুর দ্বারস্থ হবার কথা প্রথম দিকে তাব মনে হয়নি। কিন্তু আজ ভাবলেন ফল হোক আর না হোক একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি কি'। বড় জোর গালমন্দ করবেন বকাবকি করবেন বড়জোর বলে দেবেন 'আমার দ্বারা কিছু হবে না।' তার বেশি তো কিছু বলতে পারবেন না।

পথে আসতে আসতে স্ত্রী সুরবালার পরামর্শও মনে পড়েছে বিষ্ণুবাবুর। সুরবালা বলেছে, 'দেখ বিপদের দিনে অত মান অভিমান তোমার সাজে না।'

মান অভিমানের বালাই বেশি রাখেননি বিষ্ণুবাবু। সম্মান ও সম্ভ্রম ভুলে ছোট বড় সকলেরই হাতে পায়ে ধরাধরি করছেন। কিন্তু স্ত্রীর কাছে সে কথা তিনি স্বীকার করতে পারেন নি। বরং এমন ভাব দেখিয়েছেন

যেন সত্যিই খুব একটা বিচলিত হন নি। যেন দুদিন বাদে চেয়ারম্যান নিজে থেকেই তাঁর মত যোগ্য লোককে ডেকে নেবেন। শুধু তাঁর ভুল ভাঙবার জন্যে কটা দিন অপেক্ষা করতে হবে এই যা। সুরবালা যে স্বামীকে না চেনে না বোঝে তা নয়। যেন তেন প্রকারে চাকরিটা ফিরে পাওয়ার জন্যে স্বামী যে চেষ্টার কসুর করবেন না এ বিশ্বাস তার আছে। তবু এ ব্যাপারে বেশি বলায় দোষ নেই। সুরবালা তাই স্বামীকে বার বার মনে করিয়ে দিয়েছে 'আজ তোমার মান অভিমানের দিন নয়। নিজেদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু চার চারটি ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তো তাকাতে হবে। যেমন করেই হোক ওদের নুনভাতের জোগাড় তো রাখতেই হবে তোমাকে। তুমি যদি না পার তোমার যদি সাহসে না কুলোয় কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে আমি যাই সুরপতিবাবুর বাড়িতে।'

বিষ্ণুবাবু স্ত্রীকে ধমক দিয়ে বলেছেন, 'থামো বেশি বকবক করোনা। ওদের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। তাই বলে মান সম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে—'

মনে মনে ভেবেছেন অন্য কোন উপায়ে যদি ফল না হয় সেই চরম ব্যবস্থা তো আছেই। কিন্তু তাতেই কি কোন সুরাহা হবে—সুরপতি এসব পছন্দ করেন না। এর আগেও দু'একজনে এভাবে চেষ্টা করে দেখেছে সুরপতি তাতে আরো রেগে গেছেন। গালমন্দ ক রে সেই সব কৃপাপ্রার্থীকে বিদায় করেছেন। ফল আরো খারাপ হয়েছে তাতে।

শ্রীপতিবাবুর কথার জবাবে বিষ্ণুবাবু বললেন, 'বড় বিপদে পড়েছি। আপনি তো সব জানেন।'

শ্রীপতিবাবু বললেন, 'না কিছুই জানিনে। তুমি কি কিছু জানিয়েছ যে জানব? আজকাল তোমার বড় সাঙাৎ বড় বন্ধু হয়েছে ছোকরার দল। সিং ভেঙে বাছুরের দলে মিশেছ তুমি। তারা তোমাকে উদ্ধার করবে। কেন করল না উদ্ধার? আমার কাছে আজ এসেছ কেন? যাও তাদের কাছে যাও। দল পাকাও গিয়ে। পাণ্ডাগিরি কর গিয়ে দলের।'

মিনিট পাঁচ সাতের মধ্যে বিষ্ণুবাবু একটি কথা বলবারও সুযোগ পেলেন না। সে চেষ্টাও করলেন না। অপরাধীর মত মাথা নিচু ক'রে রইলেন। শ্রীপতির রূঢ় ভাষার অবিশ্রান্ত বর্ষণ চলল কিছুক্ষণ ধরে। কিশোর বয়সী দুটি ছেলে পড়া ভুলে মাঝে মাঝে তাঁর দিকে তাকাতে লাগল। শ্রীপতি তা লক্ষ্য ক'রে ছেলেদের আর তাদের প্রাইভেট টিউটারকে এক সঙ্গে ধমক দিলেন 'তোরা এদিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে কি দেখছিস শুনি। তোদের পড়া তোরা পড়বি। ওহে মাষ্টার তোমার ছাত্রদের সামলাও দেখি। বলে বলে তো আমি হায়রাণ হয়ে গেলাম।' কানের কাছে এত গোলমাল করলে যে পড়াশুনোর ব্যাঘাত হয় একথা মাষ্টার ছাত্র কারোরই বলবার সাহস হোলো না।

একটুবাদে শ্রীপতিবাবু বিষ্ণুবাবুর দিকে চেয়ে অপেক্ষাকৃত নিচুগলায় এবং শান্ত স্বরে বললেন, যদি বাঁচতে চাও ও সব দলবল ছাড়। একা যাও। একা গিয়ে কর্তার দু' পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাও। অফিসের কাজে ভুল হয়েছে তাতে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়নি। অমনি ভুল অনেকেরই হয়। কিন্তু তুমি কোন আক্কেলে ওই হুজুগে ছোকরাদের সঙ্গে মিশে দল পাকাতে গেলে শুনি? বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে গোল্লায় দিয়েছ? মাথার চুল তো অর্ধেকের বেশি সাদা হয়ে গেছে দেখছি। এত চুল কি বয়সে পাকল না বাঁতে?'

সত্যিই অত বেশি চুল পাকবার মত বয়স বিষ্ণুবাবুর হয়নি। অল্প বয়সে বেশি চুল পাকাটা তাঁদের বংশের নিয়ম। কিন্তু সে কথা স্ত্রীকে বললেও তা ওপরওয়ালা মুরব্বিকে বলবার মত সাহস পেলেন না বিষ্ণুবাবু। শ্রীপতিবাবুর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ গালমন্দ সবই ন্যায্য শাস্তি বলে মাথা পেতে নিলেন।

অনেকক্ষণ পরে শ্রীপতিবাবু এক সময় বললেন, 'আচ্ছা একবার সন্ধ্যার দিকে যেয়ো অফিসে। চেষ্টা ক'রে দেখা যাবে কতটা কি ক'রে ওঠা যায়।

কর্তার মেজাজ তো জানো। আর কারো অনুরোধ উপরোধে কোনো ফল হবে না। যদি কিছু হয় তোমার নিজের কাকুতি মিনতিতেই হবে। চেয়ারম্যান নিজেও তাই চান। যার যা বলবার সে নিজের মুখে বলুক। আমমোক্তারী আর জোট পাকানো তিনি দু'চোখে দেখতে পারেন না।'

শ্রীপতিবাবুর কাছ থেকে এতটা দাক্ষিণ্যও আশা করেন নি বিষ্ণুবাবু। তিনি কিছুটা ভরসা নিয়েই বাসায় ফিরলেন।

দু'দিন বাদে অফিসের সবাই অবাক হয়ে দেখল বিষ্ণুবাবু আবার তাঁর নিজের উঁচু চেয়ারটিতে লেজার খুলে বসেছেন। গম্ভীর রাশভারি মুখের ভঙ্গি। বিষ্ণুবাবুর মুখখানাও যেন চেয়ারম্যান চীফ একাউণ্ট্যাণ্টের ছাচে ঢালাই হয়ে এসেছে। কোন সহকর্মীর দিকে আর তাকাচ্ছেন না বিষ্ণুবাবু। যেন কারো সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয় নেই। অসিত আর শ্যামলের সঙ্গে যতবার চোখাচোখি হোল ততবারই তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন। কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তাঁর। কারো কৌতুহল মিটাবার জন্য তার বিন্দুমাত্র গরজ নেই।

মেয়ের জন্মদিনে সুরপতি প্রতিবছরই নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করেন। মেয়ের বন্ধুদের বলবার ভার অবশ্য তার ওপরই ছেড়ে দেন। এবারও তাই দিলেন। সুজাতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার বন্ধুদের মধ্যে যাকে যাকে বলবে আগে থেকেই বলে রেখ বুলু। দেখ যেন কেউ বাদ না পড়ে।'

সুজাতা হেসে বলল, 'সেজন্য তোমায় ভাবতে হবে না বাবা। আমার বন্ধুরা তো তোমার বন্ধুদের মত অগুণতি নয়। দু' একজন যা আছে পাড়ার মধ্যেই আছে। কিন্তু বাবা—'

'থামলে কেন, বল।'

সুজাতা বলল, 'আমি বলছিলাম কি যে এবার আর ওসব আড়ম্বর অনুষ্ঠানের দরকার নেই। এবার ইচ্ছে করছে জন্মদিনে চপচাপ বাড়িতে

বসে থাকি। না হয় বাইরে কোথাও গিয়ে দিনটা একা একা কাটিয়ে আসি।'

রবিবারের বিকাল। খোলা বারান্দায় ইজি চেয়ারে ঠেস দিয়ে চুরুট টানতে টানতে মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন সুরপতি। চোখ ছিল সামনের লনটির দিকে। কিন্তু সুজাতার কথার ভঙ্গিতে তিনি হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন। মেয়ের দিকে তাকিয়ে একটু চড়া গলায় ডাকলেন, 'বুলু।'

সুজাতা বিস্মিত হয়ে মুখ তুলল, 'কী বলছ বাবা।'

সুরপতি বললেন, 'আমাকে একটা কথা সত্যি ক'রে বলবি?'

সুজাতা বলল, 'তোমার কাছে কোন কথাই কি মিথ্যে করে বলি বাবা। তার কি জো আছে।'

সুরপতি অধীর হয়ে বললেন। 'ও সব কথার মার প্যাঁচ আমার ভালো লাগে না। আমি যা জিজ্ঞেস করছি তার স্পষ্ট জবাব চাই কেন তুই এমন করে বেড়াচ্ছিস বল তো। মুখে হাসি নেই, মনে স্ফূর্তি নেই, কারো সঙ্গে মিশবিনে। একি স্বভাব হচ্ছে তোর। কেন এমন যৌবনে যোগিনী হয়ে থাকবি তুই? তোর কিসের অভাব?'

সুজাতা মৃদু হাসল, 'আমার কোন অভাব নেই বাবা। সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

সুরপতি ধমক দিয়ে উঠলেন, 'না, আমাকে ভাবতে হবে কেন? ভাববে এসে বুঝি পাড়ার আর পাঁচজন! আমি জানি তোর কিসের অভাব।'

সুজাতা এবার একটু কৌতুক বোধ করল, 'জানো না কি? বল দেখি।'

সুরপতি হাসলেন না গম্ভীরভাবে বললেন, 'তোর মত বয়সের মেয়ের এমন চুপচাপ নিষ্কর্মা থাকা উচিত নয়।'

সুজাতা বলল, 'বাঃ রে আমি কি নিষ্কর্মা থাকতে চেয়েছি? আমি তো বলেইছিলাম, বাড়িতে বসে বসে আমার আর সময় কাটতে চায় না। আমাকে স্কুলে চাকরিটা নিতে দাও বাবা। তা তুমিই তো দিলে না। এতদিনে হেডমিস্ট্রেস হয়ে যেতে পারতাম।'

সুরপতি বললেন, 'দরকার নেই তোমার হেডমিস্ট্রেস হয়ে। যারা সময় কাটাবার জন্যে কাজ নেয় তাদের দিয়ে কাজ হয় না। তারা সখ মেটাতে আসে সখ মিটিয়ে যায়। সত্যিকারের কাজ তারাই করতে পারে যাদের কাজ না করলে চলে না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাদের পেটের ভাত জোগাড় করতে হয়, কাজ যা করবার তারাই করে। এই জন্যেই তোমাকে আমি কোন চাকরি বাকরিতে ঢুকতে দিইনি। তাতে তোমারও সময় নষ্ট ; যেখানে কাজ করতে হবে তাদেরও কোন লাভ নেই।'

সুজাতা একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বলল, 'তাহলে কি সারাজীবন এমনি বিনা কাজেই কাটবে?'

সুরপতি জবাব দিলেন, 'বিনা কাজে কাটবে কেন? মাষ্টারী আর কেরাণীগিরি ছাড়া কি সংসারে আর কোন কাজ নেই? ঘর সংসারের কাজ কর। তোমার বয়সে মেয়েদের পুরো একটা সংসারের মধ্যে থাকা দরকার, যে সংসাবে মেয়েদের স্বামী আছে, ছেলে মেয়ে আছে সেখানে তার কাজের অভাব নেই। সেখানে সময় কাটাবার ভাবনা তাকে ভাবতে হয় না।'

সুজাতা বলল, 'কিন্তু স্বামী আর ছেলেমেয়ে থাকলেই কি সংসারে সকলের কাজ থাকে বাবা? আমাদের পাড়ার ডাঃ সেনের স্ত্রী মিসেস সেনকেই দেখ না। নিজের সংসারে তিনিও তো কোন কাজ খুঁজে পান না। সব ঝি চাকরেরাই সারে। তিনি সিনেমা দেখেন, ব্রীজ খেলেন, পার্টিতে যান, তবু তাঁর সময় কাটতে চায় না।'

সুরপতি চটে উঠে বললেন, 'কিন্তু মিসেস সেনদের সংখ্যা কজন, শুনি? ও যার যার অভ্যেস, স্বভাব। কুঁড়ে মেয়েমানুষ শুধু বড়লোকের ঘরে নেই, গরিবদের ঘরেও আছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলেন। খানিক বাদে সুজাতা উঠতে যাচ্ছিল, সুরপতি তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'বোসো বুলু তোমার সঙ্গে আরো কথা আছে।'

সুজাতা ফের বসে বলল, 'কি কথা বাবা।'

সুরপতি একটু লঘু কোমল সুরে বললেন, 'এবার তোমার মন স্থির ক'রে ফেল, আমি দিন স্থির করি। অবনীর বাবা বিরাজ বাবু অধীর হয়ে উঠেছেন। তার শরীরও ভালো যাচ্ছে না। ষাটের ওপর বয়স হয়েছে। হার্টের রোগী। কখন কি হয় বলা যায় না। ওর ইচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফেলেন। অবনীও তাই চায়। ব্যাপারটাকে কেউ আর এমন ক'রে ঝুলিয়ে রাখতে চায় না।'

সুজাতা একথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। এবার সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আলো জ্বলে উঠেছে রাস্তায়। চাকর নীলাম্বর এসে এদিকের আলোগুলি জ্বেলে দিয়ে গেল, কিন্তু সুজাতার মনে হোল খানিকক্ষণ এই পাতলা আঁধারে বসে থাকতে পারলে যেন ভালো হোত। এত কড়া আলো চোখে সব সময় যেন সহ্য হয় না। এই আলো মনের নিভৃত কোণে যেন অকস্মাৎ গিয়ে অনধিকার প্রবেশ করে।

একটু চুপ করে থেকে সুজাতা বলল, 'আর এককাপ চা খাবে বাবা? যাই তোমার জন্যে চা ক'রে নিয়ে আসি।'

সুরপতি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'না, না। চায়ের আমার এখন দরকার নেই। তোমাকে যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও।'

সুজাতা মৃদু স্বরে বলল, 'আমাকে আরো কিছুদিন সময় দাও বাবা।'

সুরপতি বললেন, 'আরো সময়? তোমাকে দু'বছর ধরেই তো সময় দিচ্ছি। এর আবার সময় অসময়ের আছে কি? পাত্র ঠিক হয়ে আছে, কথাবার্তা ঠিক হয়ে আছে, মেলামেশা মাখামাখির কিছুরই আর বাকি নেই। বাকি শুধু বিয়ে। শুধু পিঁড়িতে বসে পুরুত ডেকে কয়েকটা মন্তর আওড়ানো। এইটুকু সময় তোমার আর এর মধ্যে হয়ে উঠল না?'

সুরপতির ভাষা ক্রমেই রূঢ় হ'য়ে উঠতে লাগল। কিন্তু সুজাতা তাতে বিস্মিত হোলো না। বাবার স্বভাব সে ছেলেবেলা থেকে জানে। মেজাজ

বিগড়ে গেলে তাঁর মুখের ঠিক থাকে না। সভ্য শিক্ষিত নাগরিকের ভাষা থেকে অতি সহজেই তিনি প্রাকৃত ভাষায় নেমে আসেন।

মেয়েকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে সুরপতি ফের বললেন, 'বাধাটা কী। আটকাচ্ছে কোথায় তাই বল তো আমাকে। এতো আর ঘটকালি করা বিয়ে নয়। তোদের মধ্যে আগে থেকেই আলাপ হয়েছে। দুজনে দুজনের গুণাগুণ জেনেছিস। এখন ফের দোমনা হচ্ছিস কেন। অবনী যে তোকে ভালোবাসে তাতে তো আর কোন সন্দেহ নেই।'

আগে সুরপতি এসব প্রসঙ্গ পাড়লে সুজাতা লজ্জিত হোত। বাবাব মুখে কি এসব কথা মানায় ?

কিন্তু শুনে শুনে সুজাতার সংকোচ এখন আর তেমন নেই। দরকার হলে বাবা তার সঙ্গে সবরকম আলোচনা করেন, না করে উপায় কি। বাড়িতে থাকবার মধ্যে আর আছেন শুধু দূর সম্পর্কের বিধবা কাকীমা। সেকেলে চাল চলনে অভ্যস্ত। ভাসুরের সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলেন না, ঘোমটা টেনে চলা ফেরা করেন। সুজাতার সঙ্গেও যে তার মনেব কথার তেমন বিনিময় হয় তা নয়। শিক্ষা দীক্ষা রুচি সব বিষয়েই দুজনের মধ্যে গভীর পার্থক্য। তাই বাপ আর মেয়ের মধ্যে প্রায় খোলা-খুলি ভাবে সব রকম আলোচনা চলে।

মেয়েকে নীরব দেখে সুরপতি আর একবাব জিজ্ঞেস করলেন, 'তেমন সন্দেহের কোন কারণ নেই। অবনী যে তোকে ভালোবাসে এ একেবারে নিশ্চিত কথা।' সুজাতা হঠাৎ বলে উঠল, 'তার চেয়েও বেশি ভালোবাসে তোমার সম্পত্তিকে, তোমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্সকে। তোমার যদি টাকা না থাকত বাবা আমার দাম তার কাছে কাণাকড়ির চেয়ে বেশি হোত না।'

সুরপতি স্থিরদৃষ্টিতে মেয়ের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এ তোমার অত্যন্ত অন্যায় কথা বুলু। অবনীর সঙ্গে পরিচয় আমাদের আজকের নয়। তাকে আমি চিনি। সে শুধু অর্থলোভে তোমাকে ভালোবাসে এমন মিথ্যে অপবাদ আমি তার নামে কিছুতেই দিতে পারব

না। ধন সম্পত্তি কে না চায়। কিন্তু তাই তার একমাত্র চাওয়া নয়। জানিনে অবনীর ওপর এমন ধারণা তোমার কোত্থেকে এলো। কিন্তু এ তোমার একেবারে ভুল ধারণা।'

সুজাতা একথার কোন জবাব দিল না।

সুরপতি বললেন, 'যদি বিয়েতে তোমাদের আরো দেরি হয়, তাহলে এই ভুল বোঝাবুঝি আরো বেড়ে যাবে। আমরাই ভুল হয়েছে, অনেক আগেই জোর করে তোমার বিয়ে দেওয়া আমার উচিত ছিল।'

সুপপতির গলার স্বরে চাপা রাগ আর অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠল।

আরো কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর সুজাতা এক সময় উঠে পড়ল। উঠে এসে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ঢুকল সুজাতা। কাকীমা অরুপমা কখন এসে আলো জেলে দিয়ে গেছেন, কিন্তু এ মুহূর্তে আলোটা কিছুতেই যেন সহ্য হতে চাইল না সুজাতার। সুইচটা অফ্ করে দিয়ে চেয়ারখানা টেনে নিয়ে জানালার কাছে এসে বসল। সেদিনের সেই ঘটনাটার কথা আজও সে ভুলতে পারছে না।

সুজাতার জীবনের সঙ্গে সেই ছোট ঘটনাটুকুর এমন কি যোগ আছে যে কদিন ধ'রে তার মন কেবলি তা নিয়ে নাড়চাড়া করছে!

ব্যাপারটা ঘটেছিল সেদিন বীথিকা সেনের বাড়ি। ঘটনাটা অবশ্য সেদিনের নয়। বছর পাঁচেক আগেকার। শুধু তার ইতিবৃত্তটুকু সুজাতা সেদিন শুনতে পেয়েছিল।

যাত্রীসঙ্ঘের সেদিন বৈঠক ছিল বীথিকা সেনের বাড়িতে। সভ্য সভ্যাদের কয়েকটি গল্প পাঠের পর তা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা চলল। ছেলেরা মেয়েদের লেখার নিন্দা করল, পাণ্টা জবাবে মেয়েরা বলল ছেলেদের গল্পগুলি একেবারেই কিছু হয় নি। তর্কে বিতর্কে রাত বেড়ে চলেছিল, বোধহয় শেষই হয়ে যেত যদি না প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা ক'রে বীথিকাদি সকলের মুখ বন্ধ ক'রে দিতেন।

সবাই কথা বলছিল, হৈ চৈ করছিল শুধু একটি মেয়ে চুপচাপ এক কোণে

বসেছিল আর থেকে থেকে সুজাতার দিকে তাকাচ্ছিল। সেই দৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু ছিল যার জন্যে বার বার অস্বস্তি বোধ করছিল সুজাতা। কি আছে সেই দৃষ্টিতে। নতুন পরিচয়ের কৌতুহল না অন্য কিছু সুজাতা ভেবে পাচ্ছিল না। সভার প্রথমে বীথিকাদি অবশ্য এই নবাগতার সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, 'মাধুরী ভট্টাচার্য। ফুলতলা গার্লস স্কুলে টিচারী করেন। সাহিত্য, সংস্কৃতির ব্যাপারে খুব উৎসাহ আছে।'

সুজাতার মতই বয়স, তেইশ চব্বিশ। কি দু' এক বছর বেশিও হতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ মেয়েটি সভায় ছিল উৎসাহব্যঞ্জক কোন লক্ষণ তার চোখে মুখে দেখা যায়নি, লুকিয়ে লুকিয়ে শুধু সুজাতার দিকে তাকানো ছাড়া। অমন করে এতদিন ছেলেরাই তাকিয়েছে। তার অর্থ বুঝতে সুজাতার দেরি হয়নি, কিন্তু মেয়েটির এই দৃষ্টির মানে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিল না সুজাতা আর তা না পেরে তার মন ক্রমেই অস্বস্তিতে ভরে উঠছিল।

বৈঠক শেষ হয়ে যাওয়ার পর দলে দলে সবাই বিদায় নিল। কেবল সুজাতারই যাওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না।

বীথিকা বলল, 'কি ব্যাপার, আজ কি তুমি এখানে থাকতে চাও নাকি ?'

সুজাতা জবাব দিল, 'অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।'

বিথীকা হেসে বলল, 'না ভাই আপত্তি না থাকলেও সাহস নেই, মেসোমশাই তোমার খোঁজে এক্ষুণি এসে পড়বেন।'

সুজাতা বলল, 'আমার ফিরতে দেরি হলে বাবা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েন বটে, কিন্তু ছুটোছুটি করেন না। কিন্তু ওকথা থাক। আমি অন্য একটা বিষয় আপনার কাছে জিজ্ঞেস করব বলে এখানে অপেক্ষা করছি।'

বীথিকা মৃদু হেসে বলল, 'সেটুকু তুমি না বললেও আমি বুঝতে পারতাম। ভূমিকা রেখে এবার আসল কথাটি বল।"

সুজাতা একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'আচ্ছা বীথিকাদি এই মাধুরী মেয়েটি কে?'

বীথিকা মুখ টিপে হেসে বলল, 'তোমার স্মরণশক্তি এত কমে গেল কী

করে সুজাতা। এইতো খানিকক্ষণ আগেও তার নাম পেশার কথা তোমাকে বললাম।'

সুজাতা বলল, 'শুধু নাম আর পেশার কথা শুনলেই কি কাউকে পুরোপুরি চেনা যায়?'

বীথিকা হেসে বলল, 'ওরে বাবা। এত শক্ত শক্ত কথা জিজ্ঞেস করলে আমার মাথা ঘুরে যাবে সুজাতা।'

সুজাতা বলল, 'তাহলে একটা সহজ কথাই জিজ্ঞেস করি। মাধুরী আমার দিকে বারবার অমন করে তাকাচ্ছিল কেন। সে কী দেখেছিল আমার মধ্যে?'

হঠাৎ বীথিকার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল, 'নিজের সতীনকে।'

দুজনেই একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বীথিকা মুখে ফের হাসি টেনে বলল, 'তুমি অমন পাথর বনে গেলে কেন সুজাতা। আমি তোমাকে ঠাট্টা করছিলাম। শঙ্করকে গাড়ি বার করতে বলি। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক আর তোমার দেরি ক'রে কাজ নেই। রাত ন'টা বাজতে চলল।'

সুজাতা বলল, 'তা বাজুক। সব কথা আপনার কাছ থেকে না শুনে আমি আজ কিছুতেই এখান থেকে নড়ব না। কী ব্যাপার, সব আমাকে খুলে বলতেই হবে।'

বীথিকা কিছুই বলবে না, সুজাতাও কিছুতে না শুনে ছাড়বে না। তার জবরদস্তিতে শেষ পর্যন্ত বীথিকাকেই হার মানতে হলো। বীথিকা সংক্ষেপে বলল, 'শুনেছি মাধুরী ভটচাযের সঙ্গে অবনীবাবুর এক সময় আলাপ পরিচয় ছিল। বিয়ের কথাবার্তাও এগিয়েছিল।'

সুজাতা বলল, 'তারপর পিছিয়ে গেল কী ক'রে।'

বীথিকা বলল, 'অবিবাহিত ছেলে মেয়ের মধ্যে এমন কথাবার্তা কত এগোয় কত পিছোয় তার হিসেব কে রাখে বল।'

সুজাতা বলল, 'আর কেউ না রাখলেও মাধুরী রেখেছে বলে মনে হোল। ওর তো এখনো বিয়ে হয় নি।'

বীথিকা বলল, 'না। শুনেছি বিয়ে করবে না বলে ও পণ করেছে। এসব ব্যাপারে ও বড় সেন্টিমেণ্টাল, বড় সেকেলে।'

সুজাতা বলল, 'হুঁ।' তারপর একটু থেমে ফের বলল, 'আচ্ছা বীথিকাদি আমাকে একটা সত্যি কথা বলবেন? ওদের বিয়ের সম্বন্ধ ভাঙল কেন?'

বীথিকা বলল, 'অবনীবাবুর বাবা নাকি কিছুতেই মত ছিলেন না।'

সুজাতা বলল, 'কেন?'

বীথিকা বলল, 'তুমি যে একেবারে উকিলের জেরা আরম্ভ করলে। যতটা শুনেছি দুই পরিবারের আর্থিক সামাজিক অবস্থার ভারি অমিল ছিল তাই। মাধুরীর বাবা ছিলেন সামান্য পোষ্ট মাষ্টার। আর অবনীবাবুদের ধন সম্পদের অসামান্যতার কথা তো তুমি নিজেই জানো।'

সুজাতা আস্তে আস্তে বলল, 'হ্যাঁ, তা জানি। কিন্তু তাই কি সব?'

বীথিকা বলল, 'সব না হলেও অনেকখানি। আমাদের সমাজে বিয়ে মানে তো একটি পরিবারের সঙ্গে আর একটি পরিবারের কুটুম্বিতা। সে দুটি পরিবার যদি বিত্তে প্রতিপত্তিতে এক রকম না হয় তাহলে তাদের মিল হবে কি ক'রে।'

সুজাতা বলল, 'কিন্তু অবনী বাবু কেন সুবোধ ভালো ছেলের মত তাঁর বাবার মত মেনে নিলেন? যে মেয়েকে ভালোবাসেন সে মেয়েকে শুধু বাপের নিষেধে বিয়ে করলেন না? আজকালকার ছেলেরা কি এমনি ব্যক্তিত্বহীন?'

বীথিকা একটু হাসল। 'তুমি মিছি মিছি রাগ করছ সুজাতা। অবনী বাবুর বাবা কি যে সে বাবা যে তাঁর কথা তিনি না মেনে পারেন? তুমি পার তোমার বাবার কথা অগ্রাহ্য করতে?'

সুজাতা মৃদু স্বরে বলল, 'তা ঠিক।'

বীথিকা সুজাতাকে গাড়িতে করে বাড়ি পর্যন্ত সেদিন এগিয়ে দিয়েছিল। ফিরে আসার সময় বলেছিল, 'এ সব নিয়ে মন খারাপ কোরো না সুজাতা। আর দোহাই তোমার এ নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা

করতেও যেয়ো না। আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। তুমিই কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বের করলে। কিন্তু সাপের চেহারা দেখেই বুঝতে পারছ এ সাপ একেবারে মরা সাপ। তোমার কোন ভয় নেই।'

সুজাতা একটু হাসল, 'ভয়! ভয় আমার কিছুতেই নেই বীথিকাদি।'

বীথিকা বলল, 'অবশ্য পিতৃভক্ত হওয়ার ফল অবনী বাবুর বেলায় আরো এক দিক থেকে ভালোই হয়েছে। সেদিন যদি গোয়ার্তুমি করে বিয়ে করে বসতেন তাহলে ঠকতেন। তোমার মত রত্ন তাঁকে আর লাভ করতে হোত না।'

সুজাতা বলল, 'রত্ন! কিন্তু সে রত্ন তো তাঁর হাতে গিয়ে এখনো পৌছায় নি।'

বীথিকা বলল, 'ওই হোলো। হাতের মুঠিতে না হোক হাতের নাগালের ভিতর তো পেয়েছেন। এবার তোমরা বিয়েটা ক'রে ফেল সুজাতা আর দেরি কোরো না।'

সুজাতা বলল, 'অনেক ধন্যবাদ বীথিকাদি।'

সুজাতার গলার স্বরে একটু শ্লেষ ছিল তা বীথিকার কান এড়াল না।

বীথিকা তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি যদি এ নিয়ে মন খারাপ করো সুজাতা আমি সত্যি বড় দুঃখ পাব। এসব অনেকদিন আগেকার কথা। চার পাঁচ বছর হোল। তারপর অবনীবাবু সমুদ্র পারাপার করেছেন। কাল-সমুদ্রও এতদিনে সব ধুয়ে মুছে ফেলেছে।'

সুজাতা একথার কোন জবাব দিল না। মনে মনে ভাবল সব যে মুছে যায়নি তার প্রমাণ মাধুরীর চোখ, আর সে চোখের দৃষ্টি।

এরপর অবনীর সঙ্গে দু'দিন দেখা হয়েছে। ব্যাঙ্কের কাজ সেরে অবনী চলে এসেছে সুজাতাদের বাড়ি। চা খেয়েছে, গল্প করেছে। ভুলেও বিয়ের কথা তোলেনি। অসীম ধৈর্য অবনীর। সুজাতার বারবার ইচ্ছা হয়েছে মাধুরীর কথাটা অবনীকে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু কিসের একটা

সংকোচ তার মুখ চেপে ধরেছে। অবনী যদি নিজে সে সব কথা বলবার প্রয়োজন বোধ না করে থাকে সুজাতারই বা এমন গরজ কিসের। তাছাড়া তাদের সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠই হোক সামাজিক ভদ্রতা, শোভনতার নিয়ম কানুনগুলি তাকে মেনে চলতেই হবে।

সুজাতার ইচ্ছা ছিল না এবারকার জন্মদিনে কোনো আড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। তার মন এসব ব্যাপারে যেন আর কিছুতেই সাড়া দিচ্ছেনা। কিন্তু সুরপতি কিছুতেই ছাড়লেন না। বললেন, 'বছরে এই একটি মাত্র দিন আমার আনন্দ আহ্লাদের জন্যে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আসে গল্প গুজব করে তাও তোর সহ্য হয়না ?'

সুজাতা বলল, 'বেশ তো অন্য কোন উপলক্ষে ওসব কর। জন্মদিনের উৎসব অল্পবয়সীদের আর বুড়ো বয়সীদের মানায়। আমাদের বয়সীদের এসব সাজে না, বেশ তো এরপর থেকে তোমার জন্মদিনেই এসব অনুষ্ঠান হোক।'

সুরপতি ছদ্ম কোপে বললেন, 'তুই আমাকে বুড়ো বললি বুঝি।'

সুজাতা হেসে বলল 'বালাই, বুড়ো হতে যাবে কোন দুঃখে। কিন্তু হেসে উড়িয়ে দিলে চলবে না বাবা সামনের বার থেকে আমরা সত্যিই তোমার জন্মদিন করব।' সুরপতি বললেন, 'দাঁড়া চুলগুলি আরো ভালো ক'রে পাকুক, দাঁতগুলি পড়তে আরম্ভ করুক! তারপর ওসব শুরু করা যাবে।'

শেষপর্যন্ত বাপ আর মেয়ের মধ্যে আপোষ হয়ে গেল। সুজাতার জন্মদিনে সুরপতি তাঁর অল্পসংখ্যক বন্ধুদের বলবেন বটে কিন্তু মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষেই যে বলছেন সে কথা কাউকেই জানাবেন না। জানলে সবাই কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসবেন। এখন তো আর ছোট মেয়ে নেই সুজাতা। তাই এ ধরণের অনুষ্ঠানে কারো কাছ থেকে উপহার নিতে বড় সংকোচ বোধ হয় তার। তা তিনি বাবার বন্ধুই হোন আর নিজের বন্ধুই হোন।

সুরপতি বললেন, 'আমি তো কাউকে তোর জন্মদিনের কথা বলিনে। বছর বছর শুধু এই দিনটিতে তাদের আসতে বলি। কিন্তু উপলক্ষটা তারা কি করে যেন মনে রাখে। তার জন্যে কেউ কিছু না কিছু নিয়ে আসতে ভোলে না।

সুজাতা বলল, 'সেই জন্যেই তো তোমাকে বলি বাবা তোমার বন্ধুদের খাওয়ার তারিখটা বদলাও। একুশে অগ্রাণটা বাদ দিয়ে ক্যালেণ্ডার থেকে আর যে কোন একটা তারিখ বেছে নাও, তাহলে উপহারের হাঙ্গামা আর পোহাতে হবে না।'

সুরপতি বললেন, 'আচ্ছা সে যা হয় পরের বছর দেখা যাবে।'

বেছে বেছে যাত্রীসঙ্ঘের কয়েকজনকে বলল সুজাতা। এ পাড়ায় যে সব খ্যাতিমান বিত্তবান রয়েছেন, বিশেষ করে যাঁরা ব্যাঙ্ক ইন্‌সিওরেন্স ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তাঁদের সঙ্গে সুরপতির ঘনিষ্ঠতা। যাঁর সঙ্গে সুরপতির বন্ধুত্ব তাঁর বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে সুজাতার তেমন অন্তরঙ্গতা না থাকলেও, সামাজিক শিষ্টাচার বজায় রাখবার জন্যে তাঁদের নিমন্ত্রণ করে আসতে হোল। এই উপলক্ষে আর একজনের কথা মনে পড়ে গেল সুজাতার। অসিত। কিন্তু অসিতকে না ডাকলে সে আর আসে না। সে যদি সুজাতার বন্ধুত্ব স্বীকারই করবে তাহলে একবারও কি সে নিজে থেকে খোঁজখবর নিতে পারত না? তাকে ডেকে দরকার নেই সুজাতার। সে যদি সাধারণ সৌজন্য শিষ্টাচারের সম্পর্কটুকু ও না রাখতে চায় তাহলে সুজাতারই বা কি এমন দায় পড়েছে যে সে বারবার যেচে তাকে ডাকতে যাবে?

কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রতিজ্ঞা টিকিয়ে রাখতে পারল না সুজাতা। অসিতকে আসতে বলে দু'লাইনের একখানা আমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে তবে সে স্বস্তি পেল। সে চিঠিতে কোন উপলক্ষের কথা লিখল না শুধু লিখল অসিত যদি বুধবার দিন সন্ধ্যার পর সুজাতাদের বাড়িতে একবার বেড়াতে আসে তাহলে তারা বড়ই খুশি হবে। ওদিন খাওয়ার নিমন্ত্রণও রইল অসিতের।

অবনীকে বিশেষ ভাবে বললেন সুরপতি। তিনি অনুমান করেছিলেন অবনীর সঙ্গে সুজাতার ঝগড়ার পালা চলেছে। এবয়সে অতি সামান্য কারণে বড় উল্টো পাল্টা হাওয়া বয়। জোয়ার ভাঁটার কোন সময় ঠিক থাকে না। অভিভাবক হিসেবে সুরপতিকেই সব দিক সামলে নিতে হবে। যদি সুজাতার মা বেঁচে থাকত তাহলে এদিকে সুরপতির কোন দায়িত্ব থাকতনা। কিন্তু সে অকালে মারা যাওয়ায় ঘরে বাইরের সবরকম কাজের চাপ তাঁর ঘাড়ে এসে পড়েছে।

একুশে অগ্রহায়ন ভোরবেলা থেকেই বাড়ির চাকর বাকরের দল ব্যস্ত হয়ে উঠল। সুরপতি প্রতিপদে তাদের ধমকাতে শুরু করলেন। একাজ হচ্ছে না, ও কাজে দেরি হচ্ছে, সুরপতির বিরক্তির আর সীমা নেই।

সুজাতা একবার এসে হেসে বলল, 'আজও যদি তুমি ওদের অমন ধমকাও বাবা তাহলে এ দিনটির কোন মাধুর্যই থাকবে না। নিজেদের খুশিমত ওদের কাজ করতে দাও দেখবে সময়মত সবই হয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর থেকে অভ্যাগতরা আসতে শুরু করলেন। সুরপতি নিজে তাঁদের অভ্যর্থনা করে ড্রয়িংরুমে নিয়ে গেলেন। প্রত্যেকের পারিবারিক কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে হাসিমুখে রসিকতা করলেন। বাবার এই প্রসন্ন সরস ব্যবহার দেখে সুজাতা নিজেই যেন অবাক হয়ে গেল। নিজের জন্মদিনের অনুষ্ঠানটিকে যদি কিছু মাত্র ভালো লেগে থাকে সুজাতার তা এই জন্যেই। বাবার প্রসন্ন মন এমন আর বছরের অন্য কোন দিন সে দেখতে পায়না।

সুরপতির বন্ধু মেজর দত্ত এক সময় জিজ্ঞেস করলেন, 'কই অবনীকে দেখছিনে তো, সে কোথায়?'

সুরপতিও তার জন্যে মনে মনে উদ্বেগ বোধ করছিলেন। মেয়েটা কি তাকে তেমন করে বলেনি? বুলুর বয়স বাড়ছে কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান বাড়ছে না।

মেজর দত্তের জবাবে মুখে হাসি টেনে বললেন, 'বোধহয় অফিসের কাজ সেরে বেরুতে দেরি হচ্ছে। কাজ থাকতে অবনীর আর কোন দিকে খেয়াল থাকে না।'

মেজর দত্ত বললেন, 'ঠিক আপনার মতই হয়েছে। শ্বশুরের উপযুক্ত জামাইই হবে। কিন্তু শুভকাজটি এবার সেরে ফেলুন। এ সব ব্যাপার এমন করে ঝুলিয়ে রাখা তো কাজের কথা নয়।'

মেজর দত্তের সঙ্গে এডভোকেট মজুমদার আর অধ্যাপক সেহানবীশও সায় দিলেন।

সুরপতি গম্ভীর মুখে বললেন, 'হ্যাঁ, আমারও তাই ইচ্ছে। অঘ্রাণ তো গেলই, পৌষে তো এসব কাজ চলেই না, ভেবেছি মাঘের প্রথমেই—'

মেজর দত্ত বললেন, 'খুব ভালো কথা। মাঘ খুব প্রশস্ত মাস। ও সময় খেয়ে আর খাইয়েও বেশ আরাম।' কথা শেষ করে সশব্দে হেসে উঠলেন মেজর দত্ত।

কেউ কেউ এরই মধ্যে ঘড়ি দেখতে শুরু করেছিলেন। এদের প্রত্যেকেরই অন্য কাজ, অন্য দরকার রয়েছে। ইঙ্গিত বুঝে সুরপতি তাঁদের খেতে দেওয়ার কথা বললেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করলেন বন্ধুদের। ঠিক এই সময় অবনীও এসে পৌছল।

সুরপতি অপ্রসন্নভাবে বললেন, 'এত দেরি করলে যে '

অবনী লজ্জিত ভাবে বলল, 'একটু দরকার ছিল।'

ওর মুখের ভঙ্গি দেখে সুরপতির বুঝতে বাকি রইল না যে সে দরকার ব্যাঙ্কের জন্যে নয়, তাঁর মেয়ের জন্যেই। মৃদু হেসে বললেন, 'যাও উপরে যাও। বুলু বোধ হয় ওর বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।'

অবনী স্মিতমুখে সুরপতির নির্দেশ মেনে নিল। দোতলার হল ঘরটি একদল মেয়ের কলরবে ভরে উঠেছে। অবনী সেই ঘরের সামনে এসে দাঁড়াতেই সকলের মুখপাত্রী রূপে বীথিকা সেন তাকে আপ্যায়ন করে বলল, 'আসুন মিঃ চ্যাটার্জি আসুন। এত দ্বিধা করছেন কেন।'

অবনী হেসে বলল, 'দ্বিধার কিছু কারণ আছে বইকি। পাছে রসভঙ্গ করি এই ভয়।'

বীথিকা হেসে বলল, 'কিছু ভাবনা নেই, আমরা অভয় দিচ্ছি, আপনি এসে পড়ুন।'

সুজাতাকে পাওয়া গেল আরো ঘণ্টাখানেক বাদে। খেয়ে দেয়ে সবাই বিদায় নেওয়ার পর।

অবনী সুজাতাকে ইসারায় তার ঘরে ডেকে নিল। তারপর পকেট থেকে একটি সুন্দর কেস্ বার করল। কেসের ভিতর থেকে আরো সুন্দর একটি আংটি। তার ভিতরের হীরাটি জ্বল জ্বল করছে।

সুজাতা বলল, 'একি।'

অবনী স্মিত মুখে বলল, 'তোমার জন্মদিনের যৎ সামান্য উপহার। আঙুলে পরিয়ে দিই কি বলো?'

সুজাতা হঠাৎ বলে, উঠল, 'কিন্তু তার আগে আমার একটি কথার জবাব দেবে?'

অবনী বলল, 'কেন দেব না বল?'

সুজাতা বলল, 'মাধুরী ভট্টাচাযকে তুমি চেন?'

অবনী একটু কাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'এক সময় চিনতাম। কিন্তু হঠাৎ তার কথা কেন? তার সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে নাকি?'

সুজাতা বলল, 'হ্যাঁ, কিছুদিন আগে সে আমাদের যাত্রী সঙ্ঘের মেম্বার হয়েছে। কথাটি কি সত্যি যে একসময় মেয়েটিকে তুমি ভালোবেসেছিলে আর তারা গরিব বলেই শেষপর্যন্ত তোমাদের বিয়ে হয়নি?'

অবনী একটু রুক্ষ স্বরে বলল, 'এসব বাজে কথা তুমি কার কাছে থেকে শুনেছ?'

সুজাতা বলল, 'তার চেয়ে বড় কথা কথাটা সত্যি কিনা।'

অবনী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'না পুরোপুরি সত্যি নয়। কিন্তু

এসব আলোচনা আজ থাক। তোমার এতই কৌতূহল হয়ে থাকে বরং আর একদিন সব বলা যাবে।'

সুজাতা আংটির কেসটা হঠাৎ অবনীর পকেটে টুপ করে ফেলে দিয়ে বলল, 'উপহারটাও তাহলে সেইদিনই নেব। এ সব জিনিস তো তোমার হাত থেকে আরো অনেকদিন নিয়েছি। আজ না হয় নাই নিলাম, কী বলো?'

অবনী মুহূর্তকাল স্তব্ধ গম্ভীর হয়ে রইল। অপমানে থম থম করতে লাগল ওর মুখ। একটু বাদে শান্ত স্থির ভাবে বলল, 'বেশ সেই ভালো।'

সেদিন রাত্রে অনেক অনুরোধে উপরোধেও অবনী কিছু খেল না। বলল, 'শরীর ভালো নেই।' একটু পরে সে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

সুরপতি গম্ভীর ভাবে সব দেখাশুনা করলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ তার সেই শান্তি অটুট রাখতে পারলেন না। বাড়ির চাকর বাকরের দল ফের তাঁর অযথা ধমকানির চোটে অস্থির হয়ে উঠল।

পরদিন খুব গম্ভীর মুখ নিয়ে অফিসে ঢুকল অবনী। অবশ্য জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে সে চিরদিনই রাশ ভারি গুরুগম্ভীর প্রকৃতির। শুধু নিম্নতন কর্মচারীরা নয় বাইরের সম্রান্ত পদস্থ ব্যক্তিরাও তার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলতে কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অবনীর দীর্ঘ দৃঢ় দেহ এবং ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক মুখাবয়বের মধ্যে এমন কিছু আছে যা একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

তাই অবনীর রূপান্তর ভাবান্তর অফিসের কারোরই তেমন চোখে পড়ল না। দারোয়ান বেয়ারার দল তাকে দেখে অন্যদিনের মতই সম্রমের সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, উঁচু চেয়ারের লেজার কীপাররা একটু নড়ে চড়ে বসল। কিন্তু এই কর্মক্ষেত্রে এসে অবনীর মন অন্যদিন যেমন প্রসন্ন হয়ে ওঠে আজ কিছুতেই তেমন হতে চাইল না। কিসের একটা বিরক্তি অস্বস্তি আর বিদ্বেষে তার মন ভরে উঠল। আর কারো চোখে ধরা না পড়লেও নিজের কাছে নিজে ধরা দিল অবনী। সে বদলে গেছে। সে যা ছিল তা আর নেই।

কিন্তু মন যত চঞ্চল আর অশান্তই হয়ে উঠুক অফিসের দৈনন্দিন কাজ সে যন্ত্রের মতই করে গেল। টাইপ করা জরুরী চিঠিপত্রগুলিতে সই করল। বাইরে থেকে যে সব পার্টির প্রতিনিধিরা এসেছে তাদের সঙ্গে অন্যদিনের মতই বৈষয়িক কথাবার্তা বলল। তারপর কাজকর্মের চাপ কমে গেলে বিকালের দিকে অবনী হঠাৎ সুরপতিবাবুর ঘরে গিয়ে ঢুকল। তাঁর সামনের চেয়ারটায় বসে বলল, 'আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে '

সুরপতি ছাইদানিতে চুরুটের ছাই ঝেড়ে নিয়ে বললেন, 'বলো।'

অবনী একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমি এই ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে দেব বলে ঠিক করেছি। আপনার সঙ্গে এতদিনেব জানাশোনা। লিখে জানাবার আগে তাই মনে হোল কথাটা আপনাকে একবার বলে নেওয়া ভালো।'

সুরপতি বললেন, 'তা ঠিক, জানাশোনা আমাদের অনেকদিনেরই।' জেনারেল ম্যানেজার এমন একটা গুরুতর সিদ্ধান্তে তাঁর মন যে কিছুমাত্র বিচলিত হয়েছে তা তাঁর মুখ দেখে মোটেই বোঝা গেলনা। তিনি যেন একথার জন্য তৈরী হয়েই ছিলেন।

অবনী বলল, 'আশাকরি আপনি আমাকে ছেড়ে দিতে দেরি করবেন না। আমি দু একদিনের মধ্যেই চার্জ বুঝিয়ে দেব।'

সুরপতি স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। প্রথমে মনে হোল সে দৃষ্টি রুক্ষ বিরক্ত অসন্তুষ্ট। কিন্তু একটু বাদেই তাঁর ঠোঁটে হাসির আভাস ফুটে উঠল। চোখের দৃষ্টিও অনেক শান্ত আর কোমল হয়ে গেল।

সুরপতি স্নেহ-কোমল স্বরে বললেন, 'অবনী তুমি ভারি ছেলে মানুষ, ভারি ছেলে মানুষ।'

অবনী বিস্মিত হয়ে বলল, 'ছেলেমানুষ!'

সুরপতি বললেন, 'ছেলেমানুষ ছাড়া কি, আমি ভেবেছিলাম এত বড় বিদ্বান বুদ্ধিমান বিলাত ফেরৎ ব্যাঙ্কিং বিশেষজ্ঞ মানুষ এর কাছে আমাকে

বোধ হয় ভয়ে ভয়েই থাকতে হবে। কিন্তু তুমি যে আমার মেয়ের চেয়েও বেশি ছেলেমানুষ অবনী, তা আমার জানা ছিল না।'

অবনী বিস্মিত হয়ে বলল, 'এতে ছেলেমানুষীর কী দেখলেন?'

সুরপতি বললেন, 'ছেলেমানুষী নয়? বুলুর সঙ্গে ঝগড়া করে তুমি এই ব্যাঙ্ক ছেড়ে দিতে চাইছ? তোমাদের ঝগড়া একদিন মিটবে। কিন্তু এ অর্গানিজেসন যদি ছেড়ে দাও এখানে আর ফিরে আসবার জো থাকবে না।'

অবনী এতে ভারি অপমানিত বোধ করল, সুরপতির কথার উত্তরে একটু তীব্রতার সঙ্গে বলল, 'আপনি কি ভেবেছেন এ ব্যাঙ্ক ছেড়ে গেলে আমার অন্য কোথাও চাকরি জুটবে না?'

সুরপতি বুঝতে পারলেন কথাটা তিনি বেফাঁস বলে ফেলেছেন। তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নিয়ে কোমল স্বরে মধুর হেসে বললেন, 'তুমি রাগ করছ অবনী, চাকরি ছেডে যে জুটবে তা তুমিও জান আমিও জানি। তোমার মত qualified যুবকের আরো অনেক বড় ব্যাঙ্কে আরো বেশি টাকার চাকরি নিশ্চয় জুটবে। কিন্তু যত বড়ই হোক সে চাকরি চাকরিই।'

সুরপতি একটু থেমে বললেন, 'তুমি তো জানো অবনী এখানে তুমি একজন সাধারণ চাকুরে মাত্র নও। তুমি ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদের একজন। তাছাড়া দু'দিন বাদে এ ব্যাঙ্কে তুমিই আমার জায়গা নেবে। একথা নিশ্চিত জেনেও তুমি কোন মুখে এ অর্গানিজেশন ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তাব করছ।'

অবনী একটুকাল চুপ করে থেকে টেবিলের ওপর দাগ কাটতে লাগল। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বলল. 'কিন্তু আপনি যা ভেবেছেন তা যদি না হয়। যদি আমার পক্ষে সুজাতাকে বিয়ে করা সম্ভব না হয়ে ওঠে।'

সুরপতি স্থির দৃষ্টিতে অবনীর দিকে তাকালেন তারপর দৃঢ়স্বরে

বললেন, 'বিয়ে না হওয়ার কোন কারণ নেই, আমার মনে হয় তোমাদের এই মান অভিমান আর বোঝাবুঝির একদিন নিশ্চয় শেষ হবে। কিন্তু তা যদি নাও হয়, যদি আমার কথার অবাধ্য হয়ে সুজাতা অন্য কাউকে বিয়ে করে তাহলেও এ ব্যাঙ্কে তোমার স্থান কেউ নিতে পারবে না। দেখ অবনী সন্তানকে সবাই ভালোবাসে। বুলু আমাব মেয়ে। আমি তাকে নিশ্চয়ই ভালোবাসি। কিন্তু সে আমার ব্যাঙ্কের চেয়ে বড় নয়। কোন অযোগ্য লোককে সে যদি স্বামী হিসেবে বেছে নেয় তুমি কি ভেবেছ জামাই বলে আমি তাকে ব্যাঙ্কে ঢুকতে দেব? কক্ষনো না।'

অবনী বলল, 'আচ্ছা আপনার কথা আমি ভেবে দেখব।'

সুরপতি অসহিষ্ণু ভাবে বলে উঠলেন, 'এর মধ্যে নতুন করে ভেবে দেখবার আর কিছু নেই অবনী। পুরুষের কাছে মাথাটা বড়, হাত দুখানা বড়, মেয়েদের মত তারা হৃদয়সর্বস্ব নয়, কর্মী হও, খ্যাতিমান হও, অর্থবান হও, নারী তোমার পিছনে পিছনে আপনিই আসবে। যাও অবনী মন দিয়ে কাজ কর গিয়ে। অনেক কাজ পড়ে আছে। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডের ইলেকসনেব দিন এগিয়ে আসছে। এমপ্লয়ীদের এ্যানুয়াল ইনক্রিমেণ্টের ব্যাপারটাও এবার ভালো করে ভেবে দেখতে হবে। কাজের কি অভাব আছে? ওসব বাজে কথা বলবার সময় কই?'

হাত বাড়িয়ে সুরপতি অবনীর কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'যাও সুস্থ মনে কাজ কর গিয়ে। বুলুর জন্যে তোমাকে কিছু ভাবতে হবেনা।' বলে মৃদু হাসলেন সুরপতি। যে হাসির অর্থ অবনীর বুঝতে দেরি হোল না। 'ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে তোমার বিদ্যাবুদ্ধিই থাক এত বড় একটা ব্যাঙ্ক পরিচালনার কাজে তুমি যতই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে থাক এ সব ব্যাপারে তুমি সুরপতির সমকক্ষতার যতই দাবী কর না কেন কিন্তু সুজাতার সামান্য দুটো কথা সামান্য একটু আচরণের পার্থক্য তোমাকে যখন এত অশান্ত আর বিচলিত করতে পারে তখন তোমার বুদ্ধি আর

ব্যক্তিত্ব অনেকখানি নেমে যায়। তোমাকে আর পূর্ণবয়স্ক পুরুষের সম্মান দেওয়া যায় না।'

অবনী আস্তে আস্তে উঠে নিজের কামরায় ফিরে এল। সুরপতির কথার মধ্যে যুক্তি আছে। সত্যিই তো সুজাতার সঙ্গে এই ব্যাঙ্কের চাকরির কী সম্বন্ধ। তার ওপর অভিমান করে কেন অবনী এমন সুযোগ সুবিধা ছাড়তে যাবে? বরং এখানে থেকে যত তার ক্ষমতা আর আধিপত্য বাড়িয়ে নিতে পারবে তত সুজাতার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার শক্তি বাড়বে অবনীর। সুজাতা তার সঙ্গে অনেক টালবাহানা করেছে, তার পৌরুষকে নানাভাবে অপমান করেছে সে সব কিছুর প্রতিশোধ না নিয়ে অবনী বিনাবাক্যে চলে যাবে এমন নির্বিরোধ ভালো মানুষ সে নয়।

পরক্ষণেই অবনীর মনে হোল সুজাতা তো তাকে প্রত্যাখ্যান করেনি। তার দেওয়া আংটি ফিরিয়ে দেওয়ার মূলে আছে মাধুরী সম্বন্ধে তার ঈর্ষা। মাধুরীর সঙ্গে যদিও কোন সম্পর্ক এখন আর অবনীর নেই, কিন্তু এক সময় যে ছিল এই চিন্তাও সুজাতার কাছে অসহনীয়।

চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা শেষ করে নিজের চেম্বারে ফিরে এল অবনী। সুরপতির কথাগুলি মনে মনে আলোচনা করবার পর তাঁর পরামর্শ যুক্তিপূর্ণ বলেই মনে হোল তার কাছে। অবশ্য অবনীকে যেতে না দেওয়ায় সুরপতিরও যথেষ্ট স্বার্থ আছে। অবনীর মত এমন যোগ্য কর্মদক্ষ এবং বিশ্বস্ত মানুষ এই ব্যাঙ্কে অপর দ্বিতীয় কেউ নেই একথা অবনী ভালো করেই জানে। কিন্তু শুধু সুরপতির স্বার্থই নয় এই ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত থাকলে অবনীর নিজেরও লাভ আছে। অবশ্য এখন পর্যন্ত সুরপতিই এ ব্যাঙ্কের সর্বেসর্বা। ব্যাঙ্কের ছোট বড় সব ব্যাপারই তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু এদিন তো চিরদিন থাকবে না। অবনীর হাতে ধীরে ধীরে সব ক্ষমতাই এসে পৌঁছবে। তার সূচনা এখন থেকেই টের পাচ্ছে অবনী। সুজাতার ঈর্ষার কারণটাও অবনী ভালো করে বিশ্লেষণ করে দেখল। তাঁর ঈর্ষার তীব্রতায় তার মনের

অনুরাগের প্রাবল্যই ধরা পড়ে, প্রণয়ের অভাবের প্রমাণ হয় না। অবনী স্থির করল সে আরো কিছুদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবে। ব্যাঙ্কের কাজ আগের মতই দক্ষতার সঙ্গে করে যাবে, কিন্তু চেয়ারম্যানের বাড়ি সে আর কিছুতেই যাবে না। সুরপতিবাবু কি তাঁর মেয়ে যতই অনুরোধ করুন না নিজের সঙ্কল্পে অবিচল থাকবে অবনী। সুজাতার কাছে নিজেকে বড়ই সুলভ করে ফেলেছে সে। তাই বারবার এমন করে তাকে অপমানিত হতে হয়। নিজেকে দূরে রেখে, দুর্লভ করে রেখে অবনীকে তার আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

বাড়িতে মা বাপ অবশ্য তার এই দুর্বলতা দেখে অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছেন। মা তো স্পষ্টই বলা শুরু করেছেন, 'কেন, হোলই বা সে বড়লোকের মেয়ে। কিন্তু তুইই বা কম কিসে। বিদ্যায় বুদ্ধিতে ক্ষমতায় কোন জিনিসে তোর ঘাটতি আছে যে তোকে সে বার বার এমন করে অপমান করবে। মাসের পর মাস বছরের পর বছর যাচ্ছে তার টালবাহানা আর ফুরোয় না। এই কলকাতা শহরে সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের কি অভাব আছে নাকি? আমার পরামর্শ যদি তুই শুনিস তাহলে ভুলেও ও মেয়ের নাম তুই মুখে আনিসনে। যদি পুরুষের মত পুরুষ হোস তাহলে ও সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে আর কোথাও বিয়ে কর। আমি যদি একবার টু শব্দ করি কতজন সেধে এসে মেয়ে দিয়ে যায়।'

অবনী হেসে বলে, 'দরকার নেই মা তোমার আর টু শব্দ ক'রে।'

মা রাগ করে বলেন, 'তোর হাসি দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।'

কিন্তু অবনীর মা যেমন সোজা স্পষ্ট ভাষায় ছেলেকে অন্য জায়গায় বিয়ে করতে নির্দেশ দিতে পারেন অবনীর বাবা হৃষিকেশ চাটুয্যে তত সহজে তা পারেন না, কারণ তিনি জানেন সুজাতা যেদিন এ ঘরে আসবে শুধু হাতে আসবে না। ব্যাঙ্কার সুরপতি চক্রবর্তীর সে একমাত্র মেয়ে। তার অগাধ ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারিণী। তাই ঝাঁপি শুদ্ধ লক্ষ্মীকে ঘরে আনতে হলে অত অধীর আর অসহিষ্ণু হলে চলে না। ধৈর্যের সঙ্গে শুভক্ষণের জন্যে অপেক্ষা

করতে হয়। এখনকার মতো সেই ধনী নন্দিনীর মানঅভিমান খামখেয়াল যদি কিছু কিছু মেনে নিতেও হয় তাহলেও ক্ষতি নেই। পুত্রবধূ রূপে হৃষিকেশ যদি তাকে একবার ঘরে এনে তুলতে পারেন তখন সুদে আসলে এর শোধ নিয়ে ছাড়বেন।

বাপ মার মতের আর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অবনী ভালোকরেই জানে। আর সেই সঙ্গে এও জানে এর কোনটিই তার নিজের মত নয়। সুজাতাকে সে চায় তাকে ভালোবাসে বলেই। তার বাবার ধন সম্পদ নয়, সুজাতার নিজেরই বিদ্যাবুদ্ধি রূপরুচি দিয়ে গড়া মধুর ব্যক্তিত্ব অবনীকে আকর্ষণ করেছে। এতদিনের সান্নিধ্য সাহচর্যেও সুজাতা কি অবনীকে বুঝতে পারেনি? প্রথম তারুণ্যে কবে কোন মেয়ের সংস্পর্শে অবনী এসেছিল কিনা আজ এতদিন বাদে সুজাতার কাছে সেই প্রশ্নই কি সব চেয়ে বড় হয়ে উঠল এত সৌহৃদ্য, বন্ধুত্ব, প্রীতি আর প্রেমের কোন মূল্যই কি রইলনা। মাঝে মাঝে অভিমানে বিক্ষোভে মন ভরে উঠতে লাগল অবনীর। একেকবার সন্দেহ হোল মাধুরীর অজুহাতটা সুজাতার একটা ছল। এই অজুহাতে সুজাতা তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চায়, অবনীকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়। আসলে সুজাতা অবনীকে হয়তো আর ভালোবাসে না। তাদের মাঝখানে আর এক দ্বিতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। কে সে? অসিত? নামটা মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই হিংসায় বুকের ভিতরটা জলে ওঠে অবনীর। রূপে, গুণে অর্থে সামর্থ্যে কোন দিক থেকেই অবনীর সঙ্গে অসিতের তুলনা হয়না। অসিত অবনীর অনেক নিচে, অনেক নিচে। তবু সুজাতার হৃদয় তার জন্ম কেন উন্মুখ হয়ে ওঠে? মেয়েদের মন বোঝা শক্ত। জলের মত মেয়েদের মনের গতিও কি উঁচু থেকে নিচুর দিকে? কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজের এই দুর্বল ঈর্ষার কথা ভেবে অবনী নিজের মনেই হাসে। তা কিছুতেই হতে পারেনা, সুজাতার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে এমন ভুল কিছুতেই করতে পারে না। শুধু হৃদয়ের আবেগে চালিত হওয়ার মত মেয়ে সুজাতা নয়। সে যা করবে যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে ভেবে চিন্তে করবে। সুজাতা কি

জানেনা অসিতের জাত আলাদা। সুরপতির মতো গোড়া ব্রাহ্মণ কিছুতেই অসবর্ণ বিয়েতে রাজী হবেন না। আর যাই করুক বাবাকে কিছুতেই আঘাত দিতে পারবেনা সুজাতা। তাঁর অবাধ্য হওয়ার মতো দুঃসাহস ও তার নেই। আর এদিক থেকে সুরপতি অবনীর সহায়। তাই আজ হোক কাল হোক সুজাতাকে বিয়েতে রাজী হতেই হবে। একথা ভেবে অবনী মনে মনে ভারি নিশ্চিন্ত বোধ করল। এ ব্যাপারে অন্যের ওপর নির্ভর করার যে হীনতা আছে, অপমান আছে অত বড় ব্যক্তিত্ববান জেনারেল ম্যানেজারের সে কথা এক মুহূর্তে মনে পড়ল না।

কিন্তু সুজাতার হৃদয়তত্ত্ব নিয়ে বেশি বিচার বিশ্লেষণের আর সময় হোল না অবনীর। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডের ইলেকসন এসে পড়ল। সেই ইলেকসনে অবশ্য সুরপতিদেরই জয়লাভ হোল। কারণ স্বনামে বেনামে শতকরা নব্বই ভাগ শেয়ারই সুরপতির কেনা। তবু কিছু বিরোধিতাব মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল সুরপতির দলকে। ডিরেক্টর পদ প্রার্থী ডাঃ রাজ্যেশ্বর দত্ত আর সতীনাথ সিংহের মধ্যে প্রতিযোগিতায় সুরপতি সমর্থন করলেন নতুন তৈল ব্যবসায়ী সতীনাথকে, অথচ ডাঃ দত্ত এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বহুদিন থেকে সংশ্লিষ্ট। ব্যাঙ্কের শৈশব সঙ্কটে তিনি একে সাহায্য করেছেন। লোকে ভাবত সুরপতির আর ডাঃ দত্তের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বই আছে। সুরপতি ডাঃ দত্তের সঙ্গে বন্ধুত্বকে স্বীকার করেন কিন্তু তাঁর মতামতকে গ্রাহ্য করেন না। তিনি বলেন, 'দত্ত তোমার অসম্ভব আদর্শবাদ কলেজের চৌহদ্দীর মধ্যে বেশ মানিয়ে যায় কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে আর একটু বাস্তব বোধের দরকার হয়। আমার কাজে বাধা দিয়োনা। তাতে তোমারও লাভ নেই আমারও লোকসান।'

কিন্তু অধ্যাপক দত্ত সে কথায় কান দেননি। তিনি ডিরেক্টরদের বৈঠকে প্রত্যেকবার সুরপতির সমালোচনা করেছেন। তিনি বার বার জোর দিয়ে বলেছেন, 'আমি নীতিশাস্ত্রের দোহাই পাড়ছিনে, অর্থনীতির নিয়মের কথাই বলছি। সুরপতি যে পথে চলছে সেটা নিয়মের

পথ নয়, অনিয়মের পথ। এ পথে যে কোন সময় পা পিছলাবার আশঙ্কা আছে।'

কিন্তু অন্যান্য অংশীদারগণ অধ্যাপকের কথা গ্রাহ্য করেননি। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে তাঁদের লভ্যাংশ বছর বছর বাড়ছে ছাড়া কমছে না।

ইলেকসনে হেরে গিয়ে রাজ্যেশ্বর প্রতিষ্ঠান থেকেই বিদায় নিয়ে গেলেন। এই ব্যাঙ্কে অনেককে চাকরি দিয়েছিলেন রাজ্যেশ্বর। তাদের কেউ কেউ তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর সহানুভূতির স্বরে বলল, 'আপনি চলে যাচ্ছেন কেন। পরের ইলেকসনে—'

রাজ্যেশ্বর তাঁদের বাধা দিয়ে বললেন, 'কোন ইলেকসনেই আমার আর সুবিধে হওয়ার কোন আশা নেই। এ বেড়াজাল কেটে এখন যদি না বেরোতে পারি পারিণামে অনেক দুষ্কৃতির ভাগ ঘাড়ে এসে পড়বে।'

কর্মচারীরা বলল, 'আপনি গেলে আমাদের কী দশা হবে?'

রাজ্যেশ্বর বললেন, 'তোমাদের ব্যাপারটা অত জটিল নয়। তোমরা চাকরি করতে এসেছ, যতদিন চাকরি থাকে চাকরি করবে, যখন থাকবে না খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে।'

রাজ্যেশ্বর বিদায় নিয়ে গেলে তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে সুরপতির বিরুদ্ধে কিছু অসন্তুষ্টির গুঞ্জন উঠল। কিন্তু সে শুধু গুঞ্জনই। সুরপতি তা কানে তুললেন না।

তবে জেনারেল ইনক্রিমেণ্টের লিং নিয়ে কর্মচারীদের মধ্যে যে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হোল তাকে অত সহজে এড়িয়ে যেতে পারলেন না সুরপতি। তাদের প্রতিবাদের গুঞ্জন 'শুনবনা' বলে কানে আঙুল দিয়ে বসে থাকা সম্ভব হোল না।

যাঁদের ওপর বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব আর যারা সুরপতি কি অবনীর অনুগত, বেতনবৃদ্ধির বরলাভ তাদের ভাগ্যে যেমন ঘটেছে অন্যদের বেলায় তেমন হয়নি। বিশেষ করে যাঁরা রাজ্যেশ্বরের দলের লোক, বেছে বেছে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে।

অবনী অবশ্য স্বরপতির এই কাজের সবটুকু সমর্থন করেনি। সে প্রতিবাদ করে বলেছে, 'এর ফল হয়তো ভালো হবে না।' স্বরপতি জোর দিয়ে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই হবে। এর জন্যে যদি কিছু অবাঞ্ছিত লোক ব্যাঙ্ক ছেড়ে চলে যায় সেটা আমাদের পক্ষে কুফল নয়।'

অবনী জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিন্তু যদি ভিতরে থেকে গোলমাল করে ?'

স্বরপতি জবাব দিয়েছিলেন, 'তার ওষুধ আমার কাছে আছে। সে জন্যে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।' কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে যা ঘটল তাতে স্বরপতি আর অবনী দুজনকেই খানিকটা চিন্তিত আব উদ্বিগ্ন হতে হোল।

বিষ্ণুবাবুর ওপর অবিচারের প্রতিবাদে যখন ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের মধ্যে ইউনিয়ন গড়বার চেষ্টা হয়েছিল তখন তা সফল হয়নি। কাবণ সে অবিচার ছিল বিশেষ করে একজনের ওপর। কিন্তু এবাব ইনক্রিমেণ্ট দেওয়ার বেলায় কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতের কথা টের পেয়ে ছোট বড় অনেক কর্মচারীই একজোট হোল। সকলেই বলাবলি করতে লাগল, 'এ ভারী অন্যায়, এর একটা প্রতিকার করা উচিত।'

অসিত বলল, 'কী করে প্রতিকার করবেন ? আপনাদের না আছে মনের বল না আছে দলের বল। প্রতিকার যদি করতে হয় তাহ'লে সবাইকে এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। তবেই কিছু করা সম্ভব।'

তরুণ অল্পবয়সী কর্মচারীদের বেশির ভাগ অসিত আর শ্যামলের নেতৃত্ব মেনে নিল। কিছু হোক না হোক চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি। তাছাড়া দল গড়ার মধ্যে একটা নতুন ধরণেব উত্তেজনা আছে, চাঞ্চল্য আছে কর্মতৎপর হওয়ার একটা উপলক্ষ্য পাওয়া যায়। তরুণেরা সবাই অসিত আর শ্যামলের দিকে একে একে আকৃষ্ট হ'তে লাগল। প্রবীণেরা যাঁরা স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঘর সংসার করেন তাঁরা বললেন 'আপনারা কাজ করুন, আমরা পিছনে আছি। বোঝেন তো ছাপোষা মানুষ। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করতে হয়। আপনাদের তো অত ভাবনা চিন্তার কিছু নেই। আপনাদের বয়সে আমরাও—'

শ্যামল রূঢ় কণ্ঠে জবাব দিল, 'থাক থাক। আমাদের বয়সে আপনারা কোন বিশ্বজয় করেছিলেন সে খবরে আমাদের দরকার নেই। ইউনিয়নের মেম্বার আপনারা হবেন কিনা সেইটাই আমাদের জিজ্ঞাস্য।'

অসিত শ্যামলকে আড়ালে ডেকে একটু ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'দেখ শ্যামল তুমি যদি অমন কথায় কথায় মাথা গরম কর তাহলে সব পণ্ড হবে। তোমার ধারণা যে জিভের জোরেই সব হয়।'

শ্যামল প্রতিবাদ করে বলল, 'না তা হয়না কিন্তু জিভের জোরকেও মাঝে মাঝে ব্যবহার করা দরকার।'

ক্রমে ক্রমে দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের অসন্তুষ্ট কর্মচারীদের একটি সঙ্ঘ গড়ে উঠল। তাদের দাবীর তালিকা তৈরী হতে লাগল, কর্মীর তালিকা তৈরী হ'তে লাগল। ক্ষীণজীবি কেরাণীকুলের মধ্যে হঠাৎ যেন এক নতুন উৎসাহের জোয়ার এসেছে।

ব্যাঙ্ক থেকে খানিকটা দূরে একটা রেষ্টুরেণ্ট আছে। তার একটা টেবিলে ছুটির পর চারজনের ঘন ঘন মিটিং হতে লাগল। অসিত, শ্যামল, ক্লিয়ারিংএর তারক সেন আর বিল ডিপার্টমেণ্টের উমাপদ সরকার। কী করে এই ইউনিয়ন ট্রেড ইউনিয়নের অনুমোদন পাবে, কবে চেয়ারম্যানের কাছে দাবীর তালিকা পেশ করা হবে তাই নিয়ে আলাপ আলোচনা আর তর্কবিতর্ক।

এই বৈঠক একদিন অসিতের বাড়িতেও বসল। শ্যামল প্রস্তাব করল কর্তৃপক্ষ দাবী না মানলে সাতদিনের নোটিশে অসিতদের ইউনিয়ন ধর্মঘটই করবে। ব্যাঙ্কের সামনে পিকেট করে কোন কর্মচারীকেই আফিসে ঢুকতে দেবে না। অসিত বলল, 'অমন একটা চরম পথ নেওয়ার সময় এখনো আসেনি।' এই নিয়ে অসিত আর শ্যামলের মধ্যে মতবিরোধ হোল। তখনকার মত ব্যাপারটা অমীমাংসিতই রয়ে গেল।

অসিতরা যে ভিতরে ভিতরে কি একটা মতলব আঁটছিল তা অরুন্ধতী গোড়া থেকেই টের পেয়েছিলেন, ক্রমে ব্যাপারটা তার কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি ছেলেকে ডেকে বললেন, 'আচ্ছা অসিত, এসব তোরা কী শুরু করছিস শুনি?'

রান্নাঘরের বারান্দায় বসে তরকারী কুটছিলেন অরুন্ধতী। অসিত তার কাছে এসে বলল, 'কেন মা কী আবার সুরু করলাম।'

অরুন্ধতী বললেন, 'দেখ অসিত আমার কাছে কিছু লুকাতে চেষ্টা করিসনে। আমি সব জানি।'

অসিত বলল, 'জানোই যদি মা তাহলে আর জিজ্ঞেস করছ কেন।'

অরুন্ধতী বললেন, 'জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারি নাই। আচ্ছা তুই কী কোরছিস বল তো। এইসব ইউনিয়নের মধ্যে তোর কি যাওয়া উচিত।'

অসিত একটুকাল অরুন্ধতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'মা, তোমার মুখ থেকে এমন কথা শুনতে হবে তা কোনদিন ভাবিনি।'

ছেলের কথার ধরণে এক লজ্জিত হলেন অরুন্ধতী, তবু একেবারে হার মানলেন না, 'কেন এমন কী মন্দ কথা আমি বলেছি।'

অসিত বলল, 'তুমি তো সব কথা বলনি মা। একটুখানি বলেছ। এবার আমি তোমার বক্তব্যটা তোমাকে সবটা শোনাই। তারপর তুমি শুনে নিজের মনেই বিচার ক'রে দেখ কথাগুলির কতটা ভাল কতটা মন্দ।'

অরুন্ধতী মুখভার ক'রে বললেন, 'থাক বাপু, তোমার আর অত ভনিতার দরকার নেই।'

কিন্তু অসিত তার বাধা না মেনে বলতে লাগল, 'সুরপতিবাবু আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচিত। অল্পদিনের মধ্যে ব্যাঙ্কের চাকরিতে আমার খুবই উন্নতি হয়েছে। হয়তো আরো উন্নতি হবে। কিন্তু সেই ব্যক্তিগত

লাভের আশায় আমি যদি আমার সহকর্মীদের ছেড়ে সরে দাঁড়াই, তাদের ন্যায্য দাবির সমর্থন না করি, সেটা তোমার মতো মার ছেলের পক্ষে যোগ্য কাজ হবে।'

অরুন্ধতী বললেন, 'থাক থাক আমাকে আর ফুলিয়ে তুলতে হবে না। কিন্তু এই সব আন্দোলন-টান্দোলন ক'রে কি কোন লাভ হবে! ব্যাপারটা তো অত ছেলেখেলা নয়!

অসিত একটু হেসে বলল, 'তোমার ছেলে এতে আছে বলেই ব্যাপারটা ছেলেখেলা যে নয় তা আমরাও জানি।'

অরুন্ধতী বললেন, 'হ্যাঁ, সে কথা জেনে শুনে তবে এগিয়ো। কতজন লোক তোমাদের দলে আছে, তারা কতক্ষণ থাকবে, কতটুকু তাদের শক্তি তা হিসেব করে তবে কাজে হাত দিয়ো।'

অসিত বলল, 'তা তো দেবই। কিন্তু হাতের জোরটা কি ঠিক ঠিক অত আগে থেকে আন্দাজ করা যায় মা। কাজে হাত দিলে তবে বোঝা যায় জোর সত্যি সত্যি কতখানি আছে। জোরের জোগান যে কোত্থেকে আসে তা কাজে না নামলে টের পাওয়া যায় না।'

অরুন্ধতী বললেন, 'সবদিক বুঝে শুনে, ভেবে চিন্তে যা করবার কোরো। এছাড়া আমার আর কিছু বলবার নেই। লড়াইতে নামতে হলে বিপক্ষ আত্মপক্ষ দু'পক্ষের শক্তির হিসেব নিতে হয়। সেইটাই বিচক্ষণের কাজ। আমি শুধু আমাদের অসুবিধের কথাই ভাবছিনে, চাকরি গেলে তোমার মতো আরো অনেক ছেলের গরিব মায়েরা আজকালকার বাজারে কি বিপদে পড়বে সে কথা ভেবেই এত কথা তোমাকে বললাম।'

অসিত বলল, 'এই তো আমার মায়ের মতো কথা। তুমি ভেব না মা। সব ভেবে চিন্তে বুঝে শুনেই আমরা কাজে হাত দেব। আমাদের দলের সকলেই যে শ্যামলের মত রগচটা আর মাথা গরম ছেলে তা ভেব না।'

'নিজের ঠাণ্ডা মাথার ওপর দাদার অগাধ বিশ্বাস,' বলতে বলতে

বলতে ঘরে ঢুকল নীলা। হাতে একখানা নীলচে রঙের এনভেলপ। অসিতের দিকে সেখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও।'

অসিত চিঠিখানা হাতে নিতে নিতে বলল, 'কী ব্যাপার।'

নীলা একটু হেসে বলল 'তোমার চিঠি, ঠিকানা ভুল হওয়ায় পাশের বাড়িতে এসে পড়েছিল। ওদের বাড়ির একটি মেয়ের পাটিগণিতের তলা থেকে আজ এতদিন বাদে বেরিয়ে এসেছে। তোমার ভাগ্য ভালো।'

অসিত চিঠিখানা হাতে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। নীলা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একটু মুচকি হেসে বলল 'কী দাদা, এখনকার মাথার অবস্থা কি রকম। গরম না ঠাণ্ডা। ইউনিয়ন টিউনিয়ন সবই বুঝি চিঠি চাপা পড়ল।'

অসিতও হেসে জবাব দিল, 'ফাজিল মেয়ে কোথাকার। পিঠে লাঠি না পড়লে তোমার বাচালতা যাবে না।'

নীলা বলল, 'কেন পিঠে কেন, আমার মাথায় লাঠি মারলেও আমার স্বভাব বদলাবার কোন আশা দেখিনে দাদা। ছেলেবেলায় পড়নি অতীত্যহিগুণাণ সর্বান স্বভাবো মূর্ধ্নি বর্ততে। লাঠির ঘায়েও সেই মাথায় চড়া স্বভাবকে নামানো যায় না।'

সুজাতার লেখা পুরোণ চিঠি। তার সেই জন্মদিনের আমন্ত্রণ। ঠিকানা ভুল হওয়ায় চিঠিখানা যথাকালে যথাস্থানে এসে পৌছেনি। এর জন্যে দায়ী অবশ্য পত্র লেখিকাই। কিন্তু অসিতের সে কথা মনে পড়ল না; চিঠিটা দেরিতে পাওয়ায় সে যে সুজাতার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারল না, অন্তত একখানা চিঠি লিখে শুভেচ্ছা জানাবার সৌজন্য থেকে বঞ্চিত হোল এই ক্ষোভেই তার মন ভরে উঠল। তারপর আর একবার সুজাতার চিঠিটা পড়ল অসিত। ছোট একটু আমন্ত্রণ লিপি। কিন্তু ভারি সুন্দর, ভারি মধুর আর আন্তরিকতায় ভরা। সমস্ত তিক্ততা রুক্ষতার উপর সেই মাধুর্যের স্নিগ্ধ প্রলেপ লেগে। সামান্য একখানা চিঠি

নিয়ে নিজের মনের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে অসিত নিজেও লজ্জিত হোল, কিন্তু সে লজ্জা অবিমিশ্র লজ্জা নয়। তার মধ্যে আনন্দের স্বাদ আছে। অথচ বিষয়টি তো সামান্য। একটি ধনী অভিজাত ঘরের মেয়ে নিতান্তই নাগরিক শিষ্টাচারের খাতিরে অসিতকে জন্মদিনে একখানি চিঠি পাঠিয়েছে। তাই নিয়ে অত কাব্য করবার, অত স্বপ্ন দেখবার কি কোন দরকার আছে অসিতের। কিন্তু কাব্য আর স্বপ্ন তো সংসারে দরকারের জিনিস নয়, অদরকারের জিনিস। তাই নিজের মনকে যত ধমকই দিক অসিত, দিনের বেলাকার নানা চিন্তা নানা কাজ দিয়ে যতই একটি কোমল আর গোপন ইচ্ছাকে চাপা দিয়ে রাখুক, গভীর রাত্রে সেই লজ্জা সংকোচের সমস্ত আবরণ উন্মোচন করে, সমস্ত শাসন আর অনুশাসন অগ্রাহ্য করে, মনের কোণ থেকে সেই গোপন ইচ্ছাটি মুখ বাড়াল, সে মুখের সঙ্গে একটি অভিজাত ঘরের সুন্দরী মেয়ের মুখের অবিকল আদল আছে।

এমন অন্যমনস্কতা নিয়ে বই পড়া অসম্ভব। হাতের বইখানা বিরক্ত হয়ে বন্ধ করে রাখল অসিত। তারপর সাদা প্যাডটা টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে শুরু করল। সারাদিনের রুদ্ধ বাসনা প্যাডের পাতায় মুক্তি পেল এতক্ষণে।

'সুচরিতাসু,

আপনি হয়ত ভেবেছেন আমি কি অভদ্র। আপনার জন্মদিনের নিমন্ত্রণের অমন সুন্দর একখানা চিঠি পেয়ে না পারলাম নিজে গিয়ে হাজির হতে, না দিলাম জবাব। আমার ব্যবহারের শিষ্টাচার আর সৌজন্যের একান্ত অভাব দেখে আপনি নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু আপনাকে আর একটু বিস্ময়কর সংবাদ দিই, আপনার চিঠিটা আমি আজই পেলাম। ঠিকানা বিভ্রাটে চিঠিটা আমার এক প্রতিবেশীর বাড়িতে বইয়ের তলায় আত্মগোপন করেছিল। আমার বহু ভাগ্য সেই গোপনলোকেই সে অচল হয়ে থাকে নি।

আপনার জন্মদিনের উৎসবের মিষ্টি পাতে পড়ল না এ নিয়ে আজ আর আপশোষ করছিনে, বরং এমন একটা উপলক্ষে আমাকে যে স্মরণ করেছিলেন সে জন্যেই বিস্ময় বোধ করছি।

আমাদের পরিচয় কতদিনেরই বা। কিন্তু এই কদিনের মধ্যে আপনি যে আমাকে আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহলের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন তা আপনারই ঔদার্যের পরিচায়ক।

কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে আমাদের এই সৌহার্দ্যের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই না বিনষ্ট হয়ে যায়। পাছে আপনি আমাকে ভুল বুঝেন, পাছে আবার আমরা সেই অপরিচয়ের অন্ধকারে তলিয়ে যাই। তেমন কিছু একটা ঘটবে বলে যেন আভাস পাচ্ছি। সব কিছু খুলে বলবার সময় এখনো আসেনি। যদি আসে তখন আপনার কাছে নিশ্চয়ই কিছু গোপন করব না, সব জানাব। আপাতত আপনাকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও নমস্কার জানিয়ে নিই। ইতি অসিত চন্দ।'

পরদিন ভোরে চিঠিটা পোষ্ট করবার পর অসিতের মনে অনুশোচনা এল। ছি ছি একখানা সামান্য আনুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণ পত্রের জবাবে ওসব কথা সুজাতাকে কেন লিখতে গেল অসিত? মেয়েটি কী ভাববে। কী অর্থ করবে চিঠিটার। অসিতের চিত্তদৌর্বল্যের কথা ভেবে হাসবে কিংবা তার প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে সুজাতার মনে সংশয় আসা অসম্ভব নয়। সারাদিন ভারি অস্বস্তিতে কাটল অসিতের, বড় বোকামি করেছে, বড় মূঢ়তার পরিচয় দিয়েছে অমন একটা চিঠি লিখে।

ইউনিয়নের কাজ সম্বন্ধে পরামর্শ করতে শ্যামল অসিতের অন্যমনস্কতা দেখে বিস্মিত হোল। বন্ধুর মুখের দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোমার কী হয়েছে বল দেখি।'

অসিত বলল, 'কী আবার হবে।'

শ্যামল বলল, 'উঁহু, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। কি একটা যেন যেন সাংঘাতিক দুষ্কার্য করে এসেছ। ভাবভঙ্গিটা সত্যিই তোমার

একেবারে খাঁটি culpritএর মতো মনে হচ্ছে। কী করে এসেছ বল দেখি, ডাকাতি, রাহাজানি না নরহত্যা?'

অসিত বলল, 'ওসব বাজে কথা রাখ। কাজ কতটা এগোল তাই বল।'

শ্যামল বলল, 'কাজের দিকে কি আর তোমার নজর আছে।'

অসিত বলল, 'তা বটে। নজর যত তোমারই।'

শ্যামল জানাল যে অসিতের কথাটা সে ভেবে দেখেছে। তৈরী না হয়ে যুদ্ধং দেহি বলে ঝাঁপিয়ে পড়াটা কোন কাজের কথা নয়। কিন্তু তৈরী হওয়ার অজুহাতে বসে ঘুমিয়ে বছর কাটিয়ে দিলে চলবে না!

অসিত হেসে বলল, 'সে সম্বন্ধে কারো কোন মতদ্বৈধ নেই।'

সুজাতার জবাব আসতে দেরি হোল না। প্রায় পিঠপিঠই সে চিঠি দিয়েছে। লিখেছে চিঠিতে ঠিকানা ভুলের জন্যে সে লজ্জিত। এমন ভুল সাধারণত তার হয় না। যাহোক দেরিতে হলেও চিঠিটা যে শেষপর্যন্ত মালিকের হাতে গিয়ে পৌচেছে এতে সে খুশি হয়েছে। কারণ চিঠি হারালে ভারি খারাপ লাগে। সুজাতা অসিতের চিঠি পেয়েছে বটে কিন্তু তার পুরোপুরি অর্থবোধ করতে পারেনি। অসিতের কি সময় হবে অর্থটা নিজে গিয়ে একটু বুঝিয়ে দিয়ে আসবার। আর একটা কথা। মানুষের সঙ্গে মানুষের একবার পরিচয় ঘটে গেলে কী করে তারা আবার অপরিচয়ের আড়ালে চলে যেতে পারে তা তো সুজাতা ভেবে পায়না। অবশ্য স্মৃতিভ্রংশ হলে তেমন ব্যাপার হয়ত সম্ভব। কিন্তু দু' একটা ঠিকানা মাঝে মাঝে ভুল হলেও সম্পূর্ণ স্মৃতিভ্রংশতার লক্ষণ কি সুজাতার মধ্যে সত্যিই দেখা গিয়েছে? তবে তো বড় চিন্তার কথা। কিন্তু তাহলেও অসিতের একবার আসা দরকার। বন্ধুবান্ধবের অসুখ বিসুখে বন্ধুরাই সব চেয়ে আগে এগিয়ে আসেন।

সুজাতার কাছ থেকে এত লঘু সুরের চিঠি এর আগে অসিত আর কোনোদিন পায়নি। মনটা হালকা হয়ে গেল। তার চিঠির দুর্বোধ্যতা দেখে সুজাতাও যে দুর্বোধ হয়ে ওঠেনি তাতে খুশিই হোল অসিত। সুজাতার

এবারকার চিঠি আরো হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতার দ্যোতক। অসিত ভারি তৃপ্তি বোধ করলে। ভাবল এবার শিগগিরই একদিন যাবে। তার চিঠির বক্তব্যটা বুঝিয়ে দিয়ে আসবে সুজাতাকে। ইউনিয়নের দাবী নিয়ে যদি সুরপতির সঙ্গে বিরোধের সৃষ্টিই হয় তাহলে সুজাতার সঙ্গে অসিতের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিশ্চয়ই ব্যাহত হবে এই ছিল অসিতের বক্তব্য। আর কিছু নয়। সে কথা সুজাতাকে বুঝিয়ে দিয়ে এলেই হবে।

কিন্তু সুজাতাদের বাড়িতে যাওয়ার কিছু দেরি হয়ে পড়ল অসিতের। উমার শ্বশুরবাড়ি থেকে টেলিগ্রাম এল তার ছেলের শক্ত অসুখ। ডবল নিউমোনিয়া। যদি ছেলেকে দেখতে চায় উমা তাহলে যেন অবিলম্বে রওনা হয়ে আসে।

চিঠি পেয়ে উমা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বলল, 'মরুকগে। ও ছেলে তো তাদের। ও ছেলে তো আর আমার নয়। আমার হলে তো আমার নিজের কাছেই রাখতে পারতাম।'

অরুন্ধতী কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, 'মুখপুড়ী এই কি তোর মান অভিমানের সময়।'

কারো কোন কথাই উমা কানে তুলল না। সে যেন পাথর দিয়ে গড়া। মায়া মমতা তো ভালো, কোন প্রাণের স্পন্দনই যেন তার মধ্যে নেই।

কিন্তু বেলা যত বাড়তে লাগল সেই অবিচল পাথরের মূর্তি চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। তার দুচোখ দিয়ে জলের ধারা বইল।

সস্নেহে বোনের পিঠে হাত রেখে অসিত বলল, 'উমা, আমাদের কথা শোন চল আমরা যাই, খোকনকে দেখে আসি।'

উমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'দেখা কী আমার ভাগ্যে আছে দাদা।'

ঠিক হোল সেইদিনই উমাকে নিয়ে অসিত সন্ধ্যার গাড়িতে রংপুর রওনা হয়ে যাবে। কিন্তু উমা ভারি ছটফট করতে লাগল। একটা মিনিটও এখন আর কাটতে চায় না। অথচ এই ছেলেকে ফেলে এতগুলি বছর সে কেমন করে ছিল।

যাওয়ার সময় নীলা তার সঞ্চিত একশটি টাকা দিদির হাতে দিয়ে. ছলছল চোখে বলল সম্বোধন 'খোকনের চিকিৎসা করিয়ো দিদি।'

বহুদিন পরে এই আত্মীয় সম্বোধনটি নীলার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। এই দীর্ঘদিনের ঈর্ষা দ্বেষ হিংসা—সব দুই বোনের চোখের জলে কোথায় ভেসে গেল।

উমা বলল, 'তোর ওপর অনেক অবিচার করেছি। তুই আমাকে ক্ষমা করিস।'

নীলা বলল, 'ওসব কথা থাক দিদি। আগে খোকন ভালো হয়ে উঠুক।'

সপ্তাহখানেক বাদে অসিত ফিরে এল। উমার ছেলে ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠেছে। আর আশঙ্কার কোন কারণ নেই। উমা তার ছেলের কাছেই রয়ে গেছে। তাকে ছাড়া সে আর এক পাও নড়বে না। এদিকে মা আর ঠাকুরমা দুজনে দুপাশে না বসলে খোকন ওষুধ খায় না, পথ্য খায় না।

অসিত বলল, 'শাশুড়ী বউয়ের মিলটা খোকনই ঘটিয়ে দিল মা।'

মৃদু হেসে বললেন, 'তাই তো ঘটে থাকে।'

আজকাল মাঝে মাঝে সুরপতির নিজের ওপরই কেমন সন্দেহ হয়। চালে ভুল করেছেন না তো তিনি? সুরপতি বেশ বুঝতে পারেন দিনকাল বদলে যাচ্ছে। উল্টো হাওয়া বইছে। সেই হাওয়ার ওপর নিরিখ রেখে পালের দড়ি টানতে না পারলে নৌকো বেসামাল হবেই। অফিসের পর গাড়ীতে করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সুরপতির এই কথাটাই বার বার মনে পড়ছিল। রাজ্যেশ্বর দত্তকে ব্যাংক থেকে তাড়ানো আর তাঁর দলের এমপ্লয়িদের ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করা দুটো কাজ এক সঙ্গে না করলেই বুঝি ভাল হত। তাহলে গোলমালটা এতদূর গড়াত না। অবশ্য এই সামান্য গোলযোগে, অসিত-শ্যামলের নেতৃত্বে গুটি কত নগণ্য কেরাণীর হুমকিতে ভয় পাবেন, সুরপতি এখনও তত বুড়ো হননি, তত দুর্বল হয়ে পড়েননি। কিন্তু সময়টা ভাল না। কর্মচারীদের শায়েস্তা করার সময় এখন নয়।

বাইরের কাউকে জানতে না দিলেও সুরপতি তো জানেন ভিতরে ভিতরে ব্যাঙ্কের আয়ে চিড় ধরেছে। যুদ্ধের ক'বছর 'দেশলক্ষ্মী' যে বিজনেস করেছে, গত দু'বছরের মধ্যে তার অর্ধেকে নেমে এসেছে, তবু সুরপতি হিসাবে মোটামোটি লাভই দেখিয়েছেন। ওটা দেখাতে হয়। নইলে ব্যাংকের সুনাম থাকে না, কর্মচারীদের মন ভেঙে যায়। আসল আয় ব্যয় কতটুকু দেখাব সেইটেই তো আসলে ব্যাঙ্কিং কিন্তু স্পেকুলেসনে কেবলই যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। স্পেকুলেসনের ভুলই বা বলেন কী করে? অন্নপূর্ণা আয়রণ ফাউণ্ড্রির টাকাটা যে এভাবে পড়ে যাবে এটা তিনি কোনদিন ভাবতে পারেননি। চালু ফাউণ্ড্রি, ব্যবসা ভালই চলছিল। শরিকি বিবাদ শুরু না হলে টাকাটা সুদ সমেত উঠে আসত ঠিক। এখন মামলা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, তাতেও কত পার্সেণ্ট আদায় হবে সন্দেহ আছে সুরপতির। তাছাড়া নিজে জোর দিয়ে যে টাকা ইনভেষ্ট করেছিলেন তা নিয়ে মামলা মোকদ্দমা শুরু হলে নিজের বদনামকে তিনি আটকাবেন কী করে। আরেকটা ঘা দিয়েছে দু'টো কোল কোম্পানীর মোটা কয়েকখানা শেয়ার। চড়া দামে কেনা শেয়ার কিন্তু আজ প্রায় মূল্যহীন। এটাও অভাবিত, দেশলক্ষ্মীর ভাগ্য খারাপ? না, ভাগ্য-টাগ্য মানেন না সুরপতি। তবে যোগাযোগটা বুঝি মানতে হয়। বিরাট কিছু মহৎ কিছু করতে গেলে এমনি ঝড় ঝাপটা আসে বৈকি? পুরুষ মানুষেব তাতে দমে গেলে চলে না। একদিক ডোবে তো আরেক দিক ভেসে ওঠার অপেক্ষায় থাকতে হয়; দেশলক্ষ্মীর সিষ্টার কনসার্ণ 'ভারতী ফায়ার জেনারেল' ভাল কাজ দিচ্ছে। দেশলক্ষ্মীর লাভের টাকাকে সুরপতি সিন্দুকে বন্ধ করে রাখেন নি। দেশময় ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন, দেশলক্ষ্মীর ব্রাঞ্চে ব্রাঞ্চে ভারতবর্ষের ম্যাপকে তিনি চতুর্দিকে চিহ্নিত করে রেখেছেন। ব্যাঙ্কের আওতায় আরও চার পাঁচটি কনসার্ন আছে, দুঃসময়ে যাদের ওপর নির্ভর করে, যাদের ওপর ভর দিয়ে চলতে পারে দেশলক্ষ্মী। কিন্তু সে সব জটিল বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবেন কি, পিঁপড়ের মত ক্ষুদে কেরাণীদের কামড়ে তিনি

অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, এক এক সময় তাঁর ইচ্ছে হয় পিঁপড়ের মতই এর কতগুলিকে তিনি পিষে মারেন। এক ধার থেকে বরখাস্ত করে তাড়িয়ে দেন ব্যাঙ্ক থেকে। দেবেনও তাই। তবে একদিনে নয়। আস্তে আস্তে, এক একজন করে। হ্যাঁ আজ তিনি একরকম ওদের ইউনিয়নের দাবী মেনেই নিয়েছেন। ভরসা দিয়েছেন ইনক্রিমেণ্ট লিষ্ট রিভাইস করা হবে, বলেছেন এ ব্যাঙ্কে আর যাই হোক অবিচার অন্যায় কারো ওপর হবে না। যোগ্যতার পুরস্কার দেশলক্ষ্মী চিরদিন দিয়ে এসেছে, আজও দেবে। কিন্তু মনে মনে ভেবেছেন দু'টি লোকের পুরস্কারের ব্যবস্থা একটু তাড়াতাড়িই করতে হবে। অসিত আর শ্যামল। অসিতের ব্যবস্থা তিনি ঠিক করেই রেখেছেন, বাকি শ্যামল, তার ব্যবস্থাও তিনি শিগগিরই করবেন। এই দু'টিকে সরাতে পারলেই কিছুদিন অন্তত নিশ্চিন্ত থাকা যাবে। মানসিক স্বস্তিতে গাড়ীর গদিতে পিঠ রাখলেন সুরপতি। রাসবিহারীর মোড়ে এসে ড্রাইভার একবার ব্রেক কসল। একটা ট্যাক্সির সঙ্গে আরেকটু হলেই ধাক্কা লেগে যেত। অন্যদিন হলে সুরপতি ধমকে উঠতেন, 'একটু দেখে শুনে চালাতে পার না।' বেশি স্পিডে গাড়ি চালানো পছন্দ করেন না সুরপতি। কিন্তু ড্রাইভার বেচারী আজ রেহাই পেয়ে গেল। সুরপতি চুপ করেই রইলেন। হর্নের শব্দ করে গাড়ি এসে গেটে দাঁড়াল। নেবে এল সুজাতা। হাত বাড়িয়ে বাবার কাঁধ থেকে চাদরটা তুলে নিয়ে বলল, 'আজ বড্ড রাত করে ফেলেছ বাবা। এরকম যদি দেরি কর তাহ'লে ব্যাঙ্কে যাওয়াই তোমার বন্ধ করে দেবো কিন্তু।'

সুরপতি স্নিগ্ধ হেসে বললেন, 'তাই দিস, এবার থেকে তোকেই ব্যাঙ্কে পাঠাব ঠিক করেছি বুলু।'

সুজাতা বলল, 'না ঠাট্টা নয়, দেখ তো কত রাত হয়েছে।'

সুরপতি আবার একটু হাসলেন, 'হ্যাঁ মধ্য রাত, সাড়ে সাতটা যখন বেজে গেছে তখন মাঝ রাতের আর বাকি কী?'

মেয়েকে দেখলে, মেয়ের কাছে এসে দাঁড়ালে সুরপতির সব ভাবনা চিন্তা

'থেমে যায়। সুরপতি জামা কাপড় বদলে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন, চায়ের সরঞ্জাম আনিয়ে নিজের হাতে চা করল সুজাতা। সুরপতি বললেন, 'তোর বুঝি এখনও চা খাওয়া হয়নি বুলু। কতদিন বলেছি আমার দেরী দেখলে তুই বসে থাকিসনে, চা খেয়ে নিস্।'

সুজাতা মুখ নিচু করে রইল। সুরপতি জানেন হাজার বললেও সুজাতা কথা শুনবে না। সুরপতি না ফেরা পর্যন্ত বিকেলের চা কোনদিন খাবে না সুজাতা। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সুরপতির মনকে যেন দুই শরিকে ভাগ করে নিয়েছে। তাঁর আধখানা মন জুড়ে আছে দেশলক্ষ্মী। আব আধখানা মেয়ে সুজাতা। নিষ্ক্রিয় অবসর মুহূর্তে সুরপতি ভেবে দেখেছেন কোনদিন যদি এই দুই শরিকের বিবাদ বিসম্বাদ শুরু হয়, একের স্বার্থের জন্য অন্যকে ত্যাগ করতে হয়, কাকে ছাড়বেন তিনি? সুরপতি ভেবে দেখেছেন সেদিন বুলুরই জয় হবে। না বুলুর কাছে কেউ না। প্লেট থেকে একটুকরো সন্দেশ ভেঙে নিয়ে প্লেট-টা মেয়ের দিকে ঠেলে দিয়ে সুরপতি বললেন, 'সন্দেশ দু'টো খেয়ে ফেল বুলু।'

চায়ের কাপে আস্তে একটু চুমুক দিয়ে সুজাতা বলল, 'তোমার ধারণা কিন্তু ঠিক নয় বাবা।'

'কিসের ধারণা?'

সুজাতা বলল, 'এই যে তখন ঠাট্টা করে বললে এখন থেকে তোকেই ব্যাঙ্কে পাঠাব। তুমি ভাব তোমার অবনী ছাড়া আর বুঝি কেউ ব্যাঙ্কিংয়ের কিছু বোঝে না। অবশ্য তোমাদের ব্যাঙ্কের খবর জানি না। কিন্তু বাড়িতে ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে তোমার যে সব বই রয়েছে তা আমি প্রায় শেষ করে এনেছি'

সুরপতি খুশি হয়ে বললেন, 'তাই নাকি?'

সুজাতা বলল, 'হ্যাঁ ভারি ইনটারেস্টিং কিন্তু। আমার একেক দিন ভারি ইচ্ছে হয়, তোমার ব্যাঙ্কে গিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখে আসি। একটা প্রতিষ্ঠানের কত রকমের কাজ। কত সতর্ক হয়ে কত মনোযোগ দিয়ে এমপ্লয়িদের কাজ করতে হয়।'

সুরপতি ম্লান হেসে বললেন, 'এমপ্লয়িরা সব সময় কি আর মনোযোগ দেয়! দেয় না। তা হলে তো কথাই থাক তো না। মাঝে মাঝে অন্যদিকেও মন দেয়। দল পাকায়। সেই গোলমাল মেটাতেই তো আজ এত দেরী হয়ে পড়ল।'

সুজাতা প্রশ্ন করল, 'কিসের গোলমাল বাবা?'

সুরপতি বললেন, 'এমপ্লয়িরা ইউনিয়ন করেছে। দাবী পেশ করেছে, তাদের মাইনে বাড়াতে হবে, তাদের দাবী মানতে হবে। না মানলে ব্যাঙ্কে স্ট্রাইক হতে পারে। কেন, মাইনে আমি বাড়াইনি?' সুরপতি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'এবছরও কয়েকজনকে ইনক্রিমেণ্ট দিয়েছি। হ্যাঁ, যারা ইনক্রিমেণ্ট পাওয়ার যোগ্য তাদেরই দিয়েছি। আর কে যোগ্য, কে যোগ্য নয় সে বিচার কি আমি করব, না ওরা করবে। ওরা বায়না ধরেছে সবাইকে ইনক্রিমেণ্ট দিতে হবে। আসলে ইনক্রিমেণ্টের ধুয়াটা উপলক্ষ্য। আসল লক্ষ্য আমাকে জব্দ করা। বিষ্টুবাবু বলে একজন ক্লার্ককে একটা মারাত্মক ভুলের জন্য তিন মাস সাসপেণ্ড করেছিলাম, সেই আক্রোশে ওরা এ সব করেছে। আর সব চাইতে আশ্চর্য কি জানিস বুলু, অসিত হয়েছে এদের লিডার। যে একরকম পায়ে ধরে এ ব্যাঙ্কে ঢুকেছিল, তিন মাসের মাথায় যাকে ইনক্রিমেণ্ট দিয়েছি।'

বিস্মিত হয়ে সুজাতা বলল, 'অসিত বাবু রয়েছেন, এ সবের মধ্যে? কিন্তু তাঁকে দেখলে তো সে রকম মনে হয়নি।'

সুরপতি বললেন, 'মনে আমারও হয়নি। কিন্তু এখন দেখছি সব কিছুর মূলেই সে, দেখতে শুনতে ভালোমানুষ হলে হবে কি। ভিতরে ভিতরে ছেলেটি ভারি চালাক, নইলে সুরপতি চক্রবর্তীর সাথে বড়ে'র চাল চালতে আসে।'

সুজাতা যেন একটু শঙ্কিত হয়ে উঠল, বলল, 'ইউনিয়নের দাবীর জবাবে তুমি কী বলেছ বাবা?'

সুরপতি অভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে হেসে বললেন, 'না বুলু ওদের আমি

চাইনি, সবাইকে চেম্বারে ডেকে এনে ওদের দাবীর ফর্দ যখন পড়ে শেষ করলাম, তখন রাগে চোখ দিয়ে আমার আগুন বেরোচ্ছিল তবু তো এক চোখে জল এনে বলতে হ'ল, 'দেশলক্ষ্মী' দেশের লক্ষ্মী, তোমাদের লক্ষ্মী। তোমাদের অবহেলা অবজ্ঞায় যদি ব্যাঙ্কের ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি তোমাদেরও। ইনক্রিমেণ্ট লিষ্ট নিশ্চয়ই রিভাইজ্‌ড্‌ হবে; আমার যদি ভুল হয়, সে ভুল তোমরাই শুধরে দেবে।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'তুই ভাবছিস বুলু, বাবা এরকম মনে এক মুখে আর করল কেমন করে, কিন্তু করতে হয় মা। ব্যাঙ্ক তো নয়, যেন এক রাজত্ব চালান, কত রকম সব এলিমেণ্ট। ওই ইউনিয়ন ফিউনিয়ন ভেঙে দিতে আমার বেশী দিন লাগবে না। আসলে তোরা যাদের জনগণ বলিস, মগজের দিক থেকে তারা তো একেকটি গণেশ। হ্যাঁ তবে গণপতির ব্যবস্থা আমি করেছি। অসিতকে নাগপুরে ট্রানস্‌ফার করলাম। কালই ও ব্যাঙ্কের চিঠি পাবে।'

অসিতের নেতৃত্বের খবর শুনে মনে মনে তার ওপর ভারি রাগ হচ্ছিল সুজাতার। এসব ব্যাপার নিয়ে তার মাথা ঘামানোর কী প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নাগপুর বদলি করার কথায় একটু যেন চমকে উঠল, বলল, 'সে তো অনেক দূর বাবা।'

সুরপতি তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ ওকে একটু বেশী দূরেই কিছুদিন রাখতে চাই বুলু।'

সুজাতা বলল, 'কিন্তু ঠিক এই সময় অসিতবাবুকে ট্রানস্‌ফার করলে আর পাঁচজন হয়ত সেটা ভালোর চোখে দেখবে না। আর অসিতবাবুই কি বুঝতে পারবেন না যে এর পিছনে তোমার একটা উদ্দেশ্য আছে?'

সুরপতি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আমিও সেইটেই চাই। অসিত বুঝুক যে যার খাব তারই মাথায় লাঠি মারব এ নীতি সুরপতি চক্রবর্তী কোনদিন সহ্য করে না। তাছাড়া অসিতকে না সরিয়ে শ্যামলকে আমি বরখাস্ত করতে ভরসা পাই না বুলু। আর পাঁচজনের কথা বলছিস্‌

তাদের আমি বুঝিয়ে দিয়েছি, অসিতের পক্ষে এটা যোগ্যতার পুরস্কার ছাড়া কিছু নয়।'

সুজাতা চুপ করে রইল।

সুরপতি একটু হেসে বললেন, 'বুঝেছি বুলু, শ্যামলকে বরখাস্ত করার ব্যাপারটাও তোর ভাল লাগছে না। কিন্তু মা বহুজনের স্বার্থের পথে একের স্বার্থ যেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেখানে নিষ্ঠুর হওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে চায়ের কাপ শেষ করলেন সুরপতি।

সুরপতির অনুমান মিথ্যে হয়নি। অসিতকে নাগপুরে বদলি করার ব্যাপারটাকে অনেকেই তার সৌভাগ্য বলে ধরে নিল। ডেসপাচের অবিনাশ খবর শুনে নিজের কপালে হাত বুলিয়ে বলল, 'দাদা কপাল করে এসেছিলেন আপনি। চাকরি পেয়ে বছর ঘুরতে পারল না। এক লাফে একেবারে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। একেই বলে ভাগ্য। আর আমরা শালারা যে তিমিরে সেই তিমিরে। তা চলে যান দাদু, পাহাড়ী জায়গা। জল বাতাস ভাল, শুনেছি দেড় টাকা মাংসের সের। দু'আনায় দু'টো ডিম। ছমাসে ডবল হয়ে ফেরা চাই।'

টাইপিষ্ট সুধাংশু চাটুয্যে হাতের কাজ থামিয়ে হেসে বলল, 'আরে শুধু ডিম মাংস কেন। ফূর্তির আরো জিনিস আছে, এতো আর তোমার শ্যামবাজার কলেজ স্ট্রীট নয়, কার দিকে একটু নজর দিলে কে কোথায় দেখে ফেলল। ওসব জায়গায় কে আর কার খবর নিচ্ছে। দাশগুপ্ত এতদিন মাটি কামড়ে পড়ে আছে কি সাধে? রস আছে রে ভাই, পাহাড়ী দেশে রস আছে।'

ইনক্রিমেণ্টের ব্যাপারে সুরপতির প্রতিশ্রুতিকে সকলে সুলক্ষণ বলেই ধরে নিয়েছে। সমস্ত ব্যাঙ্কময় একটা খুশির চাপা ফিসফিসানি। ইউনিয়নকে শেষ পর্যন্ত তা'হলে স্বীকার করে নিল সুরপতি। না নিয়ে কি আর উপায় আছে। বাপ কি আর সাধে বলে, চাপে পড়লে তবে তো বাপ বলে।

খুশি হয়নি শুধু শ্যামল, ছুটির পর কিছুটা পথ অসিতকে এগিয়ে দিয়ে শ্যামল বলল, 'সুরপতির চালটা বুঝতে পেরেছ অসিত?'

অসিত হেসে বলল, 'না তা পারিনি। তবে শ্যামল সরকারের হিংসেটা বুঝতে পারছি। অসিত চন্দের জায়গায় শ্যামল সরকারের নামটা কেন হল না, এইত?'

শ্যামল বলল, 'তোমার সব কিছুতেই কেবল ঠাট্টা। কিন্তু ভেবনা সুরপতি চক্রবর্তী এখানেই থামবে। এটা ওর প্রথম চাল। ইনক্রিমেণ্টের ব্যাপারটা আসলে ভাওতা, তুমি দেখে নিও।'

অসিত গম্ভীর হয়ে বলল, 'তা জানি, অবশ্য বদলিটা একদিক থেকে ভালই হ'ল। শুধু হেড অফিসেই নয়, ব্রাঞ্চগুলোকেও আমাদের অর্গানাইজ করা দরকার। সে কাজ বাইরে থেকেই করা সহজ হবে। আর হেড অফিসের জন্য তো তুমিই রইলে।'

শ্যামল বলল, 'তা রইলাম। কিন্তু তুমি চলে গেলে কোন বিষয় নিয়ে পরামর্শ করব এমন লোক কেউ রইল না।'

অসিত জবাব দিল, 'কেন থাকবে না। নীলা রইল, সুপরামর্শ ছাড়া কুপরামর্শ সে তোমাকে কোনদিন দেবে না। আর আমি যাওয়ার পর যখন তখন পরামর্শ করতে যাওয়াটাও সহজ হবে।'

শ্যামল সলজ্জ হেসে বলল, 'ফের বুঝি আবার হালকামি শুরু করলে।'

শ্যামলকে বিদায় দিয়ে পথে আসতে আসতে অসিত ভাবল, সে তো তাইই চেয়েছিল। চেয়েছিল সমস্ত জীবনটা লঘু রসিকতার মধ্যে কাটিয়ে দিতে। গুরু দায়িত্বের কাজকে সে ভয় করে, কর্মের বন্ধন তার ভাল লাগে না। কিন্তু যে পথে চলতে চায় সে পথে চলতে পারে কই? সব পথ যেন ডালহাউসির ব্যাঙ্কের দুয়ারে এসে শেষ হয়েছে। দুঃখ দারিদ্র্য অভাবক্লিষ্ট এই ভাঙাচোরা মানুষগুলির দিকে তাকালে এক আশ্চর্য বিস্মৃতি এসে মনকে ঢেকে ফেলে। মনে হয় এরা ছাড়া পৃথিবীতে আর বুঝি মানুষ নেই, এদের কাজ ছাড়া আর কোন কাজ নেই। মনে মনে ভাবে অসিত এমনি করেই

বুঝি অনেক মানুষের নেতৃত্ব একজনের উপর এসে ভর করে। সাধ করে কেউ নেতা হতে যায় না।

নীলা আর অরুন্ধতী দুজনকে ডেকে অসিত জানিয়ে দিল তিনদিনের মধ্যে তৈরী হয়ে নিতে হবে। সময় কম। অতএব ফর্দ করে ফেল, কি আছে আর কি নেই। বালিস যা আছে ওতেই চালিয়ে নেওয়া যাবে। বিছানার চাদর চাই বোধহয় একটা।

সব শুনে অরুন্ধতী কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন। না, টাকার হিসাব করে করে স্থরপতি পাষাণ হয়ে গেছে। নাগপুরে পাঠাবার আর লোক পেল না স্থরপতি সে কি জানেনা অসিত কি প্রকৃতির মানুষ! রান্নার একদিন একটু এদিক ওদিক হলে যার পেট ভরে না সে খাবে মেসহোটেলের রান্না। আর সেই খাওয়া খেয়ে শরীর টিকবে।

অরুন্ধতী বললেন, 'অতদূরে তোমাকে আমি যেতে দেব না অসিত।'

অসিত হেসে বলল, 'পরের চাকরি করতে হলে দূর কাছ বিচার করতে গেলে চলবে কেন মা?'

কথাটা খচ করে কানে বিঁধল অরুন্ধতীর, পরের চাকরী—তাছাড়া কি, স্থরপতি পর ছাড়া কি?

তিনি বললেন, 'আমিই না হয় স্থরপতি ঠাকুরপোকে একবার বলে দেখব—'

বাধা দিয়ে নীলা বলল, 'না, তুমি কেন বলতে যাবে। এ চাকরিই দাদাকে ছেড়ে দিতে হবে। চাকরি দিয়েছেন বলে তিনি মাথা কিনে বসেননি যে যা হুকুম করবেন তাই করতে হবে। আর তুমি বুঝতে পারছ না মা ইউনিয়ন করার অপরাধেই স্থরপতিবাবু দাদাকে এখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন।'

অসিত বলল, 'কিন্তু নিজে থেকে চাকরি ছেড়ে দিলেই বা ওদের কী, অন্য লোক নিয়ে নেবে। ভাত ছড়ালে কি কাকের অভাব আছে?'

নীলা ঝাঁঝাল গলায় বলল, 'যে কাক উড়তে জানে তারও কোনদিন ভাতের অভাব হয়না দাদা, অবশ্য সে কাক যদি এর মধ্যেই পায়ে সোনার শিকল পরে ফেলে থাকে তবে সে কথা আলাদা। আর সে শিকলের জোরই বা বুঝি কোথায়? ইচ্ছা করলে বদলিটাকে তিনি নাকচ করতে পারতেন না।'

ইঙ্গিতটা অসিতের বুঝতে বাকি রইল না। মৃদু হেসে বোনকে বলল, 'তোর বক্তৃতা এবার একটু থামো তো নীলা।'

তৈরী হয়ে নিতে তিন দিন কেন দু'দিনের বেশি সময় লাগল না অসিতের। বিছানা পত্রের গোছগাছ করল। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ শেষ করল। একটা কাজ শুধু বাকি। যাওয়ার আগে সুজাতার সাথে একবার দেখা করে যেতে হবে। আর কোন প্রয়োজনে নয়, শুধু ভদ্রতা শুধু সৌজন্যের জন্যেই। ইউনিয়নের ব্যাপারটা সুজাতাও কি জানতে পেরেছে? যদি জেনে থাকে অসিতের সম্বন্ধে কি ধারণা হয়েছে তার? একবার ভাবল রংপুর থেকে ফিরে এতদিনে যখন যাওয়া হয়ে ওঠেনি তখন আর গিয়ে কাজ নেই। একেবারে নাগপুরে পৌঁছে একটা চিঠি দিলেই চলবে। মুখের কথার চাইতে চিঠির কথায়ই বরং বেশী সহজ হয়ে উঠতে পারে অসিত। নাগপুরে গিয়ে আর কিছু না হোক অখণ্ড সময় পাওয়া যাবে চিঠি লেখার। আবার ভাবল পরিমিত সংক্ষিপ্ত একটু সাক্ষাতেই বা ক্ষতি কি? দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে অসিত বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

শুয়ে বসে সময় আর কাটতে চায় না সুজাতার। মাঝে মাঝে বড় এক ঘেয়ে লাগে। এই অফুরন্ত সময় নিয়ে কী যে করবে ভেবে পায় না। সময় সমুদ্র। কিন্তু এ সমুদ্রের এক বিন্দু জলও পান করবার জো নেই। একেক সময় মনে হয় সুজাতার এত সময় নিয়ে কী করবে। ইচ্ছে করলে বই পড়তে পারে। কলকাতা শহরে আর যাই হোক বইয়ের অভাব নেই। হাত বাড়ালেই হোল। পছন্দমত যে কোন বইয়ের এখানে

নাগাল পাওয়া যায়। কিন্তু হাত বাড়াতেই যে ইচ্ছে করে না। মনে হয় কী হবে বইয়ের পাতায় বাইরের পৃথিবীকে আড়াল করে রেখে। কী হবে বইয়ের পাতায় নিজের সমস্যাগুলিকে ভুলে থেকে; তাছাড়া ভুলে থাকতে চাইলেই কি ভুলে থাকা যায়। পড়তে বসে কোলের ওপর বই খুলে রেখে যদি এলোমেলো অসম্বন্ধ চিন্তায় মনকে জড়িয়ে ফেলতে হয় তা হলে তেমন লোকদেখানো বই পড়ে লাভ কী।

কী এত চিন্তা করবার আছে সুজাতার। সত্যি মাঝে মাঝে সে নিজেই অবাক হয়ে যায়। এত ভাবনার কী আছে তার। খাওয়ার ভাবনা নেই, পরার ভাবনা নেই, কোন রকম দুরূহ দায়িত্ব নেই। দিব্যি নিশ্চিন্ত নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। সে একটু টু শব্দ করলে বাড়ির তিন চারজন চাকর ছুটে আসবে। তিন তিনটি ব্যাঙ্কে তার নিজের নামে এ্যাকাউণ্ট্ আছে। ইচ্ছা হলেই সে চেক কেটে টাকা তুলতে পারে। সে টাকায় যা খুসি তাই করা যায়। সিনেমা দেখ, থিয়েটার দেখ সমুদ্রে পর্বতে বেড়িয়ে এস শাড়ি কেন, আয়না কেন—কিছুতেই বাধা নেই। জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ টাকায় মেটে। পৃথিবীর সব স্বাচ্ছন্দ্য অর্থের মধ্যে ঘনীভূত হয়েছে। এমন কি সুজাতা বিত্তবানের একমাত্র মেয়ে বলেই নিজেদেরই সমশ্রেণীর স্বাস্থ্যবান রূপবান সম্পদশালী এক কৃতী যুবককেও সে হাতের নাগালের মধ্যে পেয়েছে। প্রাণভরে ভালোবাসার সাধ মেটাও। কিন্তু হাতের কাছে পেলেই কি বুকের কাছে পাওয়া যায়? কেন, এত প্রাচুর্য সত্বেও রিক্ততার শেষ হয় না।

এক একদিন ভাবে কোন একটা কাজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকবে। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে কাজ খুঁজে পায় না সুজাতা। ঘর সংসারের কাজ তার কাকীমাই দেখেন। ঘরবাড়ি গুছানোর কাজের জন্যে আছে পুরোন চাকরের দল। নিজের হাতে কিছু করছে দেখলে তারা ছুটে এসে তার হাত থেকে কাজ কেড়ে নেয়। বাবা রাজী নন বলে, কি তাঁর মর্যাদার হানি হবে বলে বাইরে কোন চাকরি-বাকরি নিতে পারে না সুজাতা।

অাছাড়া নিজের দিক থেকে কেমন যেন আড়ষ্টতাও আছে। নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধে ভয় রয়েছে মনে। কর্মময় জগৎকে ভয়, আবার অকর্মণ্যতাকেও ভয়। এই সীমাহীন ভয় নিয়ে কোথায় লুকাবে সুজাতা। এ যেন নিজের কাছ থেকে নিজের পালিয়ে বেড়ানো।

কাকীমা বলেন, 'এর চেয়ে তুমি বিয়ে কর বুলু। বিয়ে করলে মনের এই বিষণ্ণভাব কেটে যাবে।'

সুজাতা সাগ্রহে বলে, 'কাটবে? তুমি ঠিক জানো কাকীমা?'

কাকীমা বলেন, 'জানি বইকি। সময় মতো বিয়ে না হলে মেয়েরা তোমার বয়সে অমন মনমরা হয়ে থাকে। শ্বশুরবাড়ীর লোকজনের মধ্যে গিয়ে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যায়। যে বয়সের যা।'

হয়ত কাকীমার কথাই ঠিক। হয়ত বিয়ে করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু বিয়ের ওপর অমন গভীর বিশ্বাস যদি সুজাতার থাকত তাহলে আর কোন কথা ছিল না। নিজেদের সমাজে অসুখী দাম্পত্য জীবনের ছবি দেখে তেমন বিশ্বাস সুজাতা রাখতে পারছে কই। নিজেদের জানাশোনার মধ্যেই তো কজন আছে। এ্যাডভোকেট নীরেন বোসের মেয়ে অমিতাদি স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এসেছে। ডাক্তার সুধাংশু মুখুয্যের স্ত্রী সীতা স্বামীরঘরেই আছে বটে কিন্তু রোজ ঝগড়া তাদের মধ্যে লেগেই আছে। একই বাড়িতে তারা আলাদা আলাদা ভাবে থাকে। তবু কলহ কেলেঙ্কারি থেকে রেহাই পায় না। অবনীকে বিয়ে করলে তার ভাগ্যেও যে এমন দুর্দশা হবে না তা কে নিশ্চিত করে বলতে পারে। ভাগ্য! ভাগ্য ছাড়া কী। কিছু না জেনে না দেখে অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া। নিচে সমুদ্র, না মরুভূমি তা জানে না সুজাতা। কিন্তু এই চোখ বুজে ঝাঁপ দেওয়ার বয়স সে পার হয়ে এসেছে। এখন দেখাশোনা বিচার বিবেচনা ছাড়া একপাও নড়তে ভরসা হয় না। বয়স হলেই এমন হয়। হিসেবী হয়ে যায় মানুষের মন। সেই সূক্ষ্ম হিসেবে ধরা পড়েছে অবনীর সঙ্গে তার মিল যতখানি আছে, অমিল

তার চেয়ে ঢের বেশী। এই অমিলের সমুদ্র কী ক'রে পার হবে সুজাতা? এতো একটু হাসি একটু ছোঁয়া একটু চোখে চোখে চাওয়া নয়, এ যে সমস্ত জীবন বাজী রেখে ঝুঁকি নেওয়া। নিজের মনকে না বুঝে অন্যের প্রকৃতিকে না জেনে কী করে এমন মারাত্মক ঝুঁকি নিতে পারে সুজাতা।

'দিদিমণি!'

বাড়ির পুরোণ প্রৌঢ় চাকর অমূল্যর ডাকে সুজাতা চমকে উঠল। ইজি চেয়ারে আধশোয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে উঠে বসল, বলল 'কীরে!'

অমূল্য বলল, 'অসিত বাবু এসেছেন। তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান দিদিমণি।'

সুজাতা বিস্মিত হয়ে বলল, 'অসিত বাবু! হঠাৎ এসময়ে।'

অমূল্য বলল, 'তিনি আপনাকে কী একটা জরুরী কথা বলেই চলে যাবেন। নিচের বসবার ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি। ওপরে ডেকে আনব?'

সুজাতা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না না, আমিই নিচে যাচ্ছি। তুই যা। বল গিয়ে আমি আসছি এক্ষুণি।'

খানিকবাদে শাড়ি বদলে চুলে চিরুণী আর মুখে পাউডারের পাফ বুলিয়ে নিচের ড্রয়িং রুমে নেমে এল সুজাতা।

লম্বা সোফাটার এক কোণে অসিত চুপ করে বসেছিল। সুজাতাকে দেখে স্মিতমুখে বলল, 'আসুন।'

সুজাতা বলল, 'ব্যাপার কী। নিমন্ত্রণ ক'রেও যাকে আনা যায় না তিনি আজ...'

সুজাতার অসমাপ্ত কথা অসিতই হেসে শেষ করল, 'হ্যাঁ, সেই দুর্লভ ব্যক্তিটি আজ স্ববাহূত অবস্থায় আপনার দ্বারে এসে হাজির। আমি কাল বাইরে চলে যাচ্ছি সুজাতা দেবী। জানেন বোধ হয় আমি নাগপুরে বদলি হয়েছি।'

সুজাতা গম্ভীর ভাবে বললেন, 'জানি। বাবা সেদিন বলছিলেন।'

অসিত বলল, 'ও। এসব ছোটখাট নিয়োগ বদলির কথাও বুঝি আপনার সঙ্গে আলোচনা করেন?'

সুজাতা এবার অসিতের সামনের সোফাটায় বসল। তারপর অসিতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সকলের নিয়োগ বদলীর কথাই যে বলেন তা নয়। তবে বিশেষ বিশেষ দু' একজনের কথা বলেন বই কি।'

অসিত হেসে বলল, 'তবু ভালো। আমাকে আপনারা বিশেষ দু' একজনের মধ্যে রেখেছেন, একেবারে নির্বিশেষের ভিড়ে ঠেলে ফেলেননি।'

অসিতের কথার ভঙ্গিতে সুজাতার মুখ একটু হয়ে আরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সুজাতা গম্ভীর মুখে বলল, 'আমার বাবার বিরুদ্ধে যিনি দল গড়েন, দলপতি হন তাঁকে আমরা নির্বিশেষের মধ্যে ফেলব এমন সাধ্য কী। সত্যি আপনি যে এমন ব্যবহার করবেন তা আমি আশা করিনি।'

সুজাতার কথায় শুধু ক্ষোভ নয়, অভিমানও ফুটে উঠল। অসিত একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বলল। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনাদের পরিবারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে আপনার বাবার বিরুদ্ধে আমার কোন বিদ্বেষ নেই। ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হিসাবে যে রীতি-পদ্ধতি তিনি বেছে নিয়েছেন আমাদের আপত্তি শুধু তার বিরুদ্ধে।'

সুজাতা বলল, 'কিন্তু আমার বাবা আর ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান তো আলাদা নয়।'

অসিত বলল, 'আলাদা বই কি। আপনার বাবা কন্যা বৎসল, কিন্তু আমাদের চেয়ারম্যান কর্মচারী বৎসল নন। তাঁর শত শত কর্মচারীর দরিদ্র পরিবার কী খাচ্ছে, কী পরছে তা যদি তিনি দিনের মধ্যে একবারও ভাবতেন তা হলে অতগুলি লোককে সামান্য মাইনেয় তিনি বছরের পর বছর ফেলে রাখতে পারতেন না।'

সুজাতা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমিও আগে আপনার মত ওই

রকমই ভাবতাম অসিত বাবু। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে অনেকদিন তর্কবিতর্কও হয়েছে। কিন্তু এ কথার জবাবে বাবা কী বলেন জানেন?

অসিত সোৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী বলেন?'

সুজাতা বলল, 'তিনি বলেন এতো কেবল একজনের ভাবালুতার কথা না, দানশালার ব্যাপারও নয়। দেশের আর্থিক ব্যবস্থার শিকলে আমরা সবাই জড়িয়ে আছি। শুধু একজনের চেষ্টায়, একটি ব্যাঙ্কের উদ্যোগে এ শিকল ভাঙা যাবে না। তিনি বলেন যে দেশলক্ষ্মীর মতো দেশের আর পাঁচটি ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের যে মাইনে, যে সুযোগ-সুবিধে আমার ব্যাঙ্কেও তাই। আর শুধু কি ব্যাঙ্ক? যে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেরই তো এই অবস্থা। একটির সঙ্গে আর একটি গাঁটছড়ায় বাঁধা। বাবা একা কী করতে পারেন?'

অসিত এদিকে থেকে সমস্যাটা ভেবে দেখেনি। তাই চট ক'রে সুজাতার কথার কোন জবাব দিতে পারল না। আর সেই অবসরে অমূল্য আবার ঘরে ঢুকল। সুজাতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দিদিমনি, কাকীমা জিজ্ঞেস করছেন, আপনাদের চা কি এখানে পাঠিয়ে দেবেন?'

সুজাতা স্মিতমুখে বলল, 'হ্যাঁ খাবার আর চা এখানেই নিয়ে এসো অমূল্য।'

অসিত বলল, 'না না আমার জন্যে চা আনতে হবে না।'

সুজাতা হেসে বলল, 'কেন। এই তো একটু আগেই না আপনি বললেন ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে আপনার কোন রাগ নেই। তবে আমাদের বাড়িতে চা খেতে আপত্তি কিসের?'

অসিতও হাসল। বলল, 'আপত্তিটা সেজন্যে নয়।'

সুজাতা বলল, 'যে জন্যেই হোক ভদ্রলোকের বাড়িতে এসে চা না খেলে সৌজন্যের হানি হয়।'

খেতে খেতে দুজনের আলোচনা চলতে লাগল। গুরুতর অর্থনীতি থেকে সেই আলাপের ধারা কখন যে অন্য খাতে বয়ে চলল তা কেউ টেরও

পেল না। সাহিত্য সংস্কৃতির পর অসিতের মা বোনদের গল্প উঠল। তার বদলির খবরে মা খুব প্রসন্ন হননি একথা জানাল অসিত। নীলারও ব্যাপারটা ভালো লাগেনি। কিন্তু অসিত খুব খুশি হয়েছে।

সুজাতা বলল, 'কেন আপনার এত খুশি হওয়ার কী কারণ ঘটল? ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হয়েছেন বলে?'

অসিত বলল, 'মোটেই সে জন্যে নয়। ব্রাঞ্চ অফিসের ম্যানেজার হওয়ার দায়িত্ব যত বেশি পুরস্কার তেমন নয়। তা আমি জানি। আমি খুশি হচ্ছি এই উপলক্ষ্যে কলকাতার প্রাচীর ডিঙিয়ে যেতে পারছি বলে। এ ধরণের কোন একটা উপলক্ষ্য না ঘটলে তো আমাদের পক্ষে বাইরে যাওয়া হয়ে ওঠে না।'

সুজাতা বলল, 'শুধু সেই জন্যেই বাইরে যাচ্ছেন? আপনি বড় নিষ্ঠুর।'

অসিত বিস্মিত হয়ে সুজাতার দিকে তাকাল।

সুজাতা একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'আমি আপনার বাড়ির সকলের কথা ভেবে বলছি।'

অসিত মৃদু হেসে বলল, 'তা তো নিশ্চয়ই। আপনি যে আপনার নিজের কথা ভেবে বলছেন না তা জানি।'

সুজাতা এ কথার কোন জবাব না দিয়ে আরক্ত মুখ নিচু ক'রে চায়ের কাপে চিনি মেশাতে লাগল। একটু বাদে ফের মুখ তুলল সুজাতা, বলল, 'কেন, আমার পক্ষে ভাবনাটা কি একেবারেই অসম্ভব। কোন পরিচিত বন্ধুবান্ধবকে বাইরে যেতে দেখলে আপনার নিজেরও কি মন খারাপ লাগে না? আপনি স্বীকার করুন আর নাই করুন।'

অসিত বলল, 'কেন স্বীকার করব না? আমি সব স্বীকার করি। আজ আমার সব স্বীকার করতে ইচ্ছে হচ্ছে। দূরে যাওয়ার সময় শুধু মা বোনের কথাই নয়, পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের কথা ভেবেও কষ্ট হয়। কিন্তু সে কষ্ট তো শুধু কষ্টই নয়। তার মধ্যে আরো কিছু পাওয়ার স্বাদ যদি না থাকত—।'

বাইরে থেকে অমূল্য বলল, 'আলোটা জ্বেলে দেব দিদিমণি? সন্ধ্যা হয়ে গেছে।'

সুজাতা বলল, 'সন্ধ্যা হলে আলো তো জ্বালতেই হয়। তার আবার জিজ্ঞেস করবার কী আছে?'

কিন্তু আলো জ্বালবার পর কেউ আর কোন কথা বলল না। শুধু কথাই যে বন্ধ হল তাই নয়। কেউ কারো মুখের দিকে তাকালও না। আবছা অন্ধকারে যা বলা যায়, উজ্জ্বল আলোয় মুখ তুলে সে কথা বলাই যায় না।

একটু বাদে অসিত উঠে দাঁড়াল, বলল, 'যাই এবার। গোছগাছ কিছু এখনো বাকি আছে।'

সুজাতা নিঃশব্দে অসিতের পিছনে পিছনে বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত গেল। অসিত গেট পার হয়ে যাবে যাবে, সেই সময় হঠাৎ ডেকে বলল, 'শুনুন!'

অসিত মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কী বলছেন।'

সুজাতা বলল, 'গিয়ে চিঠি দেবেন।'

অসিত বলল, 'দেব। চলি এবার। আপনি বাড়ি যান।'

খানিকক্ষণ গিয়ে অসিত যদি পিছন ফিরে না তাকাত তাহলে সুজাতা ধরা পড়ে যেত না। দেখতে পেত না সুজাতা তখনও সেই গেটের পাশে দাঁড়িয়েই আছে। কিন্তু শুধু কি সুজাতাই ধরা পড়ল? ফিরে তাকাতে গিয়ে অসিত নিজেও কি ধরা দিয়ে গেল না?

কী মধুর এই ধরা পড়া আর ধরা দেওয়া। সুজাতা মনে মনে ভাবল কী মধুর। খানিকক্ষণ আগের শূন্য পৃথিবী হঠাৎ যেন কানায় কানায় ভরে উঠেছে।

দিন কয়েক অরুন্ধতীর ভারি ফাঁকা ফাঁকা লাগল। ছেলেকে ছেড়ে এর আগে কোনদিন যে তিনি থাকেননি তা নয়; অসিত যখন কলেজে পড়ত, যখন সস্তা মেসে হোটেলে থেকে কলকাতায় চাকরির চেষ্টা

করত্ব তখনও ছেলের কাছ থেকে তাঁকে দূরেই থাকতে হয়েছে। একখানি চিঠির প্রত্যাশায়, কি লোকের মুখ থেকে তার কুশল সংবাদ শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু কলকাতায় এসে বাসা করবার পর অসিত একটি দিনের জন্যেও বাইরে কোথাও গিয়ে থাকেনি। এতদিন কাছাকাছি থাকবার পর হঠাৎ এমন করে বাইরে চলে যাওয়ায় অরুন্ধতীর মনে হতে লাগল যেন ঘরের অনেকখানি জায়গা খালি হয়ে গেছে।

তিন দিন বাদে অবশ্য পৌঁছ সংবাদ এল অসিতের। পোষ্টকার্ডে মাত্র চার পাঁচ ছত্র লেখা। মঙ্গলমতো পৌঁছেছে। গাড়িতে কোন কষ্ট হয়নি। নীলাকে পরে চিঠি দিচ্ছে। সে যেন রাগ না করে।

নীলা সেই চিঠি পড়ে বলল, 'বয়ে গেছে আমার রাগ করতে। তার চিঠি না পেলে যেন আমার নাওয়া খাওয়া বন্ধ হবে, কাজকর্ম অচল হয়ে যাবে।'

অরুন্ধতী বললেন, 'যাই বল বাপু, তোমাদের ফ্যাসানের জ্বালায় আমি অস্থির হয়ে গেলাম। কেন, পোষ্টকার্ডে কি আর জায়গা ছিল না? না আর দুটি ছত্তর বেশী লিখতে হাতে ব্যথা হচ্ছিল? খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করেছে সে সম্বন্ধে কোন কথা নেই—।'

নীলা বলল, 'তুমি অত ব্যস্ত হয়ো না মা। সেখানে দাদা ম্যানেজার হয়ে গেছে। তার কত দারোয়ান, কত বেয়ারা—'

অরুন্ধতী বললেন, 'তুই থাম। দারোয়ান বেয়ারা থাকলেই যেন মানুষের খাওয়া-দাওয়ার সব সমস্যা মিটে যায়। যেমন তেমন রান্না সে খেতেই পারে না।'

নীলা হেসে বলল, 'তাহলে তো যাওয়ার সময় দাদার বিয়ে ক'রে বউ সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। আগে বললে না কেন মা, সুরপতি বাবুকে দিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেলতাম।'

অরুন্ধতী চটে উঠে বললেন, 'কেবল ঠাট্টা আর ঠাট্টা। তোর প্রাণে কি কোন মায়া দয়া নেই নীলি! তুই কি সব ধুয়ে মুছে ফেলেছিস? যা সরে যা; আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা।'

নীলা আর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলে গেল। এ ঘরে আজ তারই পূর্ণ একাধিপত্য। অংশীদার হিসেবে উমা আজ আর উপস্থিত নেই। কিছুদিন আগে তার চিঠি এসেছে ছেলেকে নিয়ে মোটামুটি শান্তিতেই আছে সে। শাশুড়ী আর দেওরও তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করছেন। নীলা মনে মনে ভাবল বিবাহিতা মেয়ের স্বামী গেলে আরও পাঁচজন থাকে। বিশেষ করে যদি ছেলে থাকে, তাহলে তাকে নিয়েই সে ভুলে থাকতে পারে। কিন্তু নীলার মত যারা—। যাক নিজের কথা ভেবে আর লাভ নেই। তার স্নানের বেলা হয়ে গেছে।

নারকেল তেলের শিশিটা তাক থেকে পেড়ে আনল নীলা। একেবারে তলার দিকে অল্প একটু তেল পড়ে আছে। আজ এটুকুতেই হয়ে যাবে। অরুন্ধতী গন্ধ তেল মাখেন না। তাঁর তেল আলাদা।

চুলে তেল মাখতে মাখতে নীলা ভাবল মার মেজাজটা ক্রমেই খিটখিটে হয়ে উঠেছে। নীলার মুখের একটু হাসি, সামান্য একটু নির্দোষ পরিহাসও তিনি সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু তিনি কি জানেন না নীলার জীবনের শূন্যতার কথা? তার আশাহীন, আশ্বাসহীন ভবিষ্যতের কথা? হাসি-তামাসায় আর কাউকে নয়, নিজেকেই ভুলিয়ে রাখতে চায় নীলা। যে জীবনটা সীসার মতো ভারি হয়ে চেপে রয়েছে তাকে যদি একটু নড়ানো যায়, একটু যদি হালকা ক'রে তোলা যায়। কিন্তু তার যেন তাও সহ্য হয় না।

একটু বাদেই অরুন্ধতী সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'নীলি, রাগ করলি?'

নীলা সংক্ষেপে বলল, 'না।'

অরুন্ধতী এবার মৃদু হেসে বললেন, 'মুখে বলছিস না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে—'

নীলা বাধা দিয়ে বলল, 'ভিতরের কথা দিয়ে কী হবে মা। বাইরে শান্তশিষ্ট হয়ে আছি কিনা তাই তুমি দেখে নাও। তোমার সামনে কোন দিন আর না হাসলেই তো হোলো?'

অরুন্ধতী বললেন, 'কেন, হাসবিনে কেন, আমি কি হাসতে বারণ করেছি। দেখ, তোরা যদি সব কথাই অমন করে ধরিস, তাহলে আমি কী করে পেরে উঠি বল? উমা তার শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে, অসিত বদলি হয়ে গেল, তুইও তো সাবাদিনের মতো চললি স্কুলে। একা একা আমার দিন কী ক'রে কাটে বল তো দেখি। দুপুর বেলায় ঘর দু'খানা যেন খাঁ খাঁ করতে থাকে। ছেলেমেয়ে হলে বুঝবি, তাদের ছেড়ে থাকাব দুঃখটা কী।'

নীলা অদ্ভুত একটু হাসল, 'সে দুঃখ আমাকে আব বুঝতে হবে না মা, তুমি ভেব না।'

অরুন্ধতী বললেন, 'বালাই, কেন বুঝতে হবে না। তুই কি ভেবেছিস এমনি করেই সারা জীবন কাটাবি? বিয়ে থা ঘর গেরস্থালী করবিনে? তুই ভাবলেই আমি তোকে তা করতে দিলাম আর কি।'

নীলা গম্ভীরভাবে বলল, 'ওসব কথা থাক মা। ওসব সমস্যাব মীমাংসা তো অনেক দিন আগেই হয়ে গেছে।'

অরুন্ধতী প্রতিবাদ করে বললেন, 'হয়ে গেছে। তুই বললেই হোলো, হয়ে গেছে? কেন কিসের জন্যে তুই এমন সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকবি? উমা তার ছেলেকে নিয়ে সুখে আছে। তুইও বিয়ে থা ক'রে সুখী হ' নীলা। আগের সে সব কথা ভুলে যা। দোষ তোর একার ছিল না। তা ছাড়া তোর তখন কীই বা বয়স। সব দোষ করেছে সুধীর। প্রাণ দিয়ে সে তার প্রায়শ্চিত্তও কবে গেছে। তা প্রায়শ্চিত্ত তোরা দু' বোনও কম করিসনি, কম জ্বলিসনি কম পুড়িসনি। ঢের হয়েছে—'

নীলা এ সব কথার কোন জবাব না দিয়ে শাড়ি আর গামছা নিয়ে বাথরুমে ঢুকল।

অরুন্ধতী নিজেই একটু অপ্রস্তুত হলেন। নিজের ওপরই রাগ হতে লাগল তার। সত্যিই তাঁর কি আক্কেল বুদ্ধি সব নষ্ট হয়ে গেছে? কোন্ আক্কেলে তিনি সেই সব পুরোন কথা নীলার সামনে তুললেন? শুকিয়ে যাওয়া ঘা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ফের নতুন করে দিলেন? সবাই যেমন ভুলেছে,

উমা যেমন ভুলেছে, নীলাও তেমনি ভুলবে। ভুলবে কি, এই ক' বছরে অনেকখানি ভুলেও গেছে? মা হিসেবে এখন উচিত নীলার বিয়ে দেওয়া। যদি আপত্তি ও করে সে আপত্তি মোটেই গ্রাহ্য না করা। মেয়ের সুখের জন্যেই নিজেকে একটু কঠিন হতে হবে অরুন্ধতীর। কিন্তু মেয়ে মানুষ হয়ে তিনি একা কী করবেন। অসিত তো মানুষ নয়; সে যদি তেমন ছেলে হ'ত তাহলে অনেক দিন আগেই বিয়ে থা দিতে পারত বোনের। কিন্তু তার কি কোন দায়িত্বজ্ঞান আছে, নাকি লক্ষ্য আছে সংসারের কোন দিকে? বদলি হয়ে আরো ভালো হয়েছে তার। মা-বোনের কাছে শুধু দু-একখানা পোষ্টকার্ড লিখবে আর মাস ফুরুলে খরচের টাকা পাঠাবে। কিন্তু শুধু টাকা পাঠালেই কি মানুষের সব দায়িত্ব সব কর্তব্য শেষ হয়? ছেলের ওপর ভারি রাগ হ'তে লাগল অরুন্ধতীর।

নেয়ে-খেয়ে সকাল সকাল স্কুলের জন্যে তৈরী হোলো নীলা। ঘর থেকে কেবল পা বাড়িয়েছে, অরুন্ধতী ডেকে বললেন, 'নীলা শোন্।'

নীলা মুখ ফিরিয়ে তাকাল, 'কী বলছ?'

অরুন্ধতী বললেন, 'শ্যামলকে একবার খবর দিতে পারিস? অসিত যাওয়ার পর একদিনও এ মুখো হোলো না।'

নীলা বলল, 'তার যদি এ মুখো হতে ইচ্ছে না হয়, তুমি কী করবে বল।'

অরুন্ধতী বললেন, 'কথার ছিরি দেখ মেয়ের। ইচ্ছে অনিচ্ছের কথা এর মধ্যে এল কিসে। হয়তো কাজকর্মে ব্যস্ত আছে, ভগবান না করুন অসুখ-বিসুখ হওয়াও বিচিত্র নয়। মানুষের শরীরের কথা কি কিছু বলা যায়! চারদিকে যে জ্বরজারি হচ্ছে আজকাল। আমি বলি কি নীলি, তুই একবার ফোন ক'রে শ্যামলের খবর নে।'

নীলা মুখ ফিরিয়ে মায়ের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করল। কিন্তু অরুন্ধতীর শান্ত সরল দৃষ্টিতে ছেলের বন্ধুর জন্যে স্বাভাবিক উদ্বেগ ছাড়া আর কিছু আছে বলে তার মনে হোলো না। নীলা নিশ্চিত হয়ে বলল, 'অত ভাবছ

কেন মা। এই তো দিন তিনেক আগেই শ্যামল বাবুর সঙ্গে আমরা দাদাকে হাওড়া ষ্টেশনে তুলে দিয়ে এলাম। সেদিনই তো তিনি বলেছিলেন দাদা বদলী হওয়ায় ইউনিয়নের কাজ তাঁর ওপর আরও বেশী ক'রে চাপবে। বোধহয় সেই জন্যেই সময় পেয়ে উঠছেন না।'

নীলার কথার মধ্যে একটু যেন মমত্ব আর সহানুভূতির ছোঁয়া পাওয়া গেল। মেয়ের মনের এই কোমলতা ভালোই লাগল অরুন্ধতীর। ও যে সব সময় মানুষকে খোঁটা দেয়, খোঁচা দেয়, কড়া কড়া কথা বলে তাতে তিনি অসন্তুষ্টই হন। শুধু অসন্তুষ্ট নন, চিন্তাই হয় তাঁর মেয়ের জন্যে। ভাবেন মেয়েটা বুঝি চিরদিনের জন্যে বিগড়ে গেল। ও বুঝি সেই জ্বালা ভুলে গিয়ে সহজ শান্ত স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারল না। তাই মাঝে মাঝে ওর মধ্যে যখন দয়ামায়া স্নেহমমতার আভাস মেলে অরুন্ধতী একটু নিশ্চিন্ত বোধ করেন।

নীলার ওপর নির্ভর ক'রে চুপচাপ বসে রইলেন না অরুন্ধতী। শ্যামলের বাসার ঠিকানায় একখানা পোষ্টকার্ডে তার কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করে তাকে আসতে লিখে দিলেন।

দিন দুয়েক বাদে সন্ধ্যার একটু আগে আগে শ্যামল এসে হাজির হয়ে বলল, 'ব্যাপার কী মাসীমা, এমন জরুরী তলব যে।'

অরুন্ধতী অভিমানের ভঙ্গিতে বললেন, 'আর মাসীমা। মাসীমা বলে যে কেউ এখানে আছে তা কি আর তোমার মনে আছে বাপু?'

শ্যামল হেসে বলল, 'খুব মনে আছে মাসীমা। শুধু আপনি কখন ডেকে পাঠান তার অপেক্ষায় ছিলাম। আর একবার সাধিলেই খাইব সেই দশা আর কি।'

অরুন্ধতী মুখ টিপে হাসলেন, 'কথা শোন ছেলের। কেন, না ডাকলে কি তুমি এখানে আসতে পার না? অসিত বদলী হয়ে গেছে বলে আমরা কি এমনই পর হয়ে গেছি?'

শ্যামল বলল, 'হয়েছেন কিনা তাই পরীক্ষা ক'রে দেখলাম।'

অরুন্ধতী হেসে বললেন, 'আচ্ছা ছেলে বটে! স্নেহভালবাসারও আবার পরীক্ষা নিতে হয় বুঝি?'

শ্যামল গম্ভীরভাবে বলল, 'হয় বৈকি।'

অরুন্ধতী বললেন, তা পরীক্ষার ফল কী হোলো, পাশ করেছি!'

শ্যামল বলল, 'আপনি কোন রকমে উৎরে গেছেন। কিন্তু আর একজন একেবারে ডাহা ফেল।'

বলে শ্যামল ইসারায় নীলাকে দেখিয়ে দিল।

নীলা আরক্ত হয়ে বলল, 'আমার ফেলই ভালো। আপনার পরীক্ষায় আমার পাশ করবার ইচ্ছে নেই।'

একটু বাদেই সেখান থেকে উঠে গেল নীলা। অরুন্ধতী চা আর খাবার দিয়ে যেতে বললেন শ্যামলকে।

একটু পরে অসিতের কথা উঠল। সে শ্যামলকেও ওই রকম পোষ্ট-কার্ডের ছোট চিঠি লিখেছে। শুধু পৌছ সংবাদ আর কুশল সংবাদের আদান-প্রদান। আর কোন কথা নেই।

শ্যামল বলল, 'তার জন্যে দুঃখ করিনে মাসীমা। মানুষ যত বড় হয় তার পত্র তত ছোট হতে থাকে।'

অরুন্ধতী বললেন, 'তোমার যা কথা, বড় না ঘোড়ার ডিম হয়েছে।'

এর পর শ্যামলের আসা যাওয়া নিয়মিত চলতে লাগল। অফিস ছুটির পর প্রায়ই নীলাদের বাসায় চলে আসে। চা খেতে খেতে ব্যাঙ্কের গল্প বলে। ইউনিয়নের জোর কী ভাবে বেড়ে চলেছে তার খবর দেয়। তিনজনের সেই ছোট্ট সভা বেশ জমে ওঠে। শ্যামলের অসংকোচ ব্যবহারে নীলার সংকোচও কমে গেছে। সেও সহজভাবে আলোচনায় যোগ দেয়। মাঝে মাঝে শ্যামলকে খোঁটা দিয়ে বলে, 'জোরের বড়াই আর করবেন না। আপনাদের যত জোর কাগজে কলমে। শক্তি পরীক্ষার সময় যেদিন আসবে সেদিন কাউকেই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

শ্যামল বলে, 'পাওয়া যায় কি না যায় দেখবেন। কর্তাদের মনের ইচ্ছে

ছিল আমাকেও অসিতের মতো ওইরকম ছোটখাট একটু ইন্দ্রত্ব দিয়ে বাইরে পাঠান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় সেটা নিরাপদ মনে করলেন না। বড়কর্তা তো একেবারে সরাসরি বরখাস্তের কথাই ভেবেছিলেন। কিন্তু ছোট কর্তা বাধা দিয়ে বলেছেন তাতে হৈ চৈ হবে। আর কিছু না হোক অন্তত হৈ চৈ-এর ভয়টা কর্তারা আজকাল পেতে শুরু করেছেন।'

নীলা বলল, 'হৈ চৈও বলা যায়, আবার চড়ুই পাখির কিচির-মিচিরও বলা যায়। বুদ্ধিমান গৃহস্থ সেই কিচির-মিচিরটুকু এড়িয়ে যেতে চায়। সুরপতিবাবুরাও তাই চাইছেন।'

নীলা শ্যামলের কোন কৃতিত্ব স্বীকার করতে চায় না। তার সমস্ত আত্মপ্রসাদকে ঠাট্টা তামাসায় ধূলিসাৎ করে দেয়। তবু শ্যামলের এখানে আসতে ভালো লাগে, নীলার সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ভালো লাগে। এ ভালো লাগা যে তার একার নয়, সে কথা শ্যামলের বুঝতে বাকি নেই।

অরুন্ধতীও তা বুঝতে পেরেছেন এবং পেরে খুসী হয়েছেন। তিনি অপেক্ষা করছেন শ্যামল কবে মুখ ফুটে বলবে। ও যদি না বলে অরুন্ধতীকেই অবশ্য বলতে হবে। কিন্তু যা দিনকাল, তাতে ওদের দিক থেকে প্রস্তাবটা এলেই সব চেয়ে ভালো হয়।

জায়গাটা অসিতের ভালই লাগছে, নাগপুর শহরের উপান্তে দেশলক্ষ্মীর এই ছোট্ট ব্রাঞ্চ। সব মিলিয়ে দশ বার জন কর্মচারী। সে তুলনায় ব্যবস্থা খারাপ নয়। একতলায় ব্যাঙ্ক, উপরের তলায় কর্মচারীদের মেস। ম্যানেজারের ঘরটা অবশ্য কোণের দিকে একটু নিরিবিলি। বেশ বড় ঘর। ইচ্ছে করলে সস্ত্রিক থাকার বাধা নাই। চওড়া বারান্দায় অস্থায়ী একটু পার্টিসনের অপেক্ষা শুধু, অবশ্য বিদায়ী ম্যানেজার গোপেন বাবু এ ঘরে একাই থাকতেন। অসিতের তো সস্ত্রিক থাকার প্রশ্নই ওঠে না। প্রশস্ত ঘর পেয়ে মনে মনে খুশি হল অসিত, কলকাতার ইঞ্চি মাপা জায়গা নয়।

ইচ্ছেমতো ছড়িয়ে-টড়িয়ে থাকা যাবে। পূবদিকে বড় একটা জানলা। জানলা দিয়ে তাকালে মধ্য ভারতের রুক্ষ কঠিন রূপ চোখে পড়ে। দিক-চক্রবালে ধূসর পাহাড়ের আভাস। সেদিকে তাকিয়ে অসিত একেক সময় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। এই বিচিত্র পৃথিবী, বিচিত্র প্রকৃতির কতটুকুই বা দেখা যায়, কতটুকুই বা দেখার সুযোগ হয় এক জীবনে। তবু ভাগ্যচক্রে এখানে যখন একবার এসে পড়েছে তখন যেখানে যেটুকু দ্রষ্টব্য আছে সব ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে। অবশ্য এই ভাল লাগা, এই ঘুরে ঘুরে দেখার প্রতিজ্ঞা এ সমস্তই আজ; এখানে আসার এক সপ্তাহ পরে। প্রথম দিন রীতিমতো খারাপ লাগছিল। ষ্টেশনে নেমে কেমন যেন ভারি অসহায় মনে হয়েছিল নিজেকে, মনে হয়েছিল কলকাতা থেকে কত দূরে এসে পড়েছে। এখন শুধু চিঠি ভরসা। যোগাযোগের সেতু শুধু চিঠি। নাম ধাম জেনে নিলেও এই ব্রাঞ্চের কারো সঙ্গেই অসিতের মৌখিক আলাপ ছিল না। ষ্টেশনে নামতেই বাইশ তেইশ বছরের একটি ছেলে ওকে অভ্যার্থনা করল।

'আসুন স্যার টাঙ্গা ঠিক করে রেখেছি।'

অসিতের বুঝতে দেরি হল না গোপেন বাবু আসেননি, অন্য কোন এমপ্লয়িকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু ছেলেটি কে?

আত্মপরিচয় দিয়ে ছেলেটি বলল, 'আমি স্যার চিত্ত সেন, এখানে ডেস্‌পাসে আছি। ব্রাঞ্চের ব্যাপার, আর বলেন কেন, ডেসপাস রিসিভিং দুটোই এক হাতে দেখতে হয়। গোপেনবাবুরই আসার কথা ছিল। কিন্তু ভোরের গাড়ি, এত সকালে তাব ঘুম ভাঙলে তো। সকালে ডাকাডাকি করতেই পাশ বালিশ জড়িয়ে ধরে বিড়বিড় করে বললেন আঃ আবার আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন। দাদার লেট আওয়ার রিসিভার রিসিভ হিম্‌, চিত্ত লক্ষ্মী ভাইটি প্লিজ, - কেউ না গেলে ভদ্রলোক কী ভাববেন বল দেখি।' একটু থেমে চিত্ত ফের বলল, 'আমার আবার কী দোষ জানেন কেউ কিছু রিকোয়েষ্ট করলে ফেলতে

প্যারি না। তাছাড়া আপনি আসছেন, আপনাকে রিসিভ করা আমাদের সবারই তো কর্ত্তব্য।'

অসিত চুপ করে রইল।

কিন্তু নতুন মানুষ পেয়ে চিত্তর কথা আর ফুরোতে চায় না। রাস্তায় যেতে যেতে আঙুল দিয়ে এ রাস্তার নাম বলে ও পাশের বিল্ডিংয়ের পরিচয় দেয়। তারপর এক সময় বলে, 'আমাদেব বিষয় কিছু শুনলেন নাকি স্যার।'

'কোন বিষয়?'

চিত্ত বলল, 'এই রিট্রেঞ্চমেণ্টেব কথা. শুনছি এ ব্রাঞ্চেও নাকি ছাঁটাইর কথা উঠেছে।'

অসিত বলল, 'না এখন পর্যন্ত কিছু শুনিনি। তবে কর্তৃপক্ষের যা মতিগতি তাতে কিছুই বলা যায় না।'

চিত্ত একটু যেন চিন্তিত হয়ে উঠল।

অসিত হেসে বলল, 'অমনি ভয় পেয়ে গেলেন বুঝি। না না হঠাৎ কিছু করবে বলে মনে হয় না।'

খুসি হয়ে চিত্ত বলল, 'তা জানি স্যার। আর সেটা যে কাদের ভয়ে তাও কিছু কিছু শুনেছি। আপনার কথা, শ্যামলবাবুর কথা আমরা প্রায়ই বলাবলি করি। কিন্তু বড় জাঁদরেল লোক সুবপতি। কোন দিক দিয়ে কী চাল চালবেন সেটা টের পেতে পেতেই দেখব চাকরি নট হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, আপনারাও ছেড়ে দেবেন না।'

অসিত হেসে বলল, 'আমরা কি আপনাদের ছাড়া চিত্তবাবু? আর আপনি ওরকম 'স্যার' 'স্যার' করেন, শুনতে বড় খারাপ লাগে, আমাকে অসিতবাবু বলেই ডাকবেন।'

চিত্ত লজ্জিত হয়ে বলল, 'সে আর বলে দিতে হবে না। আস্তে আস্তে দেখবেন সবই খসে পড়বে। গোপেনবাবুকে তো শেষে গোপেনদায় এসে ঠেকিয়েছিলাম। ভারি আমুদে লোক কিন্তু গোপেনবাবু।'

অসিত হেসে বলল, 'খুব বুঝি আমোদ ফূর্তি করেন আপনারা?'

চিত্ত বলল, 'তেমন কিছু নয়, এই কাঠখোট্টা পাথুরে দেশে আমোদ করার কীই বা আছে। মাঝে মাঝে একটু গান-টানের আসর বসে, এই আর কি। আমার আবার একটু ডান্সের বাতিক আছে কিনা।'

অসিত অবাক হয়ে বলল, 'আপনি নাচতে জানেন নাকি।'

লজ্জিত ভঙ্গিতে চিত্ত বলল, 'জানি এক-আধটু, অবশ্য তেমন কিছু নয়। নাচ-গানের ব্যাপারে গোপেনদারও ভাবি উৎসাহ। তবে মাঝে মাঝে বড় বাড়াবাড়ি করে বসেন।'

অসিত বলল, 'কী রকম?'

চিত্ত গলা নিচু করে বলল, 'একটু ড্রিঙ্ক ক্রিঙ্ক কবার দোষ আছে কিনা। সরস্বতী পূজার দিন সন্ধ্যাবেলা একটু জলসার মতো করা হয়েছিল। হুকুম হোল আমাকে মেয়ে সেজে নাচতে হবে। ঝিয়ের মারফৎ সাড়ি ব্লাউজ এসে হাজির। নাচতে পারব না কেন। পারি। নাচলাম মেয়ে সেজেই। কিন্তু গোপেনদার কাণ্ড! সবাইর মাঝখানে একেবারে ঝাপটে জড়িয়ে ধরলেন।'

অসিত আড়চোখে চেয়ে দেখল লজ্জায় চিত্তের মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

লজ্জিত হয়ে চিত্ত বলল, 'সেই থেকে সবাই আমাকে 'গোপা' বলে ডাকে। আমি অবশ্য তাতে চটি না। সবাই যদি তাতে একটু আমোদ পায় তো পাক।'

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে গোপেনবাবু রাত্রের ট্রেণেই কলকাতা রওনা হলেন। তার ছেড়ে যাওয়া ঘরে শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত অসিতের চোখে ঘুম এলো না। স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে এসে এই বিদেশ বিভুঁয়ে সামান্য একটু আমোদ-প্রমোদের জন্য এই ক'টি লোকের কি আকুলি-বিকুলি, ভুলে থাকবার ভুলে যাবার কত উদ্ভট সব আয়োজন। বড় কোন আশা নয়, কামনা নয় শুধু যেটুকু আছে, এ চাকরিটুকু যেন বজায় থাকে।

শুধু সেই দুশ্চিন্তা।

নতুন ম্যানেজারকে পেয়ে কেবল চিত্ত সেনই নয়, অন্যান্য কর্মচারীরাও যে খুশি হয়েছে এই কয়েক দিনেই অসিত সেটা টের পেয়েছে। কিন্তু অসিত এদের পেয়ে সুখী হতে পারল কই। প্রত্যেকটি মানুষই কেমন যেন স্বার্থসর্বস্ব, কী এক ধরণের বিকারপ্রাপ্ত। সেদিন বিল ক্লার্ক অমিয়বাবু এসে অনেকক্ষণ অসিতের ঘরে কাটিয়ে গেছেন। চারুদর্শন অমায়িক ভদ্রলোক। নাগপুরের অনেক গল্প করলেন, শোনালেন বিচিত্র অভিজ্ঞতাব কাহিনী। কিন্তু যাওয়ার আগে সেই অমিয়বাবুই যখন একাউণ্ট্যাণ্টের বিরুদ্ধে কিছুটা বিষোদ্গাব না কয়ে পারলেন না, অসিতের সমস্ত মন ঘৃণায় রি রি করে উঠল। কেন মানুষের এই সঙ্কীর্ণতা? পরস্পরের প্রতি এই বিদ্বেষ ভাবের আসল উৎস কোথায়? এ নিয়ে শ্যামলেব সঙ্গে অনেক দিন তর্ক হয়েছে অসিতের। শ্যামলের মতে এর মূল কারণ আমাদের অর্থনীতি। আমাদের অসম অর্থব্যবস্থাই এব জন্য সর্বাংশে দায়ী। সর্বাংশে না হোক কিছু অংশে যে দায়ী একথা অসিতও অস্বীকার করে না। কিন্তু আর্থিক বৈষম্যই কি সব। মানুষ ইচ্ছা করলে চেষ্টা করলে কি এর মধ্যে থেকেও একটা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ পেতে পারে না। নাকি সে পথে সে ভাবে ভেবে দেখবার ধৈর্যই আজ আর কারো নেই। সম-বণ্টন, সমান অধিকাব এই দাবীতেই সকলে মত্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাতেই বা ফল কি? দেশলক্ষ্মীর ব্যাপার নিয়েই সমস্যাটাকে অসিত অনেকবার ভেবে দেখেছে। সুরপতি যে পথে চলেছেন তাতে একটা বিরোধ অনিবার্য হয়েছে। সে বিরোধ যে আসন্ন এটাও কোন পক্ষেব জানতে বাকি নেই। কিন্তু অসিত যেন এই সংগ্রামে আর তেমন উৎসাহ পাচ্ছে না। সংগ্রাম মানেই তো এক পক্ষের জয় আর অন্য পক্ষের হেরে যাওয়া। হয়ত শ্যামলদেরই জয় হবে শেষ পর্যন্ত। সুরপতিকে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু অসিত কি তাতেই সুখী হতে পারবে। সুরপতির পরাভবের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি মুখও তো ম্লান হয়ে যাবে। শেষ দেখে আসা সুজাতার মুখখানা অসিতের মনে পড়ল। ওর এই মুহূর্তের মনের খবর জানতে পারলে শ্যামল নিশ্চয়ই বাঁকা হাসি হেসে বলত, ও

তোমার আসল নিস্পৃহার কারণটা তাহলে এই। অবশ্য তা কি আমরাই জানি না। কিন্তু কিছুই জানে না শ্যামল। শুধু সুজাতারই নয়, কারও মুখই ম্লান দেখতে চায় না অসিত।

গোপেনবাবু কয়েক ঘণ্টায় চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে গেলেও তার মধ্যে যে কিছু কিছু ফাঁক আর ফাঁকি রেখে গেছেন কাজে হাত দিয়েই অসিত তা বুঝতে পারল। কিন্তু সেটুকু সামলে নিতে অসিতের বিশেষ বেগ পেতে হল না। ব্যাঙ্কের কাজকর্ম এখন আর অসিতের কাছে জটিল নয়। বছর খানেকের মধ্যেই এক ধরণের অভ্যস্ততা এসে গেছে। অধস্তন কর্মচারীদের ওপর হম্বিতম্বিটুকু বাদ দিতে পারলে ব্রাঞ্চের কাজ এমন কিছু বেশী নয়। কিন্তু অবনী মাঝে মাঝে পত্রাঘাতে অসহ্য করে তুলছে। সুরপতির আড়াল রচনা করে নানা ধরণের কৈফিয়ত তলব করছে। অবশ্য অবনীর অভিসন্ধি অসিতের বুঝতে বাকি নেই। রেকর্ড পত্রে তাকে ইনএফিসিয়েণ্ট প্রমাণ করার জন্যই অবনীর এই হীন চেষ্টা। অবনীর ঈর্ষা এবার নতুন পথ খুঁজছে। কাছাকাছি থেকে যে জলুনিকে অবনী অতি কষ্টে নিজের মধ্যে চেপে রাখত দূর থেকে এখন সেই জ্বালা চিঠি পত্রে ছড়িয়ে দিতে পেরে শান্তি পাচ্ছে। তা পাক। অসিত সে সব গায় মাখে না। তিন চারখানা চিঠি আসার পর, নিতান্তই যে জবাবটুকু না দিলে নয়, সংযত, সংক্ষিপ্ত চিঠিতে সেই বিষয়টুকুই অবনীকে অসিত লিখে পাঠায়।

চার্জ বুঝে নিয়ে অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ক'রে তাদের কাজের ধরণ ধারণ দেখে নিতে নিতে দিন কয়েক কেটে গেল অসিতের। বেশ একটু ব্যস্ততার মধ্যেই কাটল। এর মধ্যে শুধু শ্যামল আর মাকে দু'খানা পোষ্টকার্ডে পৌঁছ সংবাদ দেওয়া ছাড়া ব্যক্তিগত আর কোন চিঠিপত্র অসিত লিখতে পারেনি। কিন্তু এক জনের কাছে চিঠি লেখার কথা তার নানা ব্যস্ততার মধ্যেও বারবার মনে পড়েছে। অবশ্য যতবার মনে পড়েছে ততবার এই মনে পড়ার কারণকে বিচার বিশ্লেষণ করতেও অসিত ছাড়েনি। নিজের মনের কাছে তো আর কিছু গোপন নেই। অনেকদিন

গোপন করবার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়েছে। সুজাতার ওপর তার এই আকর্ষণ অনুরাগকে বন্ধুত্বের ছদ্মনামে ডাকবার চেষ্টা করেছে বহুদিন। কিন্তু নিজেই বুঝতে পেরেছে এ ঠিক বন্ধুত্ব নয়। সুজাতার সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ দিনের পর দিন প্রচ্ছন্নভাবে গড়ে উঠছে, নিছক বন্ধুত্বের স্বাদ থেকে তার স্বাদ আলাদা, সুজাতার কথা মনে হ'লে এক অপূর্ব উল্লাসে মন ভরে ওঠে। তার সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে যতবার কথা হয়েছে সব মনের মধ্যে ফের গুঞ্জন করতে থাকে। মনে হয় সব বাধা ডিঙিয়ে সুজাতা কাছে আসুক, সব বাধা চুরমার করে অসিত তার সামনাসামনি গিয়ে দাঁড়াক। নিজের মনকে জানতে আর বাকি নেই অসিতের। কিন্তু সুজাতার মন! তার আচারে আচবণে কি এমন কোন নিদর্শন পেয়েছে অসিত যা শিষ্টাচার সৌজন্যের অতিবিক্ত যা সাধারণ বন্ধুত্বের চেয়ে বেশি। সুজাতা ধনী ব্যাঙ্কারের একমাত্র মেয়ে। সেই ধনী সমাজেরই একজন কৃতী যুবকের সঙ্গে বিবাহের বাগদানে আবদ্ধ। অসিতের মত একজন দরিদ্র কর্মচারীর সঙ্গে তাব ভদ্রতার সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে? কিন্তু এই বাস্তব বিচারে অসিতের মন বেশিক্ষণ আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। অবাস্তব কল্পলোকে মন আপনা থেকেই ভেসে যায়। একটি মেয়ের সাধারণ তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথাবার্তা, চোখের দৃষ্টির, মুখের হাসিকে ঘিরে মন রঙীন স্বপ্নের জাল বুনতে থাকে।

অসিত যত ভাবে এই পাকে নিজেকে জড়াবে না, ধরা দেবে না, ততই যেন আরো বেশি ক'রে জড়িয়ে পড়ে। এ কি উর্ণনাভের বৃত্তি তাকে পেয়ে বসল!

পরেশপুরে আসা অবধি একটি ছোট অনুরোধ এক টুকরো গানের কলির মত অসিতের মনের মধ্যে গুণ গুণ করছে, 'চিঠি দেবেন।' আসবার আগের দিন সুজাতা বলেছিল। যত ব্যস্তই থাকুক একখানা চিঠি অসিত নিশ্চয়ই লিখতে পারত। কিন্তু কী লিখবে সেই তো সমস্যা। আজও ব্যাঙ্কের আর সব সহকর্মীরা ঘুমিয়ে পড়বার পর নিজের ঘরে বসে

গভীর রাত্রে প্যাডের পাতা খুলে সেই সমস্যার কথাই ভাবতে শুরু করল অসিত—কী লিখবে। মনের মধ্যে যত কথা ভিড় করে আসে তার সবই তো লেখা যায় না। কিছুটা বাদ দিয়ে কিছুটা রাখতে হয়। খানিকক্ষণ ভেবে অনেক চিঠির খসড়া মনে মনে রচনা করে এবং মনে মনে বাতিল ক'রে শেষ পর্যন্ত অসিত স্থির করল সুজাতাকে কিছুতেই দু'চার লাইনের বেশি লিখবে না। কিছুতেই ধরা দেবে না অসিত। নিতান্তই পৌঁছ সংবাদ ও শিষ্টাচারসূচক দুটি একটি কুশল প্রশ্নের পরই আজকের চিঠি অসিত শেষ করবে।

কিন্তু লিখতে বসে মনের সে সঙ্কল্প কোথায় ভেসে গেল অসিত টেরও পেল না। পাতার পর পাতা তার ছোট ছোট অক্ষরে ভরে উঠতে লাগল। মনের কত আবেগ, কত ক্ষোভ, কত নৈরাশ্য, কত আশার কথা যে সে একজন অনাত্মীয়া মেয়েকে লিখতে লাগল তার কোন হিসাব রইল না! এ যেন ঠিক চিঠি নয়, ডায়েরি। নিজের মনে মনে কথা বলা। এমন কথা যা আর একজনের কানে কানে বলা যায়।

ব্যাঙ্কের গায়েই ডাক বাক্স। চিঠি শেষ করে সেই রাত্রেই খামে ভরে অসিত সেটা পোষ্ট ক'রে এল। কি জানি যদি পরদিন ভোরে উঠে এ চিঠি শেষ পযন্ত আর না পাঠাতে পারে অসিত। যদি নিজের কাণ্ড দেখে নিজেই লজ্জিত হয়। এমন এর আগেও দু' একবার হয়েছে। সুজাতাকে রাত্রে লেখা চিঠি দিনের বেলায় বেলায় অসিত ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তারপর ছিঁড়ে ফেলার জন্যে আবার খুঁৎ খুঁৎও করেছে মনে মনে। না ছিঁড়লেই হত, কী এমন দোষ হ'ত সুজাতাকে চিঠিটা পাঠিয়ে দিলে। এই দ্বিধা আর অন্তর্দ্বন্দ্বের হাত থেকে পাওয়ার জন্যে চিঠি রাত্রেই পোষ্ট করে এল অসিত। তারপর থেকে জবাবের প্রতীক্ষা করতে লাগল। রোজ বহু বৈষয়িক চিঠিপত্র ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের নামে এল, কিন্তু সেই বহুবাঞ্ছিত চিঠিখানা আসবার লক্ষণ দেখা গেল না।

সুজাতার চিঠি পাওয়ার আগে শ্যামলের চিঠি পেল অসিত। আর

পেল অরুন্ধতীর। ত্বখানা চিঠির মধ্যেই ত্বটি বিশেষ ধরণের সংবাদ ছিল।

শ্যামল লিখেছে :

অসিত,

তোমার ত্ব' লাইনের পৌছ সংবাদ ঠিকই পেয়েছি। ডাকের গোলযোগে তা হারিয়ে যায়নি। চিঠি হারায়নি, কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের গুরু দায়িত্বের আর পদগৌরবের মধ্যে আমাদের ছোট ইউনিয়নের ছোট প্রেসিডেন্টকে আমরা হারিয়ে না ফেলি। তোমার চিঠিতে আমাদের ইউনিয়ন সম্বন্ধে কোন উপদেশ নির্দেশও নেই, কোন ঔৎসুক্য কৌতূহলও নেই। এই নাস্তিত্বই আমাদের কাছে পরম ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাই হোক ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক তোমার যদি ভিতরে ভিতরে ছিন্নই হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তা স্পষ্ট জানাতে দ্বিধা কোরো না। লজ্জা কি, জীবনে এমন কত সম্পর্ক ভাঙে, আবার কত সম্পর্ক নতুন করে গড়ে ওঠে।

তুমি যদিও জিজ্ঞাসা করনি, তবু এখানকার কিছু খবর তোমাকে শোনাচ্ছি. এ খবর তুমি হয়ত আগেই পেয়েছ। কিংবা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সরকারী টীকাটিপ্পনির সঙ্গে পাবে। তখন সে খবরেব চেহারা অন্যরকম হয়ে'যাবে। স্থানকাল ভেদে মানুষের চেহারাই বদলায়, আর এ তো খবর।

আমাদের ভাতা, বোনাস আর ছুটির ছোট খাট দাবির তালিকা পেশ নিয়ে যখন আমরা জল্পনা কল্পনা করছি তখন ত্ব' একটা বড় বড় কাণ্ড ঘটল। শহরের তিনতিনটি ব্যাঙ্ক রাতারাতি তালাবন্ধ ক'রে ফেললে। সে খবর তোমার নিশ্চয়ই কানে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের হেড অফিসেও যে হঠাৎ সেদিন 'রান' হয়েছিল সে সংবাদ কি তুমি যথাযথভাবে পেয়েছ? অবশ্য সুরপতিবাবু হুঁসিয়ার মানুষ। এবারকার মত টাল তিনি সামলেছেন। তিনি তাল ঠুকে বলেছেন তাঁকে কেউ কাত করতে পারবে না। কিন্তু বাইরের লোকের চোখে সংশয় দেখা দিয়েছে, তাদের কানে

নানারকম কথা যাচ্ছে। হয়ত এখনই আশঙ্কা করবার কোন কারণ ঘটেনি। কারণ সুরপতিবাবুর ওপর এ বিশ্বাস সকলের আছে যে তিনি পৃথিবীর আর কিছুকে ভালো না বাসুন নিজের ব্যাঙ্ককে নিজের প্রাণের মতোই ভালোবাসেন। ব্যাঙ্কের ওপর তাঁর অগাধ মমতা, সে সম্বন্ধে কারো মনে সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু মমত্ব আর ইষ্ট বুদ্ধি কি মানুষকে সব বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করতে পারে? এই কার্য কারণের শিকলে আবদ্ধ আর্থিক দুনিয়ায় একজন মানুষের মমতা আর ক্ষমতার জোর কতখানি সে সম্বন্ধে আমাদের সংশয় আছে। কিন্তু সুরপতিবাবুর কোন সন্দেহই সম্ভবতঃ নেই। নিজের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরোবা' অনুরূপ। তাই আমার মনে হয় আমাদের পক্ষেও অস্তিত্বের সংগ্রাম আসন্ন। আমাদের ইউনিয়নকে সেই ভাবেই তৈরী হতে হবে।

শোনা যাচ্ছে ব্যাঙ্কের পরিচালনার ব্যাপার নিয়ে সুরপতিবাবুর সঙ্গে অন্য দু' একজন ডিরেক্টরের মতদ্বৈধ ঘটছে। কিন্তু এ সব উঁচু মহলের খবর তোমারই তো বেশী জানবার কথা। আমরা আদার ব্যাপারী। আর তুমি জাহাজে উঠি উঠি করছ, কি জানি হয়ত বা উঠেও বসেছ।

এবার বিদায় নিই। কড়া কড়া কথায় চিঠি ভরে দিলাম। তুমি রাগে কী রকম ছটফট করছ তা চর্মচক্ষে দেখতে না পেলেও কল্পচোখে অবলোকন করতে পারছি। তুমি আমাকে একবার ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিলে যাত্রা দলের বিবেক। কিন্তু সেনাপতি আর রাজকন্যার মাঝখানে এমন এক একজন বিবেককে মাঝে মাঝে আসতে হয়। নইলে পালা জমে না। ইতি

তোমার রূঢ়ভাষী
মূঢ় বন্ধু শ্যামল

দ্বিতীয় চিঠি অরুন্ধতীর। তিনি লিখছেন:

পরম কল্যাণীয়েষু,

দু'দিন দু'রাত উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় কাটাবার পর তোমার পৌঁছ সংবাদ পেলাম। 'নিরাপদে পৌঁছেছি, ভালো আছি।' দুটি তো মাত্র কথা। এই দুটি কথা যদি একটু আগে আমাকে জানাতে, আমাকে এমন অস্থির-ভাবে অশান্তিতে কাটাতে হত না। কিন্তু তোমার গুণ তো আমি ছেলেবেলা থেকেই জানি। মাকে দুশ্চিন্তা ও অশান্তির মধ্যে না রাখতে পারলে তোমার শান্তি নেই। যাক, তুমি আর ছোট নও। ভালো মন্দ, বুঝবার বয়স তোমাব হয়েছে। যা ভালো বুঝেছ তাই করেছ। মান অভিমান ক'রে কোন লাভ নেই। দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় কে কোথায় দিন গুণছে সে কথা ভাববার কি আর তোমাব সময় আছে? ছেলেরা বড় হ'লে মার কথা তাদের কতটুকুই বা মনে থাকে।

যাক, আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। দয়া করে নিজের শরীরের দিকে একটু লক্ষ্য রেখ। আর নাওয়া খাওয়ার সময়টা ঠিক রেখ। খাওয়া দাওয়ার কী ব্যবস্থা হয়েছে, কে রান্না ক'রে দেয় কী রকম রান্না সব জানায়ো।

অবশেষে আর একটা কথা লিখছি। নীলার বিয়ের কথা। আমি ভেবেছিলাম বড় ভাই হিসাবে নিজেই উদ্যোগী হয়ে এ সব কর্তব্য করবে। কিন্তু তুমি তো এক ব্যোম ভোলানাথ। নিজের বিয়েব কথা তো কানেই তোল না। বোনের যে একটা গতি করতে হবে সেদিকেও তোমার খেয়াল নেই। নীলা যাই বলুক, অল্প বয়সে একটা ভুল করেছিল বলে সারাজীবন ধরেই যে সে তার শাস্তি পাবে এমন কথায় আমার প্রাণ সায় দেয় না। উমার ভাগ্যে যা ঘটবার ঘটেছে। তার তো আর কিছু করবার নেই। ভগবানের আশীর্বাদে ওর একটি ছেলে আছে। সে বেঁচে থাকুক। উমার জীবন তাকে নিয়ে একরকম ক'রে নিয়ে কেটে যাবে। কিন্তু নীলার কী ক'রে কাটবে? ওর কী আছে? আমি তাই কিছুদিন

ধরেই নীলার বিয়ের কথা ভাবছিলাম। কিন্তু সাহস পাচ্ছিলাম না। এবার পেলাম। শ্যামলের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ ভাবটা লক্ষ্য ক'রে থাকবে। আমিও গোড়া থেকেই করছিলাম। তুমি চলে যাওয়ার পর ওদের সেই ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়েছে। না, বাড়াবাড়ি কিছু করেনি। শ্যামল আমার তেমন ছেলে নয়। অমনিই রোজ আসে, গল্প করে, ব্যাঙ্কের কাজকর্ম, ইউনিয়ন-টিউনিয়ন নিয়ে পরামর্শ করে তর্কবিতর্ক করে। কিন্তু তর্ক আর ঝগড়াই করুক, যত কাটা কাটা কথাই বলুক, আমার মেয়ের যে শ্যামলকে পছন্দ হয়েছে তা আমার বুঝতে বাকি নেই। আর শ্যামলের মনের ভাবও আন্দাজ করতে আমার ভুল হয়নি। তাই তোমার মত জিজ্ঞাসা না ক'রেই কাজটা ক'রে বসেছি। কাল নীলা এবং ওর এক বন্ধু—স্কুলের আর একটি টিচারের ছেলের অন্নপ্রাসনে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল। শ্যামলকে বোধ হয় সময়মতো খবর দিতে পারেনি। তাই সে কালও ছুটির পরে এসে হাজির। আমি চা-টা দিলাম। শেষে এ কথা ও কথার পর বলে ফেললাম, 'শ্যামল, আমাদের নীলাকে কি তোমার অযোগ্য মনে হয়?' শ্যামল বলল, 'না না অযোগ্য হবে কেন? ওতো খুব চমৎকার মেয়ে। ও যার ঘরে যাবে সে তো ভাগ্যবান।' আমি তখন বললাম, 'তোমার সম্বন্ধে নীলারও সেই ধারণা শ্যামল। তোমরা যদি সংসার বাঁধ সে সংসার সুখের সংসার হবে।' শ্যামল খানিকক্ষণ চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসে রইল তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আমি ব্যাপারটাকে এভাবে ভেবে দেখিনি মাসীমা। আমাকে একটু সময় দিন। তা ছাড়া আমি তো গরিব। ব্যাঙ্কের সামান্য চাকরিই সম্বল। সে চাকরিও কবে আছে কবে নেই। আমাদের ব্যাঙ্কে নানা রকম গোলমাল চলছে। এ অবস্থায়—।' আমি বললাম, 'অবস্থা মানুষের চিরকাল একরকম থাকে না শ্যামল। তাছাড়া নীলা আমার বোকা নয়, অক্ষম নয়। পাশে দাঁড়িয়ে ও তোমার সব কাজে সাহায্য করতে পারবে। আজই তোমার জবাব দেওয়ার দরকার নেই। তুমি ভেবে দেখ।' শ্যামল ঘাড় নেড়ে শান্তভাবে চলে গেল।

নীলা বাসায় আসবার পর শ্যামলকে আমি যা বলেছি তা তাকে সব বললাম। কথা শুনে মেয়ে কিন্তু শ্যামলের মত শান্ত রইল না। মেয়ে আমার রেগে ক্ষেপে চটে মটে একেবারে অস্থির। আমাকে ওসব কথা বলবার কে অধিকার দিয়েছে? আমার কি কোন মান-সম্মানবোধ নেই? একধার থেকে আরো যে কত কী বলতে লাগল সে আর তোমাকে কী বলব। কিন্তু আমি ওর সেই চণ্ডীমূর্তি দেখে ভয় পাইনি। নিজের পেটের মেয়েকে যদি না চিনব তবে আর এতদিন চিনলাম কী।

আমার তো মনে হয় আমি ভালোই করেছি। ওরা নিজেরা মুখ ফুটে যা বলতে পারছিল না আমি তা বলে দিলাম। এবার তোমাব মতামত জানতে চাই। তাড়াতাড়ি চিঠির জবাব দিয়ো। স্নেহাশীর্বাদ নিয়ো। ইতি—তোমার মা।'

চিঠি পড়ে অসিত মৃদু হাসল। শ্যামল আর নীলার মধ্যে এমন একটা ঘনিষ্ঠ আর পরম মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠুক তা সেও চেয়েছিল। কিন্তু নীলার উগ্র মেজাজ দেখে এগুতে সাহস পায়নি। ভেবেছিল যা করবার তা ওরা নিজেরাই করুক। অসিত যদি মধ্যবর্তী হতে যায় তাহলে তাতে ওদের মন জানাজানির পালায় বাধা ঘটবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে মা তার চেয়ে বেশী অগ্রবর্তিনী। সাহসও তাঁব অনেক বেশী। এ সম্বন্ধে সম্মতি জানানো ছাড়া অসিতের আর করবার কিছু নেই। অবশ্য তার সম্মতিও এক্ষেত্রে অধিকন্তু। শ্যামল আর নীলার নিজেদের মত, নিজেদের মতিটাই এ ব্যাপারে যথেষ্ট। কিন্তু কাণ্ড দেখ শ্যামলের। ওর চিঠিতে কেবল কড়া কড়া গাল, কড়া কড়া কথা। মধুর আর কোমল কথাগুলি সে বুঝি শুধু নীলার জন্যেই তুলে রেখেছে!

অসিতের পক্ষে এ খবর পরম সু-খবর, আনন্দের বার্তা। নীলা ঘর সংসার করুক, সুখী হোক, এর চেয়ে বড় কাম্য আর কী আছে। কিন্তু বোনের সৌভাগ্যে সুখী হ'তে হ'তে কিসের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল অসিতের। পড়া উচিত নয় তবু পড়ল। মনে পড়ল সুজাতার চিঠি আজও আসেনি।

মীর্জাপুর ষ্ট্রীটের একটি চায়ের দোকানে নীল পর্দা ঘেরা একটি কেবিনের মধ্যে দু কাপ চা সামনে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল শ্যামল আর নীলা। শ্যামল নিজেই নীলাকে ডেকে এনেছে। তার জরুরী কথা আছে নীলার সঙ্গে। কথাটা যে কি নীলা তা অনেক আগেই আন্দাজ করতে পেরেছে। সে ভেবেছিল শ্যামলের ডাকে সে সাড়া দেবে না। স্পষ্টই জবাব দেবে যে শ্যামলের বলবার মতো একটা কেন অনেক কথাই থাকতে পারে কিন্তু সে সব কথা শোনবার নীলার সময় নেই, গরজ নেই, প্রয়োজনও নেই। তবু বলি বলি ক'রেও অমন স্পষ্ট ভাষায় রূঢ়ভাবে শ্যামলকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি নীলা। নানা রকম ওজর আপত্তি করেও শেষ পর্যন্ত স্কুল ছুটির পরে শ্যামলের সঙ্গে কলেজ স্কোয়ারে দেখা করতে সে রাজী হয়েছে। সেখানে ভিড় দেখে শ্যামলের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চায়ের দোকানে এসে উঠেছে। নিজের এই কাণ্ড দেখে নিজেই বিস্মিত হয়ে উঠেছে নীলা। যেন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্যামল তাকে পিছনে পিছনে টেনে নিয়ে চলেছে। কিন্তু তার কোন স্বাধীন ইচ্ছা নেই এ কথা স্বীকার করতেও নীলার সম্মানে বাধে। না, শ্যামলের ইচ্ছার জোরেই সে তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে একথা ঠিক নয়। নিতান্তই যেন কৌতুক করে শ্যামলের ইচ্ছার সঙ্গে সে নিজের ইচ্ছাকে মিলতে দিয়েছে। তার বেশি কিছু নয়। দেখা যাক শ্যামলের কতখানি দৌড়, কতখানি সাহস। সে কী বলে, কী ভাবে তা একটু পরখ করে দেখুকই না নীলা। তারপর তার গম্ভীর মুখের গাম্ভীর্যভরা কথাগুলি হেসে উড়িয়ে দিলেই চলবে।

কিন্তু কেবিনে ঢুকে শ্যামলের মুখোমুখি বসে মহড়া দেওয়া মনের জোর যেন আগের মত রাখতে পারছিল না নীলা। অকারণে বুক কাঁপছিল, মুখ দিয়ে কথা সরছিল না, শ্যামল যে কী বলবে তা জানা কথা। মা আগেই তার ভূমিকা রচনা ক'রে রেখেছেন। তবু সেই জানা কথা শুনতে গিয়েও কী এক অজানা আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু করতে থাকে নীলার। শুধু অবিমিশ্র

আশঙ্কাও নয়। এমন অনুভূতি এক কথায় যার নাম দেওয়া চলে না। অন্তত এই মুহূর্তে নীলা তাকে কোন নাম দিতে পারে না, নাম দিতে চায় না।

অবশ্য কথা শুরু করতে শ্যামলও কম সময় নিল না। চিঠিপত্র লিখতে অসিতের গাফিলতির কথা পাড়ল, ব্যাঙ্কের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা নীলাকে শোনাল, কিন্তু এ কথাগুলির কোনটিই যে আজ আসল কথা নয়, সবই যে অপ্রাসঙ্গিক তা যে বলল সেও বুঝতে পারল যে শুনল তারও বুঝতে বাকী রইল না।

তারপর নীলা এক সময় বলল, 'সন্ধ্যা হয়ে এল এবার উঠতে হয়।'

শ্যামলের যেন চমক ভাঙল, বলল, 'কিন্তু উঠলে তো চলবে না নীলা, যে কথা বলতে তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি তা তো এখনো বলা হল না।'

নীলা বলল, 'তাহলে বল সে কথা।'

হঠাৎ তুমি কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় নীলা ভারি লজ্জিত হল, তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নিয়ে বলল, 'বলুন।

শ্যামল একটু হেসে বলল, 'না, আর বলুন নয়, এবার থেকে ওই ভুলটাই শুদ্ধ বলে ধরে নেব। সম্বোধনের এই অমিলটা আর কি চলতে দেওয়া ঠিক।'

প্রগলভা নীলা এর জবাবে হঠাৎ কোন কথা বলতে পারল না। শ্যামল ও যে তার কথার জবাব খুব প্রত্যাশা করল তা নয়। নীলার এই অভিনব মৌনতায়, তার লজ্জিত ভঙ্গিতে যে উত্তর মিলল, তা মুখের কথার চেয়েও বেশি।

শ্যামল বলল, 'তোমার মায়ের প্রস্তাবে তোমার সম্মতি আছে আমি এই আশা নিয়ে রয়েছি নীলা। তোমার মুখ থেকে সেই সম্মতির কথা আমি স্পষ্ট ক'রে শুনতে চাই।'

নীলা বলল, 'আমি জীবনে কোনদিন বিয়ে করব না বলে ঠিক করেছি।'

শ্যামল মৃদু হেসে বলল, 'তোমার এই কঠিন সংকল্পের কারণ কী নীলা, আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনে।'

নীলা একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'সব কথাই কি সবাইকে বুঝিয়ে বলা যায়? জীবনে অনেক কথা হয়ত কাউকেই বলা যায় না।'

শ্যামল স্থির দৃষ্টিতে নীলার দিকে তাকাল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'যে কথা কাউকেই বলা যায় না তাও হয়ত কোন বিশেষ একজনকে বলা যায়। সেই বিশেষ একজন যদি আমি কোনদিন তোমার হ'তে পারি তাহলে সে কথা তুমি নিজের থেকেই বলবে। তার আগে সে কথা আমারও জেনে কাজ নেই। তোমারও বলে দরকার নেই।'

শ্যামলকে স্পষ্ট বক্তা, সভা-সমিতি-করা কাজের মানুষ বলেই নীলা এতদিন জানত, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরেও যে এমন করুণ বেদনার সুর লাগতে পারে তা যেন ধারণার অতীত ছিল নীলার। শ্যামলের কথা শুনে তার মনে হ'তে লাগল একজন মানুষকে অত সহজে চেনা যায় না। এক কথায় বলা যায় না সে এমন বা তেমন। ভালোয় মন্দে কোমলে কঠিনে মেশানো মানুষের চেয়ে বিচিত্র কিছু পৃথিবীতে বোধ হয় আর নেই। নীলার মনে হল এমন আন্তরিকতার সুর ও সহানুভূতির সুর সে অনেক দিন শোনেনি, এমন সহানুভূতির স্পর্শ সে যেন জীবনে কোনদিন পায়নি। শ্যামলকে সব কথা খুলে বলবার জন্মে নীলার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু সব খুলে বলতে চাইলেই তো আর বলা যায় না। কিসের একটা সংকোচ আর লজ্জা এসে কণ্ঠ রোধ করতে চায়। অথচ না বলেও মুক্তি পাওয়া যায় না। নীলা অনেক চেষ্টার পর ফের কথা শুরু করতে পারল। বলল, 'কিন্তু সব কথা শোনবার পর যদি মনে হয় বিশেষ একজন না হওয়াই ভালো ছিল, তার চেয়ে, তার চেয়ে --'

নীলা আর কিছু বলতে পারল না। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তার চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল।

শ্যামল এবার আস্তে আস্তে ওর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বলল, 'তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নেই নীলা। তেমন কথা আমার কিছুতেই মনে হবে না। অতীতে তুমি হয়ত এক রকম ভুল

করেছ, আমি আর এক রকম ভুল করেছি। কিন্তু কোন ভুলই সংশোধনের অযোগ্য নয়। তাছাড়া আমরা তো অতীত সর্বস্ব নই, আমাদের বর্তমান আছে, ভবিষ্যৎ আছে। আমরা দুজনে মিলে আমাদের সেই ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলব নীলা। তুমি যদি আমার সঙ্গে থাক আমি দারিদ্র্যকে ভয় পাইনে, সুরপতিবাবুর শত্রুতাকেও না।'

নীলা বলল, 'আমাকে ভেবে দেখতে দাও।'

শ্যামল একটু হাসল, 'আমিও মাসীমার কাছে এমনি ভেবে দেখবার সময় চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি কী বললেন জানো? তিনি বললেন, শ্যামল ভেবে দেখবার সময় তুমি নিতে হয় নাও, কিন্তু নীলাকে কোন সময় দিয়ো না। ভেবে ভেবে মেয়েটার মাথা মেজাজ সব খারাপ হয়ে গেছে।'

নীলা এবার একটু হাসল, 'মা বলেছে এই কথা? চিরকাল মা আমার বদনাম করেই এল।'

শ্যামলও হেসে বলল, 'মায়ের দেওয়া বদনামটা সুনামের ছদ্মবেশ। তাঁর কথার জবাবে আমি বললাম, মাসীমা, সে ভাবনাটা আমার আর তার দুজনেরই, তাকি শুধু আমার একার ভাবলে চলবে? তিনি বললেন, চলবে বাবা চলবে। এখন থেকে অনেক সময় একজনকে দুজনেব ভাবনাই ভাবতে হবে। সংসারে তাই নিয়ম। তিনি কতদূর ভেবে রেখেছেন, কতদূর এগিয়ে গেছেন তাই দেখ।'

নীলা বলল, 'কিন্তু ব্যাপারটার দায়িত্ব তো তাঁর চেয়ে আমাদেরই বেশি। আমাদের ভাবনা তো সত্যি সত্যি তিনি ভেবে দিতে পারেন না।'

শ্যামল বলল, 'তা পারবেন কেন। যে সব ভাবনা একান্তভাবেই আমাদের তা আমাদের নিজেদেরই ভেবে ঠিক ক'রে নিতে হবে। এই যেমন আর্থিক সমস্যার কথা। আমার একার যা রোজগার তাতে এমন সাধ্য নেই ভাল বাড়ি ভাড়া ক'রে ঝি চাকর রেখে সুখে স্বচ্ছন্দে গৃহস্থালী করি। তাই আপাতত আমাদের সেই একতলার একটি মাত্র ঘরেই তোমাকে সংসার পাততে হবে।'

নীলা এবার চটুল ভঙ্গিতে হেসে বলল, 'আমার দায় পড়েছে। পুরো একটি তেতলা বাড়ি আর একপাল দাসদাসী ছাড়া আমি মোটে সংসার পাতবই না।'

নীলার কথার ভঙ্গি দেখে শ্যামলও হাসল, বলল, 'তাহলে তো আমার আর কোন আশাই নেই। শুধু তাই নয়, আমার একার রোজগারে সেই একতলার সংসারও চলবে তেমন ভরসা নেই। তাই তোমাকেও আধখানা সংসারের ভার নিতে হবে। আমি যেমন চাকরি বাকরি করব, তোমাকেও তেমনি কাজকর্ম করতে হবে। টাকা রোজগারের চেষ্টায় বেরোতে হবে। ঠিক এখন যেমন বেরোচ্ছ।'

নীলা এবার গাম্ভীর্যের ভান করে বলল, 'তাহলে আর বিয়েতে সুখ হল কী। আমি আরো ভেবেছিলাম বিয়ের পরে এক গা গয়না পরে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকব আর কর্তৃত্ব করব। কিন্তু এযে দেখছি ডবল দাসত্ব—'

শ্যামল বলল, 'ওইখানেই ভুল হল। ডবল দাসত্ব মোটেই নয়। আমাদের খাস তালুকে কেউ আমরা কারো অধীন থাকব না। সেখানে আমাদের দুজনেরই সমান অধিকার। এক রাজধানীতে এক সিংহাসনে দুজনেই রাজা রাণী।'

নীলা বলল, 'আচ্ছা, সর্তগুলির কথা ভালো ক'রে ভেবে দেখি।' রেষ্টুরেন্ট থেকে দুজনে এবার বেরিয়ে পড়ল। নীলার মন অনেকটা হালকা হয়ে গেছে। সেই ভারাক্রান্ত অবস্থা আর নেই সে কথা টের পেয়ে মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠল শ্যামল। নীলা যতই ভাবুক না কেন, তার সিদ্ধান্ত অন্যরকম কিছু হবে না। এ আশ্বাস নিজের মনে শ্যামল অনুভব করল।

শ্যামলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে এল নীলা। আজ তাকে রজনীগন্ধার তোড়া উপহার দিয়েছে শ্যামল আর খোঁপায় গুঁজে দিয়েছে একটি রক্ত গোলাপ। শ্যামলের এমন সাহস আর সপ্রতিভতা

এর আগে নীলা আর দেখেনি। মায়ের তাগিদে রাত নটার মধ্যেই খাওয়া দাওয়া সেরে নিতে হল। অন্যদিনের মতোই বই হাতে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু আজ আর বইতে মন লাগল না। নিজের জীবনের ছোট বড় অধ্যায়গুলিই বারবার ক'রে উলটে যেতে লাগল নীলা। কিন্তু নিজের দোষ ত্রুটি ভুল ভ্রান্তির কথা বেশিক্ষণ তার মনে স্থান পেল না। উৎসাহে উদ্দীপ্ত শ্যামলের মুখই বারবার করে তার মনে পড়তে লাগল। নীলার মনে হল যে এরপর থেকে তার আত্মপীড়ন সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যাবে। তার কৃচ্ছ্রতার মধ্যে কোন আন্তরিকতা থাকবে না। সুধীরের মুখ আজ তার মনের পটে অস্পষ্ট। নিজের ভীরুতা আর দুর্বলতার জন্যে নিজেকে হনন ক'রে যে অঘটন সুধীর ঘটিয়ে গেছে তার জন্যে নীলা তো আব একা দায়ী নয়। নিজের আংশিক অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সে এই ক'বছর ধ'রে করেছে। কিন্তু তার সেই কৃচ্ছ্রসাধন আজ একটা যান্ত্রিক অভ্যাস মাত্র, কোন মূল্যই তার আর নেই। তাই যদি হয় তাহলে অতীতের অপরাধের বোঝা নিয়ে কেন নীলা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে? কেন ফের উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে না? কেন নতুন ক'রে সুখী হবে না, সুখী করবে না? স্মৃতিপূজা কি শুধু শূন্যতার আর শোকের শুকনো ফলেই করতে হয়। পরিপূর্ণ সুখের ভিতর দিয়ে চলে না? যে সব যুক্তি আর উপদেশ অসিত এতদিন ধরে দিয়ে এসেছে অথচ নীলা মোটেই তাতে কান দেয়নি আজ সেই সব কথাই পরম যুক্তিগ্রাহ্য আর কল্যাণকর বলে তার মনে হ'তে লাগল।

পরদিন অরুন্ধতী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কী ঠিক করলি নীলা। হাঁ কি না শ্যামলকে তো আমার যা হোক কিছু একটা বলে দিতে হবে।'

নীলা বিরক্তির ভঙ্গিতে অন্যদিনের মত আজও জবাব দিল, 'তোমার যা ইচ্ছে তাই বলে দিতে পার মা, আমি কিছু জানিনে।'

অরুন্ধতী হেসে বললেন, 'কিছু জানিনে। তবে যে এতদিন সবজান্তার বেশ ধরে বসেছিলি। আমার জবানীতে অসিতকে আসবার জন্তে একটা টেলিগ্রাম করে দে। তার তো দু' চারদিন আগেই এসে পৌছানো দরকার। আর উমাকেও একটা চিঠি লেখা দরকার। আচ্ছা সে চিঠি আমিই লিখে দেব। স্কুল থেকে ফেরার পথে একখানা এনভেলপ আমার জন্তে মনে ক'রে নিয়ে আসিস।'

উমার নামটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীলার বুকের মধ্যে ধক ক'রে উঠল। আশ্চর্য! এতদিন দিদির কথাটা তার মনেই পড়েনি। এই বিয়ের খবরটা কীভাবে নেবে উমা? মনে মনে উমা কি ব্যঙ্গের হাসি হাসবে না? নীলার কথা ভেবে তার ঠোঁটে কি শ্লেষ ফুটে উঠবে না। দরকার নেই, দরকার নেই। তার চেয়ে নিজের কৃতকর্মের ফল নীলা আজীবন বয়ে বেড়াবে। তবু উমার কাছে সে কোনদিন অনুকম্পার পাত্রী, উপহাসের পাত্রী হয়ে থাকবে না।

কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা নীলা যে অটুট রাখতে পারবে এমন কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তার সুস্পষ্ট সম্মতি দানের অপেক্ষা না রেখেই অরুন্ধতী বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন শুরু করলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন নীলার দ্বিধা দৌর্বল্যকে আর তিনি প্রশ্রয় দেবেন না। শ্যামলের ওপর তার অনুরাগ আছে একথা তিনি জানতে পেরেছেন, শ্যামলও তাঁর মেয়েকে পছন্দ করেছে একথা তাঁর অজানা নেই। এর পরেও দেরি করাটা তাঁর পক্ষে মূঢ়তা হবে। কারণ শুভ কাজে কখন হঠাৎ কী ব্যাঘাত এসে পড়বে তা কেউ বলতে পারে না। বোনের বিয়ে উপলক্ষ্যে অসিত ছুটি পায় ভালো না পায় অরুন্ধতীকে নিজেই সব ব্যবস্থা করতে হবে। আপাতত পুরোহিত ডেকে দু'হাত এক ক'রে দেবেন তারপরে খাওয়ানো দাওয়ানো আড়ম্বর অনুষ্ঠান সাধ্যে কুলোয় করবেন না হয় করবেন না। তিনি প্রতিবেশী অমূল্য রায়ের কাছে গিয়ে বললেন, 'ঠাকুরপো, নীলার সম্বন্ধ ঠিক করেছি। কিন্তু আমার তো লোকজন

নেই। ছেলে বিদেশে ছুটি পায় কি না পায় তার কিছু ঠিক নেই আপনারা যদি আমাকে এ দায় থেকে উদ্ধার না করেন—।'

প্রৌঢ় অমূল্যবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'ওকি কথা বলছেন বউদি 'আমাদের যা হুকুম করবেন তাই করব। কী করতে হবে বলুন।'

পাড়া প্রতিবেশীদের কয়েকটি পরিবারে অরুন্ধতীর খুব যাতায়াত আছে। সকলের অসুখে বিসুখে উৎসবে আনন্দে তিনি খোঁজ খবর নিয়ে থাকেন। তাই ছেলে-বুড়ো সকলেরই তিনি শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করেছেন। অমূল্যবাবুদের সাহায্যে তিনি বিয়ের বাজার শুরু করে দিলেন। মায়ের জেদ আর দৃঢ়তা দেখে নীলা অবাক হয়ে গেল।

কিন্তু সব চেয়ে বিস্মিত হল সে উমার চিঠি পেয়ে। নীলার বিয়ের আলোচনার কথা অরুন্ধতীই তাকে জানিয়েছিলেন। তার জবাবে উমা শুধু মাকেই চিঠি লেখেনি নীলাকেও দীর্ঘ চিঠি দিয়েছে। উমা লিখেছে, শ্যামলের সঙ্গে নীলার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে শুনে উমা খুবই খুশি হয়েছে। এতদিন বাদে নীলা যে মন স্থির ক'রে নিজের চলার পথ বেছে নিতে পেরেছে তাতে উমার চেয়ে বেশি আনন্দ কেউ পাবে না একথা যেন নীলা বিশ্বাস করে। উমা লিখেছে, 'তুই এতদিন ধরে বিয়ে না করে সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকায় আমার আত্মগ্লানির আর সীমা ছিল না। আমার কেবলই মনে হয়েছে এর জন্যে আর কেউ নয়, আমিই একমাত্র দায়ী। আমার দুঃখ দুর্ভাগ্যের কথা ভেবেই তুই বিয়ে করছিসনে। যা ঘটে গেছে তা আমাদের দুজনের জীবনেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। গোড়ায় আমি ভেবেছিলাম সেই দুর্ঘটনার জন্যে তুইই একমাত্র দায়ী। তোর জন্যেই আমি অকালে স্বামী হারিয়েছি। সেই ভুল ধারনার বশে তোকে কত যে হিংসা করেছি তোর কাছে গোপন করব না, সেই সর্বনাশা আঘাতে আমার এমনই মাথা খারাপ হয়েছিল যে তুই যে আমার ছোট বোন, আমি যে তোর দিদি সে কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমার সেই ভুল ভেঙেছে,

মনের পরিবর্তন হয়েছে বলেই নিজের দোষের কথা এমন খোলাখুলি ভাবে স্বীকার করতে পারছি। আমার দোষ তুই ক্ষমা করিস নীলা, আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিস। আমি বুঝতে পেরেছি সেই দুর্ঘটনায় তুই নিমিত্ত মাত্র ছিলি, তোর ওপর আমি অযথা দোষারোপ করেছি। সমস্ত দ্বিধা সংকোচ কাটিয়ে তুই যে আর একজনকে ভালোবেসেছিস তাতে আমি সত্যিই খুশি হয়েছি নীলা। আমাদের মধ্যে যে হানাহানি হয়ে গেছে তাতে একথা শোনা মাত্র তুই বিশ্বাস করতে পারবি কি না জানিনে, হয়ত বিশ্বাস করা সহজ হবে না। কিন্তু আমাদের সেই ছেলেবেলার পুতুল খেলার কথা, দুই বোনে মিলে মাকে লুকিয়ে কুলের আচার চুরি করে খাওয়ার কথা, বর্ষার দিনে দুজনে মিলে বৃষ্টি ভিজে মায়ের গাল খাওয়ার কথা যদি তোর মনে পড়ে তাহলে আমার আজকের কথাও তুই অবিশ্বাস করবিনে। আমাদের মধ্যে যত শত্রুতাই হোক তোর সুখে যে আমারও সুখ, তোর আনন্দে যে আমারও আনন্দ আজ না হোক কাল এ কথা তোকে বিশ্বাস করতেই হবে।

খোকন বড় বিরক্ত করছে ভাই, বেশি কিছু আর লিখতে দিচ্ছে না। কখনো চুল ধরে টানছে, কখনো আবার গলা জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খাচ্ছে কখনো বা পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে সুড়সুড়ি দিতে দিতে নিজেই হেসে উঠছে। ওর হাসির মধ্যে আমি সব পেয়েছি আমার আর কোন জ্বালা মনে নেই নীলা। ওকে তুই আশীর্বাদ কর ও যেন বেঁচে থাকে, ও যেন মানুষ হয়; আমি তোকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করি ওর মত খোকা এসে তোরও কোল ভরে তুলুক।

তোর বিয়েতে আমি কিন্তু দূর থেকেই আশীর্বাদ পাঠাব। আনন্দ উৎসবে যোগ দেওয়া বোধ হয় ভাগ্যে হবে না। বুড়ি শাশুড়ী শয্যা নিয়েছেন। সবাই বলছে এই শেষ শয্যা। এ অবস্থায় ওঁকে ফেলে গেলে অকর্তব্য হবে। সব ভুলে যাস নীলা, সব ভুলে যাস। শুধু স্নেহ ভালোবাসার কথাই মনে রাখিস। পৃথিবীতে আর কিছু মনে রাখবার মতো নয়। ইতি উমা।"

দীর্ঘ চিঠিখানা পড়তে পড়তে বহুবার নীলার চোখ জলে ভরে উঠল। জল গড়িয়ে পড়ল চিঠির ওপর। উষর মরুভূমিতে এতদিনে বর্ষার ধারা নেমেছে।

বোনের বিয়ের জন্যে ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ছুটি চেয়ে পাঠাল অসিত। ছুটি যে পাবেই এ সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহ ছিল না। চাকরিতে ঢুকে অবধি সে দু'চার দিনের বেশি ছুটি নেয়নি। নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। তাই অনেক ছুটি তার পাওনা আছে। কর্তৃপক্ষ অনায়াসেই তাকে এক মাসের ছুটি মঞ্জুর করতে পারেন। ব্যাঙ্কে এ সময় জরুরী কোন কাজের চাপও নেই। গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা কিছু আছে সে আগে থেকেই এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট ক্ষীরোদ বাবুকে বুঝিয়ে দিতে লাগল। যাতে ছুটি মঞ্জুরীর চিঠি আসবাব সঙ্গে সঙ্গে সে কলকাতা রওনা হ'তে পারে।

চিঠি আসতে অবশ্য দেরি হল না। কিন্তু চিঠির মর্ম একেবারে অভাবিত অপ্রত্যাশিত। জেনারেল ম্যানেজার অবনী চাটুয্যে নয় স্বয়ং চেয়ারম্যান স্বরপতি চক্রবর্তীর স্বাক্ষরিত চিঠি। এক মাসের ছুটি চেয়েছিল অসিত, স্বরপতি তাকে চিরদিনের জন্যে ছুটি দিয়েছেন। অযোগ্যতা এবং ব্যাঙ্কের স্বার্থ-বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে তিনি অসিতকে বরখাস্ত করেছেন। সে যেন এ্যাকাউণ্ট্যাণ্টকে অবিলম্বে চার্জ বুঝিয়ে দেয়। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে স্বরপতি এ্যাকাউণ্ট্যাণ্টকেও স্বতন্ত্র চিঠি দিয়েছেন সে কথা ক্ষীরোদ বাবুর কাছেই অসিত জানতে পারল।

চিঠি হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ বিমূঢ় হয়ে বসে রইল অসিত। স্বরপতির এই অসঙ্গত আচরণের কোন কারণ সে খুঁজে পেল না। হঠাৎ সুজাতার সেই উচ্ছ্বসিত চিঠির কথা মনে পড়ল অসিতের। একখানা নয় দু'খানা চিঠি। প্রথমে অনুল্লিখিত বিপদ থেকে উদ্ধারের আশ্বাস

জানিয়ে, পরদিনই দ্বিতীয় চিঠিতে সে আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করেছিল সুজাতা। অনুরোধ করে লিখেছিল ঝোঁকের মাথায় সে যা লিখেছে তার কোন অর্থ নেই। অসিত যেন সে চিঠিকে কোন গুরুত্ব না দেয়। আর তাদের দু'জনের কল্যাণের জন্যেই আপাতত কিছুদিন অসিত যেন সুজাতার কাছে চিঠিপত্র লেখা বন্ধ রাখে।

সুজাতার এই চিঠি দু'খানার সঙ্গে সুরপতির আজকের এই চরম পত্রের কোন সংযোগ আছে কিনা অসিত ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু স্থির হয়ে বেশিক্ষণ চিন্তা করা তার পক্ষে সম্ভব হল না। সুরপতির চিঠির ভাষা তাঁর ভিত্তিহীন অভিযোগ অসিতের মনে যে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে তাতে তার মত ধীর বুদ্ধি মানুষও বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হয়ে উঠল। অসিত মনে মনে সংকল্প করল এ অপমানের শোধ তার নিতেই হবে। সুরপতির এই অন্যায় আর অসঙ্গত ব্যবহার সে কিছুতেই সহ্য করবে না।

অসিতের পদচ্যুতির খবরটা ক্ষীরোদ বাবুর কাছ থেকে অফিসের প্রায় সকলেই কিছুক্ষণের মধ্যে জানতে পারল। এবং এর কারণ নিয়ে তাদের মধ্যে নানা ধরণের জল্পনা কল্পনা চলল। অসিতের দিকে এমনভাবে তারা তাকাতে লাগল যেন পর্বত চূড়া থেকে সে হঠাৎ এক অন্ধকার গহ্বরে পড়ে গেছে। অসিত সবই বুঝতে পারল। কিন্তু বাইরের লোকের হাসি আলোচনা অনুকম্পার দৃষ্টি কিছুই যেন তাকে স্পর্শ করতে পারল না।

প্রবীণ ক্ষীরোদ বাবু অসিতকে ডেকে সহানুভূতির সুরে বললেন, 'ঘাবড়াবেন না অসিত বাবু, এ অফিসে এমন অনেকবার হয়ে গেছে। এখানে চাকরি যেতেও সময় লাগে না, হ'তেও সময় লাগে না। আপনি আর দেরি করবেন ন', আজই কলকাতা চলে যান। কর্তাকে গিয়ে ধরুন। প্রথমে হয়ত তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবেন, কাছে ঘেঁষতেই দেবেন না। কিন্তু তাতে ভয় পাবেন না। লেগে থাকতে পারলে শেষ পর্যন্ত আপনার সুবিধে হবেই। বিশেষ ক'রে আপনাদের সঙ্গে চেয়ারম্যানের এত জানাশোনা রয়েছে।'

অসিত বাধা দিয়ে বলল, 'জানাশোনার কথা আপনি কোত্থেকে শুনলেন ?'

ক্ষীরোদ বাবু হেসে বললেন, 'শুনেছি। হয়ত এত ঘনিষ্ঠতা আছে বলেই চেয়ারম্যান সামান্য কারণে আপনার ওপর অত বেশি বিরক্ত হয়েছেন। এবং লঘু পাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন। দণ্ডের পরিমাণটা এত বেশি বলেই আমার মনে হচ্ছে এ দণ্ড স্থায়ী হবে না। একথা জেনে রাখবেন এ আগুন যত দপ করে জ্বলে ওঠে তত দপ করে পড়ে যায়।'

অসিত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'আপনার উপদেশ মনে রাখব।'

ক্ষীরোদ বাবু একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, 'আপনি ঠাট্টা করছেন। আপনারা বিদ্বান, বুদ্ধিমান। অনেক লেখাপড়া শিখেছেন। আপনাদের উপদেশ দেব এমন ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে বয়স হয়েছে, সংসারে পাঁচ রকম দেখে শুনে কিছু অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছি। তাই—'

অসিত হাত জোড় করে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন ক্ষীরোদ বাবু, আপনি যে আমাকে সত্যিই স্নেহ করেন তা আমি জানি। কিন্তু আজ নানা কারণে আমার মন বড় চঞ্চল। যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি বিদায়ের দিনে সে কথা মনে রাখবেন না।'

ক্ষীরোদ বাবু জিভ কেটে বললেন, 'ও কি কথা বল্‌ছেন অসিত বাবু। আপনার দোষ ত্রুটি বিচার করবার ভার আমাদের নয়। আমরা আপনার অধীনস্থ কর্মচারী। সে হিসেবে যে অমায়িক ব্যবহার আপনার কাছ থেকে পেয়েছি তা এ ব্রাঞ্চের আর কোন ম্যানেজারের কাছেই পাইনি সে কথা জোর গলায় বলতে পারি। আমাদের তো আর কিছু করবার সাধ্য নেই শুধু দূর থেকে মঙ্গল কামনাই করতে পারি।'

ক্ষীরোদ বাবুর আন্তরিকতা অসিতকে স্পর্শ করল। এবার তার কণ্ঠেও আবেগের ছোঁয়া লাগল।

অসিত বলল, 'সেই কামনাই তো বড় কামনা ক্ষীরোদ বাবু। আপনার আশীর্বাদ আমার মনে থাকবে।'

ক্ষীরোদ বাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'ঝড় ঝাপটা জীবনে অনেক আসে অসিত বাবু, আবার চলেও যায়। সুখই বলুন, দুঃখই বলুন সবই অস্থায়ী। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা হল মাথা ঠিক রেখে মাথা সোজা রেখে চলা। দুঃখেষু বিগতমনাঃ, সুখেষু বিগতস্পৃহঃ গীতার এই উপদেশ আমাদের মত সংসারী লোকের পক্ষে মেনে চলা বড় শক্ত। কিন্তু যদি দু'একবারও মানতে পারেন দেখবেন তার চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছুতে নেই।'

অসিতকে ষ্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন ক্ষীরোদবাবু। দু'চার জন নিম্নতম কর্মচারীও তার সঙ্গে দেখা করে বিদায় নমস্কার জানাল। দুঃসময়ে সহকর্মীদের এইটুকু সহানুভূতি সমবেদনাও অসিতের মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিল। অসিত ভাবল সংসারে সুখ দুঃখ কিছুই অবিমিশ্র নয়।

গাড়িতেই মনে মনে কর্তব্য স্থির করে নিল অসিত। নীলার এই আসন্ন বিয়ের মুহূর্তে নিজের চাকরি যাওয়ার খবরটা সকলের কাছ থেকেই সে গোপন রাখবে। তা না হ'লে মা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়বেন নীলার বিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে। তা অসিত চায় না। বরং বোনের বিয়ের তারিখকে এগিয়ে আনাই তার ইচ্ছে। বিয়ের ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি চুকে যায় ততই ভালো। তারপর অনেক কাজ রয়েছে অসিতের। শক্ত বোঝাপড়ার কাজ। নীলার বিয়ের উৎসবের সঙ্গে সেই হাঙ্গামাকে অসিত জড়িয়ে ফেলতে চায় না।

ছেলেকে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে দেখে অরুন্ধতী বিস্মিত হয়ে গেলেন। হেসে বললেন, 'কিরে, এত তাড়াতাড়ি ছুটি পেয়ে গেলি। তবে যে লিখেছিলি ছুটি পাবি কিনা তার কিছু ঠিক নেই। খবর বার্তা না দিয়ে একেবারে হুট করে এসে হাজির।'

অসিত বলল, 'নিজেদের বাসায় আসতে হলেও একেবারে কেতা দুরস্ত ভাবে খবর টবর জানিয়ে আসতে হবে নাকি।'

অরুন্ধতী হাসলেন, 'তা আসতে হবে বই কি। নইলে ম্যানেজার

বাবুর উপযুক্ত অভ্যর্থনা আমরা যদি না করতে পারি। গরীব মানুষ তো আমরা।'

অসিতের মুখে কিসের একটা ছায়া পড়ল। মুহূর্তের জন্তে তাকে যেন একটু অন্যমনস্ক মনে হ'ল। কিন্তু মুহূর্তেই মুখে হাসি টেনে বলল 'তাতো ঠিকই। কিন্তু যাই বলো মা তোমার মতলবটা ভালো ছিল না। নীলার বিয়েটা চুপচাপ একা একাই দেবে এই তোমার ইচ্ছা ছিল। নইলে আমরা একেবারেই কিছু জানিনে শুনিনে—'

অরুন্ধতী হেসে বললেন, 'যা বলেছিস। আমার মনের কথাটা অতদূর থেকেও কি ক'রে টের পেলি বল তো। নাগপুরে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারী করার সঙ্গে সঙ্গে তুই জ্যোতিষ চর্চাও করছিলি নাকি।'

অসিত লক্ষ্য করল দু'এক কথা বাদে বাদেই তার ব্যাঙ্কের চাকরির পদ-গৌরবের কথা অরুন্ধতী উৎসাহের সঙ্গে উল্লেখ করছেন। তিনি যখন জানতে পারবেন যে অসিতের সে চাকরি আর নেই তখন নিশ্চয়ই দারুণ আঘাত পাবেন। কিন্তু সে আঘাত তো তাঁকে পেতেই হবে। আজ গোপন করলেও অসিত কদিন আর মার কাছ থেকে সেই দুঃসংবাদ লুকিয়ে রাখতে পারবে।'

অসিতকে রক্ষা করল নীলা। সে তাকে ডেকে বলল, 'মুখ হাত ধুয়ে ঘরে এসো দাদা, তোমার চা আর খাবার দিয়েছি।'

একটু বাদে অসিত নীলার ঘরে গিয়ে বসল, 'ও তুই। আমি ভাবলাম যেন চেনা চেনা একটি মেয়েকে দেখছি। অথচ ঠিক চিনে উঠতে পারছিনে।'

নীলা ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'তার মানে।'

অসিত চায়ের কাপে একটু ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল, 'তার মানে বিয়ের কথা কানে আর বিয়ের গন্ধ নাকে গেলে বোধ হয় মেয়েরা এমনই বদলায়।'

নীলা একটু আরক্ত হয়ে বলল, 'থাক থাক। তোমার আর ঠাট্টা করতে হবে না। একটা জরুরী কথা বলব বলেই তোমার কাছে এসেছি।'

অসিত বলল, 'বলিস কি। আমি তো ভেবেছিলাম এখন থেকে সব জরুরী কথা শুনবে আমার বন্ধু শ্যামল। আর যত অজরুরী কথা—'

নীলা বাধা দিয়ে বলল, 'দোহাই দাদা, আমাকে বলতে দাও। আমি এখনো মন স্থির করতে পারছিনে।'

অসিত গম্ভীর হবার ভঙ্গি করে বলল, 'তা যত পার এই দুদিন মনকে অস্থির হ'তে দাও। শুধু বিয়ের পিঁড়িতে স্থির হয়ে বসলেই চলবে।'

নীলা রাগ ক'রে চলে যাচ্ছে দেখে অসিত হাত বাড়িয়ে বোনের হাতটা ধরে ফেলল, তারপর মৃদু কোমল স্বরে বলল, 'দ্বিধা দ্বন্দ্বে অনেক সময় গেছে নীলা, আর নয়। এই সব চেয়ে ভালো হল। আমার কথা তুই বিশ্বাস কর।'

নীলা বলল, 'তুমি ঠিক বলছ দাদা, এই ভালো?'

অসিত বলল, 'নিশ্চয়ই। জীবনে আরো অনেক কাজ পড়ে রয়েছে নীলা। শুধু এক জায়গায় থেমে দাঁড়িয়ে অতীত নিয়ে রোমন্থন করবার সময় আর নেই। আমাদের বহু কাজ পড়ে রয়েছে।'

অসিত যা ভেবেছিল তা হল না, বিয়েটা পার ক'রে দিতে পারল না, বাসি বিয়ের দিনই শ্যামল অসিতের চাকরি যাওয়ার কথাটা জেনে ফেলল। অফিস থেকে সে সপ্তাহ খানেক ছুটি নিয়েছিল। কিন্তু বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে এসে সহকর্মী বন্ধু স্বরেন সেন তাকে গোপনে সংবাদটা জানিয়ে গেছে।

শ্যামল অসিতকে পাকড়াও ক'রে ধরল, 'তুমি কেন এতদিন খবরটা আমাদের কাছে গোপন রেখেছো? আগে জানলে—'

অসিত হেসে বলল, 'আগে জানলে কি করতে?'

শ্যামল বলল, 'বিয়েটা অন্তত বন্ধ রাখতাম। এ আমাদের আনন্দ উৎসবের সময় নয়।'

অসিত বলল, 'কেন নয়? জীবনে চাকরি হওয়া আর চাকরি যাওয়াটা কি এতই বড় জিনিস যে তার জন্যে সব আনন্দ উৎসব বন্ধ রাখতে হবে?'

শ্যামল বলল, 'তা নয়। কিন্তু মিথ্যে বদনাম নিয়ে তোমাকে চাকরি

থেকে ছাড়িয়ে দেওয়ার অধিকার সুরপতি চক্রবর্তীর নেই। এ আমরা কিছুতেই মেনে নেব না অসিত।'

অসিত বলল, 'আচ্ছা সে সব কথা পরে হবে। এই বর বেশে অত বীরত্ব ঠিক মানায় না।'

কাজের ভিড় আর ব্যস্ততার মধ্যেও কথাটা কানে গেল অরুন্ধতীর। তিনি ছেলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সত্যি !'

অসিত স্বীকার করে বলল, 'সত্যি'।

'আমার কাছে কথাটা লুকিয়ে রেখেছিলি কেন ?'

অসিত বলল, 'তোমার কাছে কি সত্যিই কিছু লুকোতে পারি মা ? আজ না বললেও কাল ঠিক বলতামই।'

অরুন্ধতী আর কিছু না বলে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

সন্ধ্যার অনেক পরে সেদিন জনবিরল অফিস অঞ্চলে দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের ছ'তলা বাড়িটা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দূরে দূরে ট্রাফিকের শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোন সাড়া নেই। এত বড় বাড়িতে এই মুহূর্তে যে কোন জনপ্রাণী আছে বাইরের নিস্পন্দ ভাব দেখে তা কিছুতেই বুঝবার যো ছিল না। কিন্তু বাইরে থেকে না বোঝা গেলেও, না দেখা গেলেও একটি ঘরে তখনও আলো জ্বলছিল। সে ঘর চেয়ারম্যানের। নিজের মোটা চুরুট মুখে সুরপতি তাঁর চেয়ারে চুপ করে বসেছিলেন। অন্যদিনের তুলনায় আজকের দিনটির যে কোন বিশিষ্টতা আছে তা তাঁর বসবার ভঙ্গিতে, কি মুখের ভাবে টের পাওয়া যাচ্ছিল না। তার সামনের চেয়ারে বসে জেনারেল ম্যানেজার অবনী গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই সুরপতির মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু মনের মধ্যে সুরপতির যদি কোন চাঞ্চল্য ঘটেই থাকে যদি কোন তোলপাড় চলতেই থাকে তাঁর মুখের রেখায় কি চোখের দৃষ্টিতে তা মোটেই ধরা পড়ছিল না। বরং মতের বিরুদ্ধে কথা বললে অন্যদিন খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠেন সুরপতি, রূঢ় কথা

বলেন, গালাগাল করেন কিন্তু আজ তাঁর মেজাজ খুব শান্ত, মুখের ভাষা ভদ্র, আজ তিনি অধীন কর্মচারীর কাছে অসাধারণ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিচ্ছিলেন।

অনেকক্ষণ ধরে তাঁদের মধ্যে গুরুতর বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছিলো। সে আলোচনার ভাষা সাংকেতিক এবং সংক্ষিপ্ত। ঘরে আর কেউ নেই, ধারে কাছেও অন্য কেউ ছিল না। তবু তাঁরা ইচ্ছা ক'রেই যেন সহজ সরলবোধ্য ভাষা এড়িয়ে চলছিলেন।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন চিন্তা ক'রে অবনী মৃদু গলায় ছোট একটি প্রশ্ন করল, 'তাহলে আপনার ডিসিশন থেকে একচুলও আপনি নড়ছেন না?'

সুরপতি বললেন, 'না। নড়বার জো থাকলে নড়তাম। আশ্চর্য, অন্য দুজন ডিরেক্টরকে কথাটা এত ক'রে বোঝাতে হয়নি। অথচ তারা বাইরের লোক। নামেই ডিরেক্টর। ভিতরের কোন খোঁজখবরও জানে না, কাজ কর্মও বোঝে না। তুমি অন্দরের মানুষ। সব জানো সব বোঝ। হাতে কলমে নিজেই সব করেছ। তবু তোমাকে বোঝাতে এত সময় লাগছে একে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য যদি বলি তাহলে কি খুব বেশি বলা হয়।'

মনে হ'ল সুরপতি যেন একটু হাসলেন। তাঁর শুকনো কালো ঠোঁটে এই মুহূর্তে হাসির আভাসটুকু অবনীর চোখে বড়ই বিসদৃশ লাগল।

অপেক্ষাকৃত উত্তেজিত স্বরে অবনী বলল, 'কিন্তু এর পরিণাম কি ভেবে দেখেছেন?'

সুরপতি শান্ত নিরুত্তেজ গলায় জবাব দিলেন, 'দেখেছি বইকি। পরিণাম না ভেবে চোখের সামনে তাকে স্পষ্ট ক'রে না দেখে আমি কোন কাজে হাত দিইনে। এ অভ্যাস আমার ছেলেবেলা থেকে। তুমি যদি আলাদা পথ বেছে নিয়ে সুখী হও আমার তাতে আপত্তি করবার কী আছে।'

অবনী বলল, 'তা হতে পারে। কিন্তু ছেলেবেলার দেখা আর পরিণত বয়সের দেখা কি এক? ছেলেবেলায় যা সইতে পেরেছেন, যে

দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা গঞ্জনার ভিতর দিয়ে কাটিয়ে এসেছেন এই বয়সে কি তা পারবেন? সমাজের কাছে যে মান সম্মান শ্রদ্ধা এতদিন ধরে পেয়ে এসেছেন তা যদি একদিনে সব শেষ হয়ে যায় আপনি কি তা সইতে পারবেন?'

সুরপতি তেমনি শান্ত ভাবে বললেন, 'পারব। আমার সহ্য করবার শক্তি যথেষ্ট। তিন ঘণ্টা ধরে তোমার বক্তৃতা শুনছি, এই কি তার বড় প্রমাণ নয়?'

অবনীর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে সুরপতি ফের একটু হাসলেন, 'রাগ করো না। তুমি আমার জামাই হ'তে যাচ্ছ। তোমার সঙ্গে আমার হাসি ঠাট্টার সম্পর্ক নয়। কিন্তু কিছুকাল ধরে আমি কেমন নির্বান্ধব হয়ে পড়েছি দেখছ তো? যারা ছিল বন্ধু তারা হয়েছে স্তাবক অনুগ্রহপ্রার্থী। আজ তুমিই আমার সব। জামাই বলতেও তুমি, বন্ধু বলতেও তুমি। পৃথিবীতে একমাত্র তোমার কাছেই সব খুলে বলেছি, কিছুই লুকোইনি। লুকোব কেন। চোখ বুজলে তোমারই তো সব হবে। আমি তো কিছু সঙ্গে করে নিয়ে যাব না। তুমি শুধু আমার ভাবী জামাই নও, শুধু বন্ধু নও, তুমি আমার second self.'

অবনীর সর্বাঙ্গ শির শির করে উঠল। সুরপতি যেন সত্যিই সূক্ষ্মদেহী হয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করছেন, তার সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছেন। অবনী হঠাৎ কাতরভাবে বলে উঠল, 'না—না। আপনার সঙ্গে অমন ক'রে একাত্ম হয়ে থাকতে আমি পারব না। তার চেয়ে আপনি আমাকে রেহাই দিন।'

সুরপতি অবনীর দিকে হাসিমুখে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন। তারপর শান্তভাবে বললেন, 'রেহাই দেব? বেশ তো ইচ্ছা হয় তুমি চলে যাও অবনী। আমি কাউকে জোর করে আটকে রাখতে চাইনে। আমার জন্যে ভেব না, আমার জন্যে যা আছে তাই হবে।'

সুরপতির কথার ভঙ্গিতে ভিতরে ভিতরে আক্রোশ বোধ করল অবনী।

তাকে শক্ত পাকে জড়িয়ে এখন বলছেন, 'তুমি ইচ্ছে করলে চলে যেতে পার'। কিন্তু চলে যাবে না অবনী। সুরপতির সঙ্গে থেকেই সে এই ব্যবহারের শোধ নেবে। চোরের উপর বাটপাড়ি না করলে সুরপতির শঠতার যথার্থ প্রতিশোধ নেওয়া হবে না।

সুরপতি স্মিত মুখে কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবনীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ছটফটানি দেখে সুখ আছে। সুরপতি জানেন অবনীর কোথাও আর নড়বার উপায় নেই। নিজের লোভের বাঁধনে সে বাঁধা পড়েছে। সে বাঁধন ছিন্ন করবে এমন শক্তি এখন আর নেই অবনীর। মনের জোর কমে গেছে বলেই মুখের বুলি তার জোরাল হয়েছে।

আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর অবনী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু এই ডামাডোলের মধ্যে অসিতকে discharge করা কি সঙ্গত হয়েছে ?'

সুরপতি মৃদু হাসলেন, 'কিসের সঙ্গতির কথা বলছ। নীতির দিক থেকে না কূটনীতির দিক থেকে।'

অবনী বলল, 'নীতি সম্বন্ধে আপনার আমার কারোরই কোন মাথা ব্যথা নেই। আমি কূটনীতির কথাই বলছি। চালে বোধ হয় আপনার ভুল হয়ে গেল। অসিতকে discharge করায় ওদের ইউনিয়নে জোর আলোচনা হচ্ছে। এই আলোচনা ক্রমে আন্দোলনে দাঁড়াবে। ওদের ইউনিয়ন ব্যাপারটি সহজে ছেড়ে দেবে না।'

সুরপতি ফের একটু হাসলেন, 'ছেড়ে দেবে না, ধরবেই বা কাকে। দু'দিন বাদে ওরা কি আমাদের নাগাল পাবে ভেবেছ ?'

অবনী ফের একটুকাল চুপ করে রইল। মনে মনে ভাবল, তা ঠিক, নাগাল পাওয়ার আর জো থাকবে না বটে। কিছুক্ষণ বাদে ফের বলল, 'আচ্ছা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। অসিতের ওপর আপনার রাগটা কিসের। তার বিরুদ্ধে যে সব চার্জ আনা হয়েছে সেগুলি যে মিথ্যে আমরা সবাই জানি। সুজাতার কাছে ও চিঠিপত্র লিখত বলেই কি

আপনি ওকে এভাবে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন? ভিতরের কথাটা আপনি একেবারে গোপন রাখেননি ব্যাঙ্কের কাউকে কাউকে বুঝতেও দিয়েছেন।'

স্বরপতি বললেন, 'ইচ্ছা করেই দিয়েছি। তাতে ওদের আন্দোলনের জোরটা কমবে। অসিত কারো কাছ থেকে ষোল আনা সহানুভূতি পাবে না এমন কি শ্যামলেরও না। আর সে সহানুভূতি চাইতে অসিতের নিজেরও লজ্জা হবে। কারণ ওর নিজের মনেই দুর্বলতা আছে। এবার তোমার প্রথম প্রশ্নের জবাব দিই। এই ডামাডোলের মধ্যে কেন অসিতকে তাড়িয়ে দিলাম। দিলাম এই জন্যে যে ওদের ইউনিয়নের দৃষ্টি এই ছোট ব্যাপারে আটকে থাক। এই নিয়ে ওরা সোরগোল করুক, হৈচৈ করুক। আসল ব্যাপারটা যেন ওরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টের না পায় এই আমার ইচ্ছে। বুঝতে পেরেছ? নিজের মনের কথা কারো কাছে এমন করে আর খুলে বলিনি অবনী। তোমার কাছে বললাম। কারণ তুমি আমার প্রিয় শিষ্য, প্রিয় বন্ধু।'

নিবে যাওয়া চুরুটের অবশিষ্টটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন চুরুট ধরালেন স্বরপতি, তারপর ফের আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, 'এ ব্যাঙ্ক আমার নিজের হাতে গড়া অবনী। শুধু গড়েছি তাই নয়, তিলে তিলে একে বড়ও করে তুলেছি। লোকে যেমন নিজের ছেলেমেয়েকে মানুষ করে আমি তেমনি করে একে বড় করেছি। লোকে বলে আমার বুকের মধ্যে আস্ত একটি ইট আছে, হৃদপিণ্ড নেই। নিন্দুকদের কথাটা পুরোপুরি অসত্য নয়। আমার মনে মায়া-মমতার পরিমাণটা কিছু কম। কিন্তু এই ক'মাস ধরে আমার সেই বুকের ভিতরের ইটখানা কে যেন টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙেছে। রাত্রে এক মিনিটও আমার ঘুম হয়নি। দেশলক্ষ্মীকে রক্ষা করবার জন্যে কত যে ছক কেটেছি, নক্সা এঁকেছি, কত যে পথ হাতড়ে মরেছি তার ঠিক নেই। কিন্তু তুমি জানো নৌকো যখন ডোবে তখন তার সঙ্গে সহমরণে যাওয়া কোন কাজের কথা নয়। তখন সাঁতরে পার

হয়ে আসাটাই পৌরুষ। তুমি ভেব না আমি চুপ করে বসে থাকব কি মনের দুঃখে বনে চলে যাব। সমস্ত ঝড়ঝাপটা সামলে নিয়ে আমি ফের উঠে দাঁড়াব, নতুন অর্গানিজেশন গড়ে তুলব। আবার সেই গড়ে তোলার কাজে তুমি হবে আমার সঙ্গী সহকর্মী। কিন্তু সেই দুর্দমনীয় যৌবন তো আমার আর নেই। সেই নতুন এ্যাডভেঞ্চারে তুমি হবে আমার দ্বিতীয় যৌবন। চল এবার রাত হয়েছে।'

নিজে দাঁড়িয়ে উঠে অবনীর কাঁধে সস্নেহে হাত রাখলেন সুরপতি।

অবনীও উঠে দাঁড়াল। সুরপতির দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাকে যা বলবার বলে দিয়েছেন তো?'

সুরপতি মৃদু হাসলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না? ক্যাসিয়ার এ্যাকাউনট্যাণ্ট সব্বাই যে যার প্রাপ্যগণ্ডা বুঝে নিয়েছে। কেউ ছাড়েনি। ভাগের ভাগ যা পেয়েছে তাতে কারো জমি, কারো বা নতুন ব্যবসার মূলধন হবে। কি করব বল। ঘর গড়বার সময় যেমন ঘরামী লাগে, ভাঙবার সময়ও তেমনি কামলা কিষাণের দরকার হয়। তাদের মজুরী না দিলে চলে না।'

বলতে বলতে বড় দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন সুরপতি। অবনী চলল পিছনে পিছনে। বন্দুকধারী দারোয়ান অন্যদিনের মতই তাঁদের সেলাম করল। সুরপতি বললেন 'সব ঠিক আছে তো ভজন সিং?'

ভজন সিং বলল, 'সব ঠিক হ্যায় বড় বাবু।'

ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে সামনেই অপেক্ষা করছিল। সুরপতি তাতে উঠে বসলেন। অবনীকে ইতস্ততঃ করতে দেখে বললেন, 'এসো হে এস।'

অবনী বলল, 'শরীরটা তেমন ভালো লাগছে না। ভাবছি আজ সোজা বাড়িতেই যাব।'

সুরপতি বললেন, 'বেশ তো, তোমার বাড়ির পথ আর আমার বাড়ির পথ তো আলাদা নয়। যাওয়ার সময় তোমাকে ভবানীপুরে নামিয়ে দিয়ে যাব।'

গাড়ীর দরজা খুলে ধরলেন সুরপতি। অবনী আর দ্বিরুক্তি না করে ভিতরে পিছনের সীটে তাঁর পাশে গিয়ে বসল।

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল ড্রাইভার। সুরপতি ঘাড় ফিরিয়ে একটুকাল ব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল কি? না কি এ নিছক অবনীরই কল্পনা?

সুরপতিকে ভালো করে বুঝতে পারে না অবনী। মাঝে মাঝে মনে হয় লোকটির মধ্যে সত্যিই কর্মক্ষমতা আছে, দৃঢ়তা আছে, দুর্জয় শক্তি আছে মানুষটির মধ্যে। সেই শক্তির কাছে মাথা নিচু করতে ইচ্ছা করে অবনীর। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হয় সুরপতির এই শক্তি জল্লাদের শক্তি, ঘাতকের শক্তি। স্বার্থে ঘা পড়লে সংসারে এমন কাজ নেই যা সুরপতি পারেন না। বিনা দ্বিধায় তিনি তখন প্রিয় বন্ধুর বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারেন। যেমন ক'রেই হোক পথের বাধা সরিয়ে দেওয়া তাঁর চাইই। সে কিসের পথ? নিজেরই স্বার্থসিদ্ধির পথ। গোড়ার দিকে অবনীর ধারণা ছিল আর কিছু না হোক, আর কাউকে না হোক নিজের ব্যাঙ্ককে অন্তত সুরপতি ভালোবাসেন। মানুষ যেমন তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসে, শিল্পী যেমন তাঁর শিল্পের মাধ্যমকে ভালোবাসে তেমনি করেই সুরপতি তাঁর ব্যাঙ্কের সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করেন। কিন্তু সুরপতির সঙ্গে এই পাঁচ বছরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে সাহচর্যে অবনীর সে ধারণা ভেঙে পড়েছে। সুরপতি ব্যাঙ্ককে ভালোবাসেন না, শুধু নিজেকেই ভালোবাসেন। আর স্বার্থ তাঁর কাছে শুধু অর্থময়, শুধু টাকার অঙ্ক দিয়ে গড়া। যেখানে ব্যাঙ্কের সঙ্গে অন্যের স্বার্থের প্রতিযোগিতা সেখানে সুরপতি ব্যাঙ্কের পক্ষ নিয়েছেন, কিন্তু সেখানে নিজের স্বার্থের সঙ্গে ব্যাঙ্কের স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে সেক্ষেত্রে আপন স্বার্থের এক চুলও সুরপতি ছেড়ে দেননি। আরো কয়েকটি বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংযুক্ত হলে দেশলক্ষ্মী রক্ষা পেত। তার স্বতন্ত্র সত্তা বলে কিছু থাকত না কিন্তু আর সবই থাকত। সাধারণের আমানতের টাকাগুলি থাকত, দরিদ্র কর্মচারীদের ভাত মারা যেত না। কিন্তু সুরপতি সময়

থাকছে সেই এ্যামালগেমেশনের প্রস্তাবে রাজী হননি। কারণ তাতে তাঁর নিজের প্রতিপত্তির কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না, নিজের দুষ্কৃতি আরো বেশি করে ধরা পড়ে। এখন সব যখন ভরাডুবি হতে বসেছে তখনও সুরপতি প্রাণপণে লোকের চোখে ধূলো দেওয়ার চেষ্টা করছেন, তখনও যত পারছেন অপহরণ করছেন পরের ধন। সব জেনে শুনেও অবনী কেন এ সব সহ্য করছে? ব্যাপারটা নিজের কাছেই এক আশ্চর্য রহস্য হয়ে রয়েছে। একি শুধু অর্থের লোভ, শুধু ভাগ-বাঁটোয়ারার প্রলোভন? অবনীর মন তাতে সায় দিতে চায় না। তা নয়। সুজাতা যদি তাকে সত্যিই ভালোবাসত, বিশ্বাস করত তাহলে অবনী হয়ত শয়তানের সঙ্গে এভাবে সন্ধি করত না। শয়তানের ঘরে যে দেবকন্যা রয়েছে তার হাত ধরে পথে নামত, সৎপথে থাকত। কিন্তু সুজাতা তো তাকে স্বেচ্ছায় ধরা দেবে না। তাকে জোর করে কেড়ে নিতে হবে, ছিনিয়ে নিতে হবে। আর সেই কেড়ে নেওয়ার শক্তি, কেড়ে নেওয়ার কৌশল শিখতে হবে সুরপতির কাছে। কী ক'রে নিজের ইচ্ছা দিয়ে অন্যের ইচ্ছাকে চুরমার করা যায়, সেই নির্মম নির্লজ্জ শক্তির চর্চায় সুরপতি ছাড়া আর কে অবনীকে দীক্ষা দেবে? না কি ফিরে আসবে অবনী? পৃথিবীতে একটি মাত্র নারীর হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়ার জন্যে সব কলুষতা কালিমা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে? মুক্তি স্নানের পর পূত পবিত্র হয়ে দেবী মন্দিরের দ্বারের কাছে এসে দাঁড়াবে? অবনী নিজের মনেই হাসল। এতকাল বাদে সে কি ফের আস্তিক হ'ল, পৌত্তলিক হয়ে পড়ল? পুরুষের চোখে নারী কখনো সুন্দর একটি পুতুল, কখনা সৌন্দর্যময়ী শক্তিময়ী দেবী। কিন্তু আসলে ওরা কী তা তো আর অবনীর জানতে বাকি নেই। আসলে ওরাও রক্ত মাংসে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ভরা জীব। সেই ক্ষুধা তৃষ্ণার টান পুরুষের চেয়ে ওদের বেশি ছাড়া কম নয়। তবু যে পুরুষ, তাকে দেবীর আসনে বসায় সে তার নিজের জন্যেই নারীকে সম্মান দিয়ে নিজের সৃষ্টিশক্তি নিজের কল্পনাশক্তিকেই সে সম্মানিত করে। শুধু রক্তমাংসের পিণ্ড নিয়ে তার সুখ নেই। নিজের মানসীকে সে অভিমানবী

করে তোলে। শুধু কি পুরুষ? মেয়েরাও তো তাই করে। প্রিয়তমের মধ্যে সে দেখতে চায় পরম পুরুষকে। সাধারণ পুরুষের স্ত্রী হয়ে তার তৃপ্তি নেই। অতিরঞ্জনের কবিত্ব পুরুষেরও যেমন আছে, নারীরও তেমনি। এ কবিত্ব কোথেকে আসে? নিশ্চয়ই পরস্পরের ভালোবাসা থেকে। তাতে আর কোন সন্দেহ নেই অবনীর। ভালোবাসা। শুধু ভালোবাসা। সুজাতার কথা মনে পড়ল অবনীর। মন ভরে গেল। তাকে একটিবার দেখবার জন্যে, তার একটুখানি স্পর্শ পাওয়ার জন্যে তাকে একটুখানি স্পর্শ করার জন্যে অবনীর হৃদয় আগ্রহে উদ্বেল হয়ে উঠল।

সুরপতির গাড়ি কখন যে ভবানীপুর পার হয়ে গেল তা অবনী টেরও পেল না। আর একজনের হৃদয়পুরে প্রবেশের আশা তাকে সারাটা পথ আচ্ছন্ন করে রাখল। সুরপতিও সারাক্ষণ চুরুট মুখে চিন্তামগ্ন রইলেন। গাড়ীতে তিনি অবনীর সঙ্গে কোন কথাই বললেন না।

অবনী ভাবতে লাগল সুজাতার কথা। সুজাতার কাছ থেকে যদি ফের সাড়া পায় তাহলে আবার সে পথ বদলাবে। সুরপতি যদি তার কথায় রাজী হন ভালো, না হলে অবনী তার সংস্রব ছেড়ে দেবে। গড়ে তুলবে সংসার। সুখ শান্তিতে ভরা ছোট একটি নীড়। আশ্বাসে, বিশ্বাসে ভালোবাসায় ভরা। সমস্ত ক্লেদ কলঙ্ক মলিনতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে অবনী। সুন্দর পবিত্র জীবনের সে অধিকারী হবে। আর তারই অর্ধাংশভাগিনী হবে সুজাতা। তার স্নিগ্ধ প্রসন্ন হাসিতে অবনীর সমস্ত সংসার উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সত্যি সুজাতার মত অমন সুন্দর করে হাসতে অবনী আর কখন দেখেনি।

পথে যেমন ছিলেন ঘরেও তেমনি গম্ভীরভাবে ঢুকলেন সুরপতি। একবার শুধু অবনীর দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে বললেন 'এসো।' তিনি আহ্বান জানালেও অবনী আজ সুরপতির ঘরে গিয়ে ঢুকল না। নিচের ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করতে লাগল। মনে মনে ভাবল যার কাছে এসেছে আমন্ত্রণটা আগে তার কাছ থেকে আসুক।

বাড়ির পুরোণ চাকর অমূল্য এল চা নিয়ে। বলল, 'ভালো আছেন অবনীবাবু?'

অবনী বলল, 'হ্যাঁ, ভালো। তোমার দিদিমণি কোথায়? তাকে দেখছিনে যে।'

অমূল্য একটু দ্বিধার সঙ্গে বলল, 'আজ্ঞে তাঁর শরীর খারাপ। শুয়ে শুয়ে বই পড়ছেন। আপনি যেন কিছু মনে না করেন।'

মনে না করেন! এত অবজ্ঞা, এত অবহেলা অপমানের পরেও কেউ কিছু মনে না ক'রে পারে? রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল অবনীর। সুজাতা তাকে ভালো না বাসে না বাসুক কিন্তু ভদ্র সমাজে সাধারণ শিষ্টাচার বলে তো একটা কথা আছে। সেই সৌজন্যটুকু পাওয়ার আশাও কি অবনী করতে পারে না?

অবনী একবার ভাবল চাকরের হাতে পাঠান চায়ের কাপড় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে এক্ষুণি এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু পর মুহূর্তে তার সুর-পতির কথা মনে পড়ল। সে চলে যেতে চাইলেও সুরপতি তাকে ছাড়বেন কেন। শক্ত মুঠি দিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরবেন। চলে যেতে চাইলেও সত্যি সত্যি কত দূরে আর যেতে পারবে অবনী। একই স্বার্থ আর লোভের শিকলে তারা দুজনেই বাঁধা পড়েছে। তাই যদি পড়ে থাকে তাহলে সুজাতাকেই বা কেন ছেড়ে দেবে অবনী। কেন তাকেও লোহার শিকল দিয়ে বাঁধবে না। যে স্বেচ্ছায় না দিল, তার কাছ থেকে কেন জোর করে কেড়ে নেবে না? কিসের খাতির? সুরপতি কি তাকে খাতির করেছেন যে সে তার মেয়েকে খাতির করবে, রেহাই দেবে? না অবনী ছাড়বে না, কিছুতেই ছাড়বে না। কেড়ে নেওয়াটাই পৌরুষ, ছেড়ে দেওয়া কাপুরুষতা।

বার কয়েক চুমুক দিয়ে গোল টিপয়টার ওপর কাপটি সশব্দে রেখে দিল অবনী। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দেখে আসি তোমার দিদিমণির অসুখটা কী।'

অমূল্য ভীত হয়ে বলল 'আজ্ঞে, দিদিমণি বিরক্ত করতে বারণ করেছিলেন।

অবনী একটু হাসল, 'আমি তাকে মোটেই বিরক্ত করব না অমূল্য, তোমার কোন ভয় নেই। তাছাড়া তুমি কর্তব্য করেছ তুমি ঠিকই বাধা দিয়েছ এ কথাও আমি তাকে বলব। শুধু আমিই সে বাধা মানিনি। পৃথিবীতে কারো কোন বাধাই আমি আর মানব না।'

অবনী দ্রুত পায়ে ওপরে উঠে গেল। অমূল্য তার পিছনে পিছনে আসছিল। অবনী ঘাড় ফিরিয়ে ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'তোমার এসে দরকার নেই। তুমি নিচে পাহারা দাও।'

অমূল্য আর কোন কথা না বলে নিচে নেমে গেল। অবনীর ভাবভঙ্গি দেখে মনে মনে হাসল অমূল্য। নিজের মনে বলল, 'চোখই রাঙাও আর যাই কর, তোমার দিন আর নেই। এ বাড়িতে তোমার আব কোন সুযোগ সুবিধে হবে না।'

সুজাতার ঘরের দরজা বন্ধ ছিল না। আলগাভাবে ভেজানো ছিল। ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছিল বারান্দায়। অবনী অনুমতি না চেয়ে, অনুমতির অপেক্ষা মাত্র না করে দোর ঠেলে ঝড়ের মত ভিতরে গিয়ে ঢুকল। সুজাতা সত্যিই শুয়ে ছিল। শুয়ে শুয়ে আকাশপাতাল কি ভাবছিল সেই জানে। অবনীকে ঘরে ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি ক'রে উঠে বসল। অস্ফুট স্বরে বলল, 'তুমি !'

অবনী বলল, 'হ্যাঁ আমি। আজ জোর করেই ঘরে ঢুকলাম তোমার। তুমি অবশ্য দোর গোড়ায় দারোয়ান বসিয়ে রেখেছিলে। কিন্তু আমি তার বাধা মানিনি। পাহারাদারই যদি বসাবে তাহলে ওসব অমূল্য-টমূল্যকে বসাতে গেলে কেন। বন্দুক হাতে ভোজপুরী গুটি কয়েক পালোয়ানকে বসিয়ে রাখলেই পারতে।'

সুজাতা অদ্ভুত একটু হাসল, 'তারা তোমাদের ব্যাঙ্কের দরজায় বসে। ভেবেছিলাম আমার দরজায় অমূল্যই যথেষ্ট হবে। কিন্তু তুমি যা ভেবেছ তা নয়। আমার শরীরটা সত্যিই খারাপ ছিল। তা ছাড়া ভেবেছিলাম

অবনী বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল, 'তা তো পড়বেই। বাঁধবে আর ছিঁড়বে এই যখন নিত্য খেলা তোমাদের। কিন্তু সকলের সঙ্গে এক খেলা খেলতে যেয়ো না সুজাতা, তাতে বিপদ আছে।'

হঠাৎ এগিয়ে এসে অবনী সুজাতার মুখখানা দুহাতে তুলে ধরল তারপর তার সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য ক'রে মত্তের মত, উন্মত্তের মত, ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া দুই ঠোঁটে চুম্বন করল। হেসে বলল 'কিছু মনে কোর না। ভেবেছিলাম স্ত্রীর সম্মানই তোমাকে দেব। কিন্তু তাতো তুমি নিলে না। তাই উপস্ত্রীর দক্ষিণাই তোমাকে দিয়ে রাখলাম। এখন অসিত আসুক কি না আসুক আমার কিছুতেই কিছু এসে যায় না।'

সুজাতা শুধু পাথরের মত মুহূর্তকাল নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারপর অনুচ্চ কিন্তু তীব্র ঘৃণার স্বরে বলল, 'বেরিয়ে যাও, এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাও তুমি।'

কিন্তু অবনীর আগে নিজেই ঘর থেকে চলে এল সুজাতা। এগিয়ে চলল সুরপতির ঘরের দিকে। ভাবল তাঁকে গিয়ে বলবে সব কথা। বলবে অবনী যদি এবাড়িতে আসে তাহলে আর সুজাতার পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব নয়। সুরপতি যেন তাদের মধ্যে একজনকে বেছে নেন।

কিন্তু লম্বা করিডর পার হয়ে সুরপতির ঘরের কাছে এসে সুজাতা দেখল ভিতর থেকে সে দরজা বন্ধ। অমূল্য সেই দরজার সামনে বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুজাতা বলল 'বাবাকে ডেকে দাও অমূল্য, তাঁর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

অমূল্য বলল, 'কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা তো এখন বলবার জো নেই দিদিমণি।'

সুজাতা বলল, 'বলবার জো নেই? কেন?'

অমূল্য ইতস্তত করে বলল, 'তোমার কাছে সে কথা বলতে লজ্জা হচ্ছে দিদিমণি। সেকথা তোমার না শোনাই ভালো।'

সুজাতা অধীর হয়ে বলল, 'তোমার আর ভণিতা করে কাজ নেই

অমূল্য। আমি যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও। কি করছেন বাবা?'

অমূল্য চাপা গলায় বলল, 'মদ খাচ্ছেন। বদ অভ্যাসটা অনেকদিন হল ছেড়ে দিয়েছেলেন। তুমি বড় হয়ে উঠবার পর আর দেখিনি। ফের যে কোন্ বুদ্ধিতে ধরলেন উনিই জানেন। কি যে হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে দিদিমণি।'

সুজাতা তাকে বোঝাবার কোন চেষ্টা করল না। বাড়ির পুরোন, একান্ত বিশ্বাসী এই চাকরটির দিকে শুধু অসহায় আর বিমূঢ় দুটি চোখ তুলে তাকাল।

সেদিন বেলা দশটার সময় দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের চেক ভাঙাতে এবং টাকা জমা দিতে এসে লোকে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ব্যাঙ্কের দরজায় বড় বড় তালা ঝুলছে। দারোয়ানরা আড়ালে পড়েছে, সামনে দেখা যাচ্ছে আধ ডজন লাল পাগড়ী বাঁধা বন্দুকধারী পুলিশ। কারোরই বুঝতে কিছু আর বাকি রইল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সারা সহরে ব্যাঙ্ক ফেলের খবর ছড়িয়ে পড়ল।

ব্যাঙ্কের সামনে নানা রকম গোলমাল শোনা যেতে লাগল, জনতার আক্রোশ ভাষার শ্লীলতা শালীনতা মানল না। সুরপতির উদ্দেশে গালিগালাজ উচ্চতর হয়ে উঠতে লাগল, 'কই সে বড় চোরটা কোথায়, সে শালাকে ধরে আন।'

তার টিকিটিরও কি এখন দেখবার জো আছে? সে এতক্ষণ পগাড় পার হয়ে গেছে।

একটু দূরে সহকর্মী বন্ধুর দলের সঙ্গে অসিত আর শ্যামলও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এত তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্কটি যে লিকুইডেসনে যাবে তা তারা ধারণাও করতে পারে নি। তারা যখন ইউনিয়নের দাবি দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত

ছিল যখন অসিতকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করার বিরুদ্ধে অন্দোলনের জন্মে তৈরী হচ্ছিল সেই সময়ে ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ করে দিয়ে চতুর স্বরপতি সব বিক্ষোভ সব বিরোধের ওপর যবনিকা টেনে দিলেন।

বিক্ষুব্ধ ভিড়ের ভিতর থেকে হঠাৎ একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের তরুণী বিধবা অসিতদের সামনে এসে কেঁদে পড়ল, 'আমার সব গেল দাদা সব গেলো।'

অসিতের মনে পড়ল মেয়েটি যখন একাউন্ট খোলে আসিত নিজে তখন হেড অফিসে উপস্থিত ছিল। ফরম-টরম এনে সেই সব ব্যবস্থা করে দেয়। মেয়েটির নাম ধাম পর্যন্ত এখনো বেশ মনে আছে অসিতের। বনলতা দাস। সংসারে বিধবা শাশুড়ী একটি নাবালক ছেলে। কর্পোরেশনের প্রাইমেরী স্কুলে মাষ্টারী করে বনলতা। স্বামী চাকরি করত রেলওয়েতে। মারা যাওয়ার পর তার লাইফ ইনসিওরেন্সর হাজার দুই টাকা দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে রেখেছিল বনলতা। একাউন্ট খোলার সময় অসিতকে একান্তে ডেকে গলা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমার টাকার কোন ভয় নেই তো অসিতবাবু?

অসিত হেসে আশ্বাস দিয়েছিল, 'না, না কোন ভয় নেই আপনার। হাজার হাজার লাখ লাখ টাকার একাউন্ট আছে এখানে।'

সেই আশ্বাসের কোন মূল্যই রইল না। দরিদ্র বিধবার সর্বস্ব নষ্ট হওয়ার জন্মে নিজেকেই দায়ী মনে হতে লাগল অসিতের। বনলতার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের বিধবা বোন উমার কথা মনে পড়তে লাগল। উমারও কিছু টাকা ছিল এই দেশলক্ষ্মীতে। এর আগে একবার যখন রান হয় সেই টাকা এখান থেকে তুলে নিয়ে যায় অসিত। অবশ্য উমার পীড়াপীড়িতেই তুলেছিল। কিন্তু সে সময় তো বনলতার মত আরো অনেক অনাথার কথা মনে পড়ে নি অসিতের, তাদের সাবধান করে দেওয়ার কথা ভাবে নি। অপরাধবোধ আর অনুশোচনায় বিদ্ধ হ'তে লাগল অসিত।

বনলতা আর একবার কাতরভাবে বলল, 'আমার টাকার কি হবে

অসিতবাবু ? আমার যে আর কোথাও কোন সঞ্চয় নেই। আপনাদের ব্যাঙ্কেই যে বিশ্বাস করে আমি সব রেখেছিলাম।'

শ্যামল তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'আপনার ভয় নেই, যে ভাবেই পারি আমরা আপনাদের টাকা উদ্ধার করব। সুরপতিবাবুর হাতে এই ব্যাঙ্ক ডুবে গেলেও আমরা যারা এখানে চাকরি করি, যারা খেটে খাই তারাই ডুবন্ত ব্যাঙ্ককে ফের তুলে ধরব। তালা ভেঙে ফের ব্যাঙ্কের দরজা খুলে দেব আমরা।'

অন্তরের উদ্দাম বেগের সবখানি যেন শ্যামল তার ভাষার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে চাইল।

বনলতা বিমূঢ় হয়ে একটুকাল সেদিকে তাকিয়ে রইল, তারপর অসিতের দিকে চেয়ে বলল, 'টাকাটা সত্যিই ফিরে পাওয়া যাবে অসিতবাবু?'

অসিত বলল, 'নিশ্চয়ই যাবে। যাতে সবাই আপনারা টাকা পান তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করব আমরা।' আপনি এখন বাড়ি যান বনলতা দেবী।'

আরো যে কয়েকটি স্ত্রী-পুরুষ অসিতদের ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের সবাইকেই সাধ্যমত সান্ত্বনা আর আশ্বাস দিয়ে বিদায় করল অসিত। তারপর তারা কয়েকজনে এসে বসল ব্যাঙ্কের সামনের রেষ্টুরেণ্টটায়। এই রেষ্টুরেণ্টর পর্দা ঘেরা ছোট্ট কেবিনে তাদের ইউনিয়নের উৎপত্তি। এখানেই বসেই এক কাপ করে চা সামনে নিয়ে তারা ইউনিয়নের সংগঠনের খসড়া করেছে, ঝগড়া করেছে। আজও ইউনিয়নের চারজন বিশিষ্ট সদস্য এসে রেষ্টুরেণ্টের সেই কেবিনটিতে বসল। অসিত শ্যামল অনিমেষ আর অতুল।

এককাপ করে চা সামনে নিয়ে একটুকাল তারা চুপ ক'রে রইল। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা যেন হতভম্ব হয়ে গেছে। এত তাড়াতাড়ি যে দেশলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবে তা তারা কেউ আশঙ্কা করে নি।

চায়ের কাপে একটু চুমুক দিয়ে শ্যামলই প্রথম কথা বলল, 'এবার ইউনিয়নের একটা জেনারেল মিটিং কল করতে হয়।'

অতুল বলল, 'আর মিটিংটিটিং ডেকে কী করবে শ্যামলদা? ব্যাঙ্কই গেল, আর ইউনিয়ন করে আমরা করব কী? লড়ব কার সঙ্গে?'

শ্যামল বলল, 'তোমার মাথায় পদার্থ বলে কিছু নেই অতুল, ব্যাঙ্ক জোর ক'রে বন্ধ ক'রে দিলেই কি আমাদের ইউনিয়নকে ওরা বন্ধ ক'রে দিতে পারে? আর ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইউনিয়নের কাজ সব ফুরিয়ে গেছে তাই বা তুমি ভাবছ কেন?'

অনিমেষ বলল, 'তবে?'

শ্যামল বলল, 'আমাদের এখনও ঢের কাজ রয়েছে। বলতে গেলে এখনই আমাদের কাজের শুরু। এতদিন আমরা কিছু করি নি। শুধু নিজেদের মাইনে আর বোনাস বৃদ্ধি নিয়ে হৈ চৈ করেছি কিন্তু এখনকার কাজের তুলনায় তা প্রায় কিছুই নয়। তা অনেক তুচ্ছ।'

অনিমেষ অসিতের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, 'আমাদের জননেতা শ্যামলবাবু সব সময় প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে ভালোবাসেন। আমাদের প্রোগ্রামটা এখন কী হ'তে পারে আপনি একটু ধীরে সুস্থে বুঝিয়ে বলুন তো।'

শ্যামল অনিমেষের দিকে একবার রুষ্ট ভঙ্গিতে তাকিয়ে রূঢ় স্বরে বলল, 'সময় নেই অসময় নেই, অনিমেষবাবুর খোঁচা দেওয়ার অভ্যাসটা ঠিকই আছে। আরে মশাই হাতুড়ী পিটিয়ে পিটিয়ে পেরেক না ঢোকালে আপনাদের মাথায় কি কিছু ঢোকে? আস্তে বললে আপনাদের কি কিছু কানে যায়?'

অনিমেষ বলল, 'আপনি যে ভাবে আছেন তাতে শুধু আমাদের কেন, রাস্তার লোকে পর্যন্ত সব কথা শুনতে পাবে।'

অসিত বাধা দিয়ে বলল, 'থাক থাক। নিজেদের মধ্যে আর ঝগড়া করবেন না। বরং এখন আমাদের কী করা দরকার তাই নিয়ে আলোচনা করা যাক।'

অতুল বলল, 'আমরা তো তাই শুনতে চাইছি।'

অসিত তখন ধীরে ধীরে তাদের পরিকল্পনার কথা বলতে আরম্ভ করল।

ব্যাঙ্ক বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের কাজ শেষ হয় নি শ্যামল যে বলেছে সে কথা সত্যি। আজ না হোক দুদিন বাদে যে এ ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এমন আশঙ্কা কিছুদিন আগে থেকেই তাদের হয়েছিল। এখন একমাত্র উপায় তাদের হাতে আছে দেশলক্ষ্মীকে লিকুইডেশন থেকে রক্ষা করা। অন্য দু একটি চালু স্বচ্ছল ব্যাঙ্কের সঙ্গে যদি দেশলক্ষ্মী সম্মিলিত হয় তাহলেই তা সম্ভব হতে পারে। তাতে দেশলক্ষ্মীর স্বতন্ত্র নাম থাকবে না, আলাদা অস্তিত্ব থাকবে না কিন্তু ডিপজিটরদের টাকাগুলি রক্ষা পাবে, কর্মচারীদের চাকরি বজায় থাকবে, দলে দলে তাদের বেকার হয়ে রাস্তায় নামতে হবে না। ইউনিয়নের জেনারেল মিটিং-এ অসিতদের এই প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেবে, তারপর যাবে ডিপজিটরদের কাছে। বাড়িবাড়ি গিয়ে তাঁদের বুঝিয়ে বলবে। এ্যামালগেমেশনের সমর্থনে তাঁদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করবে, তাঁদেরও যাতে একটা সমিতি গড়ে ওঠে তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে অসিতদের। খবরের কাগজগুলি যাতে তাদের এই উদ্যম আয়োজনে সাহায্য করে, অনুকূল মন্তব্য লিখে দেয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। কারণ কাগজ হ'ল আজকালকার এই প্রচারধর্মী যুগে বড় অস্ত্র, বলা যায় ব্রহ্মাস্ত্র। অসিত বলে যেতে লাগল। তাকে এমন অনুপ্রাণিত ভাবে কথা বলতে এর আগে কেউ দেখে নি। শুধু অতুল আর অনিমেষই নয়, শ্যামলও বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল এতদিনের স্বল্পবাক বন্ধুর দিকে। সে লক্ষ্য করল অসিতের মনে আর কোন দ্বিধা নেই। সব সঙ্কোচ সংশয় সে অতিক্রম করে এসেছে নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে তার ধারণা এখন স্পষ্ট, সংকল্প সুদৃঢ়।

ইউনিয়নের জেনারেল মিটিংএ এবারও অসিতই সভাপতি নির্বাচিত হল। অসিত আপত্তি করে বলেছিল, 'আমি তো আর ব্যাঙ্কের কর্মচারী নই। আমাকে তো আগেই ওঁরা discharge করেছিলেন। আপনারা বরং regular employeeদের ভিতর থেকে কাউকে প্রেসিডেন্ট করুন, শ্যামল আছে। না হয় অতুলবাবু কি অনিমেষবাবু।'

কিন্তু ইউনিয়নের সদস্যেরা কেউ সে কথায় কান দেয়নি নেতৃত্বের ভার অসিতকেই নিতে হয়েছে।

শ্যামল বলেছে, 'তোমার ভয় কিসের অত। তোমার হাতে কলমে কিছু করতে হবে না। তুমি শুধু হুকুম দেবে।'

কিন্তু শুধু হুকুম দেওয়া নয়, অসিত নিজেই কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়ল। ডিপজিটরদের বাড়িতে গিয়ে সই সংগ্রহ করতে লাগল। যে দু'একটি ব্যাঙ্কের সঙ্গে দেশলক্ষ্মীর সম্মিলিত হবার কথা ছিল তাদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অসিত সাক্ষাৎ করল। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিলেন দেশলক্ষ্মী যদি তাঁদের সঙ্গে মেশে তাঁরা বেশির ভাগ দায় স্বীকার করে নেবেন এবং কোন কর্মচারীকেই কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবেন না। সহরের কয়েকটি বড় বড় সংবাদপত্রের সঙ্গেও যোগাযোগ করল অসিত। দু'একটা বিজ্ঞপ্তি বিবৃতি ছাপা হল কাগজে। কাজ এগিয়ে চলতে লাগল।

এরমধ্যে অসিত কয়েকবার সুরপতির সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের চেষ্টা করেছে। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হন নি। অসিত কিংবা ইউনিয়েনের প্রতিনিধিস্থানীয় কারো সঙ্গে তিনি কিছুতেই দেখা করতে চান নি। ব্যাঙ্ক যখন গেছে তখন আবার ইউনিয়ন কি। কোন রকম ইউনিয়নের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন না। তবে একথা তিনি স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন আর কোন ব্যাঙ্কের সঙ্গে তাঁর ব্যাঙ্ককে মেশাবার তিনি মোটেই পক্ষপাতী নন। তা যদি চাইতেন অনেক আগেই তা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি যা ভালো বুঝেছেন তাই আর সকলের ভালোর জন্যেই তা করা হয়েছে। সুরপতির বক্তব্য অবনীমোহনের মুখ থেকেই শুনতে পেল অসিতরা।

শ্যামল হেসে বলল, 'কি একখানা সর্বমঙ্গলময়ের অবতার। এতগুলি মানুষ নিঃস্ব হচ্ছে এতগুলি লোক বেকার হয়ে পড়ল তাও মঙ্গলের জন্যেই। চক্রবর্তী মশাইয়ের চক্ষুর লজ্জাও নেই, জিবের লজ্জাও নেই।'

অনিমেষ বলল, 'এ আর এমন নতুন কথা কি। মহাশয়দের ও সব সয় না। ঘৃণা লজ্জা ভয় তিনি থাকতে নয়।'

একটি সাধারণ সভায় ডিপজিটররা সম্মিলিত হবেন, এবং তাঁদের মতামত জানাবেন বলে স্থির হ'ল। সেই সভায় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে অসিত আর শ্যামল উপস্থিত থাকবে এবং অসিত একটি লিখিত বিবৃতি পড়বে।

সভার অয়োজন চলেছে এবং যাতে সব কাজ পণ্ড না হয় তার জন্যে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের পরামর্শ চলছে অসিত আর শ্যামলেব মধ্যে এই সময় সুরপতি খবর পাঠালেন ব্যাঙ্কেব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি অসিতের সঙ্গে আলোচনা করতে রাজী আছেন। শনিবার সন্ধ্যার পর অসিত যেন সুরপাতর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। অসিত যেন আর কাউকে সঙ্গে না নেয়। সুরপতি শুধু তার সঙ্গেই একান্তে কথা বলতে চান।

মা আর ছোট বোন নীলাকে ব্যাপারটা জানাল অসিত। অবশ্য সে যে একাই যাচ্ছে সেকথা গোপন কবল। বলল, 'দলবল নিয়ে আজ আবার বহুদিন পরে আমার পুরোণ মাষ্টার মশাইর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি মা।'

অরুন্ধতী মুখ গম্ভীর করে বললেন, 'কেন। আবাব সেখানে কেন। শুনেছি সে নাকি কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবে না।'

অসিত মৃদু হেসে বলল, 'মত পাল্‌টেছেন। তিনিই ফের ডেকে পাঠিয়েছেন।'

নীলা বলল, 'হাসির কথা নয় দাদা। ডেকে পাঠালেও তোমাদের যাওয়াটা ঠিক হবে কি না ভালো ক'রে ভেবে দেখ।'

অসিত তেমনি হাসি মুখে বলল, 'ঠিক না হবার কী আছে।'

অরুন্ধতী বললেন, 'তুই জানিস না অসিত। সে সাপের চেয়েও খল। তাছাড়া এখন যে অবস্থায় আছে তার অসাধ্য কোন কাজ নেই।'

অসিত বলল, 'সাপই হোক আর বাঘই হোক আমার কিছুতেই ভয় নেই মা। রক্ষা কবচ আমার সঙ্গে আছে।'

অরুন্ধতী বললেন, 'সব তাতেই তোমার ঠাট্টা। তাবিজ কবচ তুমি কিছু বিশ্বাস কর কি না।'

অসিত বলল, 'কিন্তু তোমার আশীর্বাদে আমি ঠিকই বিশ্বাস করি। তার চেয়ে বড় কবচ আমার আর নেই।'

অরুন্ধতী ছদ্ম কোপের ভান করে বললেন, 'যাক, তোমাকে আর মন ভোলানো কথা বলতে হবে না। তুমি আমার কত যেন বাধ্য। মাতৃভক্তি শুধু তোমার ওই মুখেই। হ্যাঁরে, আর সবাই সঙ্গে থাকবে তো?'

অসিত বলল, 'থাকবে মা। তোমার কোন ভয় নেই। তাছাড়া আমি তো সুরপতি বাবুর সঙ্গে কোন চটাচটি কিছু করতে যাব না। তাঁর যা বক্তব্য শুনে আসব, আমার যদি কিছু বলবার থাকে ভদ্রভাবেই তা বলব। আমি কি শ্যামলের মত গোঁয়ার।'

আড়চোখে নীলার দিকে একটু তাকিয়ে হাসল, অরুন্ধতীও হেসে ফেললেন, বললেন, 'তোদের জ্বালায় আর পারি নে বাবু। যাই তবে রান্নাঘরে। উনুনে আঁচ দিই গিয়ে। চা-টা না খেয়ে বেরোস নে যেন।'

অরুন্ধতী সামনে থেকে চলে গেলে নীলা বলল 'পতিনিন্দা বিনা প্রতিবাদে হজম করব সে কথা ভেব না। আমারও কিছু বলবার আছে।'

অসিত বলল, 'বল না।'

নীলা এবার আরো কাছে এগিয়ে এসে মৃদু হেসে বলল, 'সাপের গর্তে যখন হাত দিতেই যাচ্ছ দাদা, তার মাথার মণিটা কিন্তু তুলে আনা চাই।'

বুকের মধ্যে যেন তীর বিঁধল অসিতের। আহতস্বরে বলল 'নীলা!'

নীলা বলল, 'কী দাদা।'

অসিত বলল, 'ওসব ঠাট্টা তামাসা আমি যে পচ্ছন্দ করিনে তাতো তুই জানিস।'

নীলা এবার সহানুভূতির স্বরে বলল, 'আমি মোটেই ঠাট্টা করছিনে

দাদা। তোমার উচিত ছিল সুজাতাদির খোঁজ নেওয়া। এমন চুপচাপ থাকা তোমার পক্ষে মোটেই ঠিক হয় নি।'

অসিত একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু সে নিজেই তো আমাকে দেখা সাক্ষাৎ করতে কি চিঠিপত্র দিতে নিষেধ করেছে। তোকে তো সবই বলেছি নীলা।'

নীলা বলল, 'তা বলেছ। কিন্তু দাদা সে নিষেধ এমন কিছু গুরুবাক্য নয়, তার অর্থটাই তো আসল।'

অসিত কোন জবাব দিল না।

নীলা বলতে লাগল, 'আমি হলে কিন্তু সুজাতাদির মত করতাম না। মন স্থির করে ফেলতে আমার মোটেই সময় লাগত না। তাতে বাপের সঙ্গে যদি না বনত বাপকে ছেড়ে আসতাম।'

অসিত বলল, 'সবাই কি সব কাজ পারে ?'

নীলা বলল, 'পারে যে না তা তো চোখের ওপরই দেখতে পারছি। ইউনিয়নের সভাপতিই হও আব যাই হও তুমিও অকর্মণ্য পুরুষ। একেবারেই কোন কাজের নও।'

চা জলখাবার খেয়ে অসিত বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। নীলা আর একবার বলে দিল, 'তার সঙ্গে দেখা করে এসো দাদা। অভিমান করে দূরে সরে থেকো না।'

অসিত হেসে বলল, 'তোর যদি অত গরজ থাকে তুই যা। আমাকে কেন সাপের ছোবল খাওয়ার জন্যে পাঠাচ্ছিস, তোর প্রাণে কি দয়া মায়া নেই।'

মোড় থেকে শিয়ালদহগামী বাস ধরল অসিত। বেলা পড়ে এসেছে। জানলার ধারে এগিয়ে বসে বাইরের পড়ন্ত রোদ আর চলমান জনতার দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল। বার বার করে মনে পড়তে লাগল সুজাতার কথা। এতদিন কাজের চাপে তার কথা মনে পড়বার সময় হয় নি। কিংবা মনে পড়লেও দূরে সেই স্মৃতিকে ঠেলে রেখেছে অসিত,

ভাবতে চেষ্টা করেছে নিজের কর্মহীনতা এবং বেকার সহকর্মীদের কথা। দরিদ্র নিম্নমধ্যবিত্ত বহু ডিপজিটারের মুখও মনে পড়েছে। সর্বস্ব খোয়াবার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন বিষণ্ণ ব্যাকুল সব মুখ। এতদিন এরা লেজারের খাতায় শুধু নামসর্বস্ব ছিল অসিতের কাছে। কিন্তু এই কয়েকদিনের মধ্যে তাদের সঙ্গে অসিতের আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। সুখ-দুঃখ ভাবনা বেদনা নিয়ে তারাও এক একজন পুরোপুরি মানুষ। তারা শুধু নামে মাত্র নয়। তাদেরও নানারকমের সমস্যা আছে। স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণের সমস্যা। দারিদ্র্য দুঃখ অনটনের সঙ্গে সংগ্রাম। আবার সেই সঙ্গে আছে স্নেহ মমতা কৃতজ্ঞতা।, অসিত তাদের উপকারের চেষ্টা করছে এ কথা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে কতজন যে অসিতকে আশীর্বাদ করেছে আত্মীয়-স্বজনের কাছে এসেছে, কাছে টেনেছে তাব আর ঠিক নেই। এক একজন মানুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যাওয়া এক একটি জগৎ আবিষ্কারের মত। হৃদয় আবিষ্কাবের চেয়ে বড় আবিষ্কার আর নেই। সেই নিত্য নূতন আবিষ্কারের আনন্দে ব্যক্তিগত অভাব অনটন শুষ্কতা শূন্যতার কথা এতদিন ভুলেছিল অসিত। নীলার পরিহাসের ভিতর দিয়ে আজ যেন ফের তা নতুন করে মনে পড়ল। নিজের বুভুক্ষু হৃদয়ে কথা সুজাতার বিমুখতা আর ঔদাসিন্যের কথা ফের মনে পড়ে গেল অসিতের। কে যেন বলছিল সুজাতা শেষ পর্যন্ত অবনীকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। অবনীর হাতে নাকি তার বাবার জীবন মরণের কাঠি। অবনী সুরপতির ডান হাত তাকে প্রত্যাখ্যান করবে সুজাতার সাধ্য কি।

বাস ষ্টপের কাছে দলবল নিয়ে শ্যামল অপেক্ষা করছিল। অসিতকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠল। বলল 'এসো এসো, আমরা ভাবছিলাম তোমাকে হয়ত এগিয়ে আনতে যেতে হবে। যা দেরি করছিলে তুমি।' অসিত হেসে বলল, 'কি করব বল। আসবার মুখে তোমার স্ত্রী যা তর্ক শুরু করে দিল।'

শ্যামল বলল, 'স্বীকার কর তাহলে। তোমার সহোদরাটি পয়লা নম্বরের তার্কিক।'

ঠিক হল শ্যামলরা অসিতের সঙ্গে যাবে। স্থরপতির বাড়িতে অবশ্য ঢুকবে না। দলবল নিয়ে মোড়ের মুখে অপেক্ষা করবে। অসিত চেঁচিয়ে ডাকলেই শ্যামলরা গিয়ে উপস্থিত হবে।

অসিত একটু হেসে বলল, 'তোমাদের অতখানি সতর্ক হবার কোন দরকার নেই। স্থরপতিবাবু যাই বলুন আমার মেজাজ বিগড়াবে না। এটুকু ভরসা তোমাদের দিয়ে রাখতে পারি।'

শ্যামল জবাব দিল, 'ভয় তো তোমাকে নিয়ে নয়, ভয় আমাদের সেই স্থরপতিবাবুকে নিয়েই। তোমার মেজাজ না বিগড়ালে কি হবে তাঁর মেজাজ নিশ্চয়ই বিগড়ে রয়েছে।'

বাসে চেপে সাদার্ণ এভেনিয়ুতে পৌছল শ্যামলরা। স্থরপতিবাবুর বাড়ীর কাছাকাছি এসে তারা থেমে পড়ল। বলা যায় অসিতই থামিয়ে দিল তাদের। বলল, 'তোমাদের আর বেশি দূর গিয়ে কাজ নেই। স্থরপতি-বাবু ভাববেন দলবল নিয়ে আমরা লাঠালাঠি করতে এসেছি।'

শ্যামল বলল, 'লাঠি একখানা কিন্তু সঙ্গে রাখলে পারতে অসিত। কখন কোন দরকারে লাগে বলা যায় না।'

বন্ধুদের অপেক্ষা করতে বলে অসিত এগিয়ে চলল। গেটের সামনে আসতেই বন্দুকধারী দারোয়ান বাধা দিল। ভিতরে যাওয়ার হুকুম নেই। মোলাকাত হবে না বড়বাবুর সঙ্গে।

কিন্তু অসিত টুকরো কাগজে নিজের নাম লিখে দিয়ে বলল, 'বড়বাবুকে দেখাও গিয়ে। তিনি যদি ভিতরে না যেতে বলেন যাব না। বাইরে থেকেই ওঁর সঙ্গে একটু আলাপ ক'রে যাব। তিনিই খবর দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন।'

একটু বাদেই স্থরপতির পুরোন চাকর অমূল্য এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, 'আস্থন আস্থন অসিতবাবু। আরে দারোয়ান, ওঁকে আটকে দিলে কেন? তুমি কি মানুষ-জন চেন না?'

দারোয়ান তার জবাবে বলল যে মানুষ জন সে খুব চেনে। কিন্তু চেনা মানুষদের ওপরই বেশি বিধি নিষেধ।

অসিত অমূল্যের পিছনে পিছনে বাড়ির ভিতর ঢুকল। সব চুপচাপ, নিঃশব্দ। এরই মধ্যে কেমন যেন ছাড়াছাড়া মনে হচ্ছে। প্রথম দিন যখন এ বাড়িতে চাকরির উমেদোর হয়ে আসে সেই দিনের কথা মনে পড়ল অসিতের, তখন অনেক কৌতূহল, অনেক ঔৎসুক্য ছিল মনে। কিন্তু আজ তার কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। আজ অবস্থা একেবারে বদলে গিয়েছে। আজ ভাঙা হাটে প্রাক্তন শিক্ষক আর মনিবের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসেছে অসিত। যদিও সুরপতিই তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন তবু তাঁর কাছে কোন কিছু আশা করবার নেই অসিতের। মনের মধ্যে 'যুদ্ধংদেহি' ভাবটাও আর রাখতে পারছে না। এক বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে অসিত এগুতে লাগল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে সে হঠাৎ অমূল্যকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার দিদিমণি কোথায় ?'

অমূল্য বলল, 'তাঁর ঘরেই আছেন, শরীর ভালো না। কারো সামনে বেরোন না। কারো সঙ্গে কথাবার্তাও তেমন বলেন না।'

অসিত জিজ্ঞাসা করল, 'অবনীবাবুর সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় নি ?'

অমূল্য মাথা নেড়ে বলল, 'না অসিতবাবু।'

একটু চুপ ক'রে থেকে অসিত ফের জিজ্ঞাসা করল, 'কবে হবে ?'

অমূল্য বলল, 'তাও জানি নে। জন্মমৃত্যু বিয়ে বিধাতাকে নিয়ে। দিন ক্ষণ কি কিছু আগে থেকে বলা যায় অসিতবাবু ?'

সুরপতি দোতলার কোণের ঘরখানিতে চুপ ক'রে বসেছিলেন দোরের সামনে অসিতকে দেখে বললেন, 'এসো।'

অসিত ঘরে ঢুকতে সামনের সোফাটা দেখিয়ে দিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, 'বোসো।'

ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। আসবাবপত্রও সামান্য। দু'খানি ছোট ছোট সোফা আর দেয়াল ঘেঁসে বেঁটে একটি আয়রন চেষ্ট। অসিত লক্ষ্য করল যাওয়ার আগে অমূল্য দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে গেছে।

প্রথমে কিছুক্ষণ কুশল প্রশ্নের বিনিময় চলল। জিজ্ঞাসা করলেন

'ভালো আছ? বাড়ির সব ভালো তো? তোমার মার শরীর কেমন?'

অসিত বলল, 'তিনি ভালোই আছেন। আপনাব শরীর—'

স্বরপতি বললেন, 'আমিও ভালোই আছি। তুমি একাই এসেছ?'

অসিত বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি তো একাই আসতে বলেছিলেন।'

স্বরপতি একটু যেন হাসলেন, 'আমাব অনুগত বাধ্য ছাত্রই বটে। কিন্তু তুমি একা আসনি আমি জানি। তোমার সেনাবাহিনী একটু দূরেই আছে। দরকার হ'লে যাতে তারা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পডতে পারে তার ব্যবস্থা করে এসেছ কী বল?'

অসিত সরাসবি কথাব জবাবটায় এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে কেউ আমবা আসিনি।'

স্বরপতি বললেন, 'তাহলে বোঝাপড়া কববাব জন্যেই এসেছ ?

অসিত চুপ ক'বে রইল।

স্ববপতি বললেন, 'আমিও কয়েকটা কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলবাব জন্যেই ডেকেছি। দু'একটা ব্যাপার তোমাব কাছ থেকে বুঝে নেবার ইচ্ছাও আমার আছে।'

'বলুন।'

একটুকাল চুপ করে থেকে স্বরপতি হঠাৎ স্নিগ্ধ কোমল গলায় বললেন, 'আচ্ছা অসিত, এই সব ব্যাপারের মধ্যে তুমি নিজেকে জড়িয়ে রেখেছ কেন বল তো? এতে তোমাব স্বার্থটা কী।'

অসিত বলল, 'ব্যাক্তিগত স্বার্থের কথা আমি ভাবছি নে।'

স্বরপতি বললেন, 'ও'!

তীক্ষ্ণ পবিহাসের স্বর স্বরপতির গলায়। "আচ্ছা, সমষ্টিগত স্বার্থের কথাই না হয় ধরছি। অনর্থক হৈ চৈ করে কাবোরই এ অবস্থায় কোন স্বার্থসিদ্ধি হবে না। মিছামিছি কতকগুলি ছেলেব সময় আর সামর্থ্য নষ্ট করবে। ব্যাঙ্ককে বাঁচানো যদি সম্ভব হ'ত আমি নিশ্চয়ই বাঁচাতাম। আমার

নিজের হাতে গড়া জিনিস। ব্যাঙ্কের ওপর দরদ আমার চেয়ে তোমাদের কারোরই বেশি নয়।'

অসিত বলল, 'আমরাও তো সেই কথা ভেবেছিলাম।'

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো সুরপতি, 'ভেবেছিলে! বিশ্বাস করতে পারনি বুঝি! কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর আমার তাতে কিছু এসে যায় না। নৌকো ফুটো হলে আমি তা ডুবিয়ে দিই, এই আমার স্বভাব। আবার নতুন করে চলতে শুরু করি। ভাঙা নৌকো বেয়ে বেড়াবার মত মূর্খতা আমার নেই।'

অসিত বলল, 'তা না থাকতে পারে। কিন্তু এতো শুধু নিজের নৌকো ডোবানো নয়, বহুলোকের যথাসর্বস্ব ডুবিয়ে দেওয়া, সে অধিকার কি আপনার আছে?'

সুরপতি তেমনি উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'অধিকার! তুমি আজকাল খুবই বড় বড় কথা বলতে শিখেছ অসিত। ভুলে যাচ্ছ আমি তোমাকে প্রথম লেখাপড়া শিখিয়েছি, একদিন অন্নও জুগিয়েছি।' একটু থামলেন সুরপতি তারপর ফের নরম আর শান্ত গলায় শুরু করলেন, 'অধিকার অনধিকারের কথা নয়। সব ব্যবসাতেই ওঠাপড়া, লাভ লোকসান আছে। ব্যবসায়ে লোকসান হলে তার সঙ্গে যারা জড়িয়ে রয়েছে তাদের সকলেরই লোকসান হয়। কিন্তু তুমি যা ভাবছ তা হবে না। সর্বস্ব কারোরই মারা যাবে না। ব্যাঙ্কের যা সম্পত্তি আছে তা বিক্রি করে লিকুইডেটারের মারফৎ প্রত্যেকেরই টাকা আমরা দিয়ে দিতে পারব। কিছু সময় লাগবে এই যা। কিন্তু তোমরা যে পথে চলছ সেটা ভুল পথ। অন্য কোন ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিশে এ ব্যাঙ্ককে বাঁচানো যাবে না, বরং সবাইকে মারবে।'

অসিত বলল, 'আপনার কথা আমি মানতে পারলাম না।'

সুরপতি বললেন, 'তোমার বুদ্ধি-স্থানে শনি ঢুকেছে। তাই আমার কথা অমান্য করছ। শোন, তুমি এই আন্দোলন-টান্দোলন ছেড়ে দাও। চলে যাও ওদের সংস্রব ছেড়ে।'

সিত বলল, 'আপনি অসঙ্গত অনুরোধ করছেন। আমি তা কিছুতেই পারব না।'

সুরপতি বললেন, 'তোমাকে পারতেই হবে। কী চাও তুমি? ভালো সরকারী চাকরী? বল আমি তার ব্যবস্থা করছি।'

অসিত বলল, 'অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি চাকরি চাইনে।'

সুরপতি ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলেন, 'তবে কী চাও, টাকা? কত? দু' হাজার, পাঁচ হাজার, দশ হাজার? বল, মুখ ফুটে বল, আমি চেক লিখে দিচ্ছি।'

অসিত শান্তভাবে বলল, 'আপনি আমাকে মিথ্যেই লোভ দেখাচ্ছেন।'

উত্তেজনায় ক্রোধে সুরপতির চোখ দুটো লাল হ'য়ে উঠল। ঠোঁটে একটু হাসি টেনে বিষাক্ত বিদ্রূপে বললেন, 'চাকরি নয়, টাকা নয়। তবে কী চাও তুমি? সুজাতাকে? আচ্ছা তাই দিচ্ছি তাই দিচ্ছি!'

বলতে বলতে পাঞ্জাবির ঝুল পকেট থেকে হঠাৎ একটি পিস্তল বার করলেন সুরপতি। বললেন, 'তুমি আজই কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে কিনা বল।'

মুহূর্তের জন্য বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল অসিতের। মুহূর্তকাল সে স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর শান্ত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'না।'

সুরপতি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না? এত সাহস তোমার? এত স্পর্ধা?'

অসিতের দিকে আরো দু'পা এগিয়ে গেলেন সুরপতি। হঠাৎ দোর ঠেলে সুজাতা প্রায় ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল, তারপর কাতর ভয়ার্তস্বরে বলল, 'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে বাবা? তুমি কি ক্ষেপে গেলে? ফেলে দাও ওটা ফেলে দাও।'

সুরপতি বললেন, 'না, তুমি এখান থেকে চলে যাও বুলু। তোমার তো এ ঘরে আসবার কথা নয়।'

সুজাতা বলল, 'এতদিন আসিনি বাবা। কিন্তু আজ আর না এসে